NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY

Under Graduate Degree Programme
Choice Based Credit System (CBCS)

SELF LEARNING MATERIAL

[Applicable for HEC]

COMMERCE
[HCO]

GE-CO-41

উপক্রমণিকা

মহান দেশনায়ক সুভাষচন্দ্র বসুর নামাঙ্কিত এই মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্মুক্ত শিক্ষাঙ্গনে আপনাকে স্বাগত। সম্প্রতি এই প্রতিষ্ঠান দেশের সর্বপ্রথম রাজ্য সরকারি মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে ন্যাক (NAAC) মূল্যায়নে 'এ' গ্রেড প্রাপ্ত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন প্রকাশিত নির্দেশনামায় স্নাতক শিক্ষাক্রমকে পাঁচটি পৃথক প্রকরণে বিন্যস্ত করার কথা বলা হয়েছে। এগুলি হল—'কোর কোর্স', 'ডিসিপ্লিন স্পেসিফিক ইলেকটিভ', 'জেনেরিক ইলেকটিভ' এবং 'স্কিল' / 'এবিলিটি এনহ্যান্সমেন্ট কোর্স'। ক্রেডিট পদ্ধতির ওপর ভিত্তি করে বিন্যস্ত এই পাঠক্রম শিক্ষার্থীর কাছে নির্বাচনাত্মক পাঠক্রমে পাঠ গ্রহণের সুবিধে এনে দেবে। এরই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে যাণ্মাষিক মূল্যায়ন ব্যবস্থা এবং ক্রেডিট ট্রান্সফারের সুযোগ। শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক এই ব্যবস্থা মূলত গ্রেড-ভিত্তিক যা অবিচ্ছিন্ন অভ্যন্তরীণ মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে সার্বিক মূল্যায়নের দিকে এগোবে এবং শিক্ষার্থীকে বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত সুবিধা দেবে। শিক্ষাক্রমের প্রসারিত পরিসরে বিবিধ বিষয় চয়নের সক্ষমতা শিক্ষার্থীকে দেশের অন্যান্য উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আন্তঃব্যবস্থায় অর্জিত ক্রেডিট স্থানান্তরে সাহায্য করবে। শিক্ষার্থীর অভিযোজন ও পরিগ্রহণ ক্ষমতা অনুযায়ী পাঠক্রমের বিন্যাসই এই নতুন শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য।

UGC (Open and Distance Learning Programmes and Online Programmes) Regulations, 2020 অনুযায়ী সকল উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্নাতক পাঠক্রমে এই সি.বি.সি.এস. পাঠক্রম পদ্ধতি কার্যকরী করা বাধ্যতামূলক—উচ্চশিক্ষার পরিসরে এই পদ্ধতি এক বৈকল্পিক পরিবর্তনের সূচনা করেছে। আগামী ২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষ থেকে স্নাতক স্তরে এই নির্বাচনভিত্তিক পাঠক্রম কার্যকরী করা হবে, এই মর্মে নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। বর্তমান পাঠক্রমগুলি উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রের নির্ণায়ক কৃত্যকের যথাবিহিত প্রস্তাবনা ও নির্দেশাবলী অনুসারে রচিত ও বিন্যস্ত হয়েছে। বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে সেইসব দিকগুলির প্রতি যা ইউ.জি.সি কর্তৃক চিহ্নিত ও নির্দেশিত।

মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে স্ব-শিক্ষা পাঠ-উপকরণ শিক্ষার্থী সহায়ক পরিষেবার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সি.বি.সি.এস পাঠক্রমের এই পাঠ-উপকরণ মূলত বাংলা ও ইংরেজিতে লিখিত হয়েছে। শিক্ষার্থীদের সুবিধের কথা মাথায় রেখে আমরা ইংরেজি পাঠ-উপকরণের বাংলা অনুবাদের কাজেও এগিয়েছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ শিক্ষকরাই মূলত পাঠ-উপকরণ প্রস্তুতির ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন—যদিও পূর্বের মতই অন্যান্য বিদ্যায়তনিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযুক্ত অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞ শিক্ষকদের সাহায্য আমরা অকুণ্ঠচিত্তে গ্রহণ করেছি। তাঁদের এই সাহায্য পাঠ-উপকরণের মানোন্নয়নে সহায়ক হবে বলেই আমার বিশ্বাস। নির্ভরযোগ্য ও মূল্যবান বিদ্যায়তনিক সাহায্যের জন্য আমি তাঁদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। এই পাঠ-উপকরণ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষণ পদ্ধতি-প্রকরণে নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। উন্মুক্ত শিক্ষাঙ্গনের পঠন প্রক্রিয়ায় সংযুক্ত সকল শিক্ষকের সদর্থক ও গঠনমূলক মতামত আমাদের আরও সমৃদ্ধ করবে। মুক্ত শিক্ষাক্রমে উৎকর্ষের প্রশ্নে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

পাঠ-উপকরণ প্রস্তুতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল শিক্ষক, আধিকারিক এবং কর্মীদের আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাই এবং ছাত্রদের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি।

অধ্যাপক (ড.) রঞ্জন চক্রবর্ত্তী
উপাচার্য

Netaji Subhas Open University
Under Graduate Degree Programme
Choise Based Credit System (CBCS)
(নির্বাচন ভিত্তিক মূল্যমান ব্যবস্থা)
Subject : Honours in Economics
Course Code : GE-CO-41

প্রথম মুদ্রণ : ফেব্রুয়ারি, 2023
First Print : February, 2023

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের দূরশিক্ষা ব্যুরোর বিধি অনুযায়ী মুদ্রিত।
Printed in accordance with the regulations of the Distance Education Bureau of the University Grants Commission.

পরিচিতি

Netaji Subhas Open University
Under Graduate Degree Programme
Choise Based Credit System (CBCS)
(নির্বাচন ভিত্তিক মূল্যমান ব্যবস্থা)
Subject : Honours in Economics
Course Code : GE-CO-41
পাঠক্রম : ভারতের রাজনৈতিক অর্থনীতি : ১৯৪৭-২০১৮
Course : Political Economy of India : 1947-2018
(Applicable for HEC)

বিষয় সমিতি :

সদস্যবৃন্দ

অনির্বাণ ঘোষ
Director (i/c), SPS, NSOU
(Chairperson)
সেবক জানা
Professor of Economics, Vidyasagar University
বিবেকানন্দ রায়চৌধুরী
Associate Professor of Economics, NSOU
অসীম কুমার কর্মকার
Assistant Professor of Economics, NSOU
ধীরেন কোনার
Professor (Former) of Economics,
University of Kalyani
বিশ্বজিৎ চ্যাটার্জী
Professor of Economics, NSOU
সেখ সেলিম
Associate Professor of Economics, NSOU
পূর্বা রায়চৌধুরী
Associate Professor of Economics,
Bhowanipore Education Society

: রচনা :

অসীম কুমার কর্মকার
Assistant Professor of Economics,
Netaji Subhas Open University

: সম্পাদনা :

বিশ্বজিৎ চ্যাটার্জী
Professor of Economics
Netaji Subhas Open University
এবং
সেখ সেলিম
Associate Professor of Economics, NSOU

: বিন্যাস সম্পাদনা :

প্রিয়ন্থী বাগচী
Assistant Professor of Economics, Netaji Subhas Open University

ঘোষণা

এই পাঠ উপকরণের সমুদায় স্বত্ব নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সংরক্ষিত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ব্যাতিরেকে এই পাঠ উপকরণের কোনো অংশের পুনর্মুদ্রণ বা পুনরুৎপাদন এবং কোনো রকম উদ্ধৃতি সম্পূর্ণ বে-আইনি ও নিষিদ্ধ। এই বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রয়োজনীয় বিধিসম্মত আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

ড. অসিত বরণ আইচ
নিবন্ধক (কার্যনির্বাহী)

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

পাঠক্রম : ভারতের রাজনৈতিক অর্থনীতি : ১৯৪৮-২০১৮

Course : Political Economy of India : 1948-2018

Course Code : GE-CO-41

(Applicable for HEC)

একক : 1 □	অর্থনৈতিক পরিকল্পনার একাধিক লক্ষ্য	**7-23**
একক : 2 □	গতিশীল শিল্পায়ন এবং মন্থর কৃষি : একটি দ্বন্দ্ব	**24-40**
একক : 3 □	পরিকল্পনার সমাজতান্ত্রিক নীতির ওপর আক্রমণ	**41-55**
একক : 4 □	জরুরি অবস্থা জারি এবং এর বাইরে যা কিছু	**56-65**
একক : 5 □	সামষ্টিক অর্থনৈতিক সংস্কার, বেসরকারিকরণ এবং উদারীকরণ	**66-81**
একক : 6 □	দ্বিতীয় প্রজন্মের সংস্কার এবং এর বাইরে	**82-100**
	পরিশিষ্ট—1	**101-106**
	পরিশিষ্ট—2	**107**

একক 1 ◘ অর্থনৈতিক পরিকল্পনার একাধিক লক্ষ্য

গঠন

1.1 উদ্দেশ্য

1.2 প্রস্তাবনা

1.3 ১৯৪৭ এবং ১৯৫০ সালের মধ্যে অ্যাড হক নীতি

1.4 ভারতীয় সংবিধানের অধীনে সামাজিক ন্যায়বিচার

1.5 প্রথম পরিকল্পনার খসড়া রূপরেখা

1.6 প্রথম পরিকল্পনার অধীনে বিভিন্ন কর্মসূচি

1.7 সারসংক্ষেপ

1.8 অনুশীলনী

1.9 গ্রন্থপঞ্জী

1.1 উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে জানা যাবে :

ভারতে—

- ১৯৪৭ এবং ১৯৫০ সালের মধ্যে যে সব অ্যাড্ হক নীতি নেওয়া হয়েছিল;
- সংবিধানের অধীনে সামাজিক ন্যায়বিচার কী ছিল;
- পরিকল্পনার একটি খসড়া রূপরেখা, এবং তৎসহ
- প্রথম পরিকল্পনার অধীনে যে সমস্ত বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছিল, সেসব।

1.2 প্রস্তাবনা

ভারতের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা নিয়ে যাঁরা গভীরভাবে ভেবেছিলেন তাঁরা অন্তত এটা বুঝেছিলেন যে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং তার সঙ্গে সামাজিক ও আর্থিক সাম্য (social and economic equality) একত্রে লাভ করতে হলে সরকারি উদ্যোগের ক্ষেত্র বাড়াতে হবে। সর্বস্তরে উৎপাদন বাড়ানোতে সহায়তা করার জন্য কয়লা, খনিজ তেল, বিদ্যুৎ, রেলপথ, রাসায়নিক সার ইত্যাদি ক্ষেত্রের প্রসার বাড়ানোর জন্য সরকারি উদ্যোগের ক্ষেত্র আবশ্যিক, যা বেসরকারি উদ্যোগে সম্ভব নয়। ব্যাংক, জীবনবিমা ইত্যাদিকে সরকারি ক্ষেত্রে আনবার পক্ষেও একই যুক্তি—'গুরুত্বপূর্ণ শিখর ক্ষেত্রগুলিকে (strategic heights) ব্যক্তিগত মালিকানায় রাখলে কাম্য প্রসার আসবে না। একথা স্বীকার্য যে, ব্যাংকগুলিকে সরকারের হাতে না রাখলে ভারতের গ্রামাঞ্চলে বহু ব্যাংক-অফিস স্থাপিত হত না। আবার একথাও

স্বীকার্য যে, শিল্পের ক্ষেত্রে ছোট ও কুটীরশিল্পের মালিকানা বেসরকারি এবং বড় শিল্পেরও অনেকগুলি ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত মালিকানায় না রেখে অন্য পথও ভারতের ক্ষেত্রে পাওয়া যায়নি। ফলে, সরকারি ও বেসরকারি ক্ষেত্র একই সঙ্গে চালাতে হল। সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ একই সঙ্গে চললে যে অবস্থার সৃষ্টি হয় তার পারিভাষিক নাম 'মিশ্র অর্থনীতি'। এই মিশ্রনীতি-ভিত্তিক পরিকল্পনা দিয়েই ভারতের যাত্রাপথ শুরু হয়েছিল, যার সূচনা ধরা হয় ১৯৪৮-এর শিল্পনীতি ঘোষণাতে। স্বাধীনতা লাভের ৯ মাসের মধ্যেই এই ঘোষণা প্রকাশ করা হয়। তখনও পরিকল্পনা কমিশন গঠিত হয়নি এবং পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কাজেও হাত দেওয়া হয়নি। ১৯৪৮-এর শিল্পনীতির মূল ভিত্তি ছিল 'মিশ্র অর্থনীতি' আর উদ্দেশ্য ছিল সব রকম শিল্পকে শ্রেণিবিভক্ত করা যাতে কোথায় সরকারি উদ্যোগ এবং কোথায় বেসরকারি উদ্যোগের ব্যবস্থা হবে সেটা নির্দিষ্ট হয়। সমস্ত শিল্পকে চার শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছিল। নতুন শিল্পনীতি কার্যকর করার উদ্দেশ্যে ১৯৫১ সালে 'শিল্প' (উন্নতি ও নিয়ন্ত্রণ) আইন' [Industries (Developmnt and Regulation Act, 1951)] পাশ করা হয়। এই আইনে শিল্পের জন্য লাইসেন্সের ব্যবস্থা করা হল, যার ফলে একটি নিম্নসীমার ওপরে মূলধন নিয়োগ করতে হলে নতুন উদ্যোগকে বা পুরোনো উদ্যোগের প্রসারের ক্ষেত্রে ভারত সরকারের কাছ থেকে লাইসেন্স নিতে হবে। বেসরকারি উদ্যোগের পরিমাণ ও বণ্টন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের অধিকারও সরকারকে দেওয়া হল। প্রয়োজনবোধে সরকার এদেরকে অধিগ্রহণও করতে পারবে। এদের সঙ্গে নিয়েই ১৯৫০ সালে পরিকল্পনা কমিশন গঠন করা হল এবং প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ১৯৫১ সাল থেকে পরিকল্পিত উন্নয়নের কর্মনীতি শুরু হল।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৪৪ সালে স্যার পুরুষোত্তম দাস ঠাকুরদাসের নেতৃত্বে ভারতের আটজন বড় শিল্পপতি একটি সার্বিক পরিকল্পনার রূপরেখা প্রণয়ন করেন। এর শিরেনামে ছিল "A Plan for Economic Development" যা 'বোম্বাই পরিকল্পনা' নামে জনপ্রিয় হয়। এই পরিকল্পনার খসড়া তৈরির সঙ্গে টাটা, বিড়লা, শ্রীরাম, জন মাথাই (যিনি নেহরু সরকারের অর্থমন্ত্রী হয়েছিলেন) প্রমুখ অগ্রণী শিল্পপতিরা যুক্ত ছিলেন। রাজনৈতিক স্বার্থেই এই পরিকল্পনায় বেসরকারি উদ্যোগের ওপর তুলনায় বেশি জোর দেওয়া হয়েছিল। ডিটমার রদারমুন্ড এ প্রসঙ্গে বলেছেন যে—

বোম্বাই পরিকল্পনার লক্ষ্যই ছিল মিশ্র অর্থনীতি জোরদার করা (Mixed economy was an avowed aim of 'Bombay Plan')। রাষ্ট্র টাকাপয়সা দেবে এবং মূল শিল্পকে চালাবে, যার জন্য বিনিয়োগ হবে অনেক বেশি, অথচ মুনাফা হবে সীমিত এবং বেসরকারি ধনতন্ত্রীরা সেইসব ক্ষেত্রগুলিতে নজর রাখবে যেখানে তাদের দ্রুত মুনাফা জুটবে। এই বোম্বাই পরিকল্পনার সমালোচনাগণ সেইহেতু এই পরিকল্পনাকে 'ফ্যাসিস্ট' (fascist) বলে আখ্যায়িত করেছেন, কেননা এটা হল সরকারি ও বেসরকারি ক্ষেত্রের পারস্পরিক নির্ভরশীলতার উপায় বা symbiosis, যেখানে বেসরকারি ক্ষেত্র মুনাফা লুটবে, আর অন্যদিকে সরকারি ক্ষেত্রেকে নির্ভর করতে হবে করদাতাদের অর্থে।

এই 'বোম্বাই পরিকল্পনা' শুধুমাত্র বামঘেঁষাদের দ্বারাই সমালোচিত হয়নি। তা ভাইসরয়ের আর্থিক উপদেষ্টা লর্ড ওয়েভেল দ্বারাও সমালোচিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, ভারতের শ্রমিকশ্রেণিও এই বোম্বাই পরিকল্পনার বিরোধিতা করে। তাদের মূল অভিযোগ ছিল যে, এই পরিকল্পনায় ব্যক্তিগত পুঁজির ওপর বেশি জোর দেওয়া হয়েছে। ফলে শ্রমিকশ্রেণি এই পরিকল্পনাকে সন্দেহের চোখে দেখে। এজন্য ১৯৪৪ সালেই বিপ্লবী মানবেন্দ্র নাথ রায়-এর নেতৃত্বে 'Indian

Federation of Labour' একটি বিকল্প People's Plan পেশ করে।

মহাত্মা গান্ধিও এধরনের শিল্পনির্ভর আর্থিক উন্নয়ন পরিকল্পনার বিরুদ্ধে ছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন পরিকল্পনার বিকেন্দ্রীকরণ, যা বর্তমানের তৃণমূলস্তরের পরিকল্পনার বীজ। মহাত্মা গান্ধির অর্থনৈতিক ধারণায় ছিল গ্রাম, ক্ষুদ্র স্বদেশি শিল্প, সমবায় এবং মূল শিল্পের জাতীয়করণ। তাঁর ধারণাগুলির ভিত্তিতে শ্রীমান নারায়ণ আগরওয়াল ১৯৪৪ সালে গান্ধিবাদী পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। অবশ্য এই গান্ধিবাদী পরিকল্পনা (Gandhian Plan) পরবর্তী পরিকল্পনার রচয়িতাদের সন্তুষ্ট করতে পারেনি। নেহরুও এই ধরনের পরিকল্পনার পক্ষপাতী ছিলেন না।

উপরোক্ত পরিকল্পনাগুলির ঐতিহাসিক গুরুত্ব থাকলেও সেগুলি ছিল নিতান্তই কাগুজে পরিকল্পনা, যা কখনও রূপায়িত হয়নি। বড় শিল্পপতি, জে. আর. ডি. টাটা, বিড়লা, ও জন মাথাই স্বাধীন ভারতে বেশ প্রভাবশালী ছিলেন। ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাকে ধর্তব্যের মধ্যে আনলে 'মিশ্র অর্থনীতির' সপক্ষে তাঁদের গুণগান মিশ্র অর্থনীতিকেই প্রাধান্য দিল। এই ভাবেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ এবং পরিকল্পনার রূপায়ন ভারতের আর্থিক উন্নয়নে বেশ বড়সড় একটা জায়গা করে নিল।

ইতিমধ্যে ১৯৩৮-এ নেহরুর অনুপ্রেরণায় ন্যাশনাল প্ল্যানিং কমিটি (NPC) গঠিত হয়। কমিটি এই মত প্রকাশ করে যে সমস্ত বড় শিল্প যা একচেটিয়া প্রতিষ্ঠানের রূপ নিতে পারে, সেগুলি সরকারি নিয়ন্ত্রণে থাকা বাঞ্ছনীয়। এই মত প্রথমদিকের পরিকল্পনায় গভীর প্রভাব ফেলে। প্রধানমন্ত্রী নেহরু ১৯৫০ সালে (ততদিনে ভারত স্বাধীন) ভারতে পরিকল্পনা কমিশন গঠন করেন। অনেক নিয়মকানুন মেনেই ১৯৫০-৫১ সালে ভারতের প্রথম পরিকল্পনা রূপায়িত হয়। তারপর বেশ কয়েকটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা এবং বার্ষিক পরিকল্পনা রচিত ও রূপায়িত হয়েছে। এরপর ২০১৫ সালের ১লা জানুয়ারি মোদী সরকার পরিকল্পনা কমিশন বাতিল করে তার বদলে নিয়ে এসেছে NITI (National Insititution for Transforming India) আয়োগ। এই NITI আয়োগ পরিকল্পনা কমিশনের বদলে সরকারের Policy Think Tank হিসাবে কাজ করছে। দ্বাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (২০১২-১৭) ছিল ভারতের শেষ পরিকল্পনা।

এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা ভারতীয় পরিকল্পনার ওপর একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা টানলাম। এবার আসি পরিকল্পনার সংজ্ঞায়। পরিকল্পনা মানেই উন্নয়ন পরিকল্পনা। পূর্বনির্ধারিত লক্ষ্য সাধনের জন্য কোনো নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে দেশের সরকার যখন সচেতন ও সতর্কভাবে দেশের ভোগ, বিনিয়োগ, সঞ্চয় ইত্যাদি প্রধান বিষয়গুলির ওপর জোর দিয়ে তাকে পরিচালিত করে এবং প্রত্যক্ষভাবে তাকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চালায়, তখন তাকেই উন্নয়মূলক পরিকল্পনা বলে। অর্থশাস্ত্রী ডিকিনসন পরিকল্পনার যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তা প্রণিধানযোগ্য। সামগ্রিকভাবে কোনো অর্থনীতির পূর্ণাঙ্গ সমীক্ষার ভিত্তিতে ওই দেশে কোন্ কোন্ দ্রব্য কত পরিমাণ উৎপাদন করা হবে এবং উৎপাদিত দ্রব্যগুলি কাদের মধ্যে বণ্টিত হবে ইত্যাদি বিষয়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাকেই (উন্নয়ন) পরিকল্পনা বলে।

পরিকল্পনার ফ্রেম এমনভাবে তৈরি করা হয়েছিল যা নেহরু-রচিত আর্থিক ও সামাজিক লক্ষ্যের দিকে ধাবিত ছিল। যেমন—(১) 'সরকারি ক্ষেত্রের পরিধি এবং গুরুত্ব বৃদ্ধি পাওয়া এবং এইভাবেই সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ গঠন করা; (২) ভারী শিল্পের উন্নয়ন এবং অর্থনৈতিক স্বাধীনতার ভিত্তিমূল শক্তিশালী করা; (৩) শ্রম-নিবিড় গ্রামীণ এবং ক্ষুদ্র শিল্পের বিকাশ ঘটানোর জন্য ভোগ্য দ্রব্যের উৎপাদন বাড়ানো যাতে নিয়োগ বাড়ে এবং এর সুফল বিশেষত সমাজের দরিদ্র শ্রেণির মধ্যে সংঞ্চারিত হয় যাতে আয়ের একটা বড় অংশ যেন তাদের কাছে পৌঁছায়; (৪) দশ

বছরের মধ্যে বেকারি দূর করা; (৫) কৃষি উৎপাদন বাড়ানো; এবং (৬) বাসস্থান, স্বাস্থ্য এবং শিক্ষাক্ষেত্রের মতো সামাজিক পরিষেবার গুণগত মানের উন্নয়ন ঘটে বিশেষ করে জনসংখ্যার দরিদ্র শ্রেণিদের মধ্যে। সব মিলিয়ে এইসব কর্মপন্থা জাতীয় আয় প্রায় ২০ শতাংশ নিঃসন্দেহে বাড়াবে এবং তৎসহ অর্জিত হবে আরো বেশি করে আয় বণ্টনের সাম্য ("to achieve a more equitable distribution of income".)। অর্থনীতির কাঠামোগত পরিবর্তনও এই সময় ধরা হয়েছিল। এছাড়াও, পরবর্তী সময় সীমায় আরও কিছু লক্ষ্য নেওয়া হয়েছিল—যেমন আয় ও সম্পদ বণ্টনের বৈষম্য হ্রাস করা, মুদ্রাস্ফীতি রোধ করা, সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা, বৈদেশিক বাণিজ্যে ঘাটতি দূর করা এবং অর্থনৈতিক স্বয়ম্ভরতা অর্জন ও পরিশেষে দারিদ্র্য দূর করা, উন্নয়নে আঞ্চলিক অসাম্য দূর করা, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করা, আত্মনির্ভর শোষণমুক্ত সমাজ গড়ে তোলা, সুস্থিত উন্নয়ন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতি ঘটানো, মানবসম্পদের বিকাশ ঘটানো, পরিকাঠামো শক্তিশালী করা, প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্বজনীন করা, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করা এবং দ্রুততম, বহনক্ষম ও সর্বহিতকর প্রবৃদ্ধি অর্জন করা।

1.3 ১৯৪৭ এবং ১৯৫০ সালের মধ্যে অ্যাড্ হক নীতি

প্রকৃতপক্ষে, ১৯৪৭ থেকে ১৯৫০ সালের মধ্যে বেশ কয়েকটি অ্যাড্ হক অর্থনৈতিক নীতি বা আপাতত কাজ চলার মতো কিছু কর্মপদ্ধতি দেখা গেছে যা ব্যক্তিগত বিনিয়োগের জন্য একটি অনুকূল পরিবেশ তৈরি করার জন্য নির্মাণ করা হয়েছিল। বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ ছিল যে যুদ্ধকালীন মূল্য নিয়ন্ত্রণ, খাদ্যশস্য, চিনি, তুলা এবং কাপড়ের সামগ্রিক অভাবের পরিস্থিতিতে সুষম কাঠামো বজায় রাখা উচিত, "বিশেষ করে যদি ভারতের দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনাগুলি রাষ্ট্র দ্বারা নিয়ন্ত্রণ এবং অর্থনৈতিক কার্যকলাপের দিকনির্দেশনা জড়িত থাকে।" সরকার ডিসেম্বর ১৯৪৭-এ চিনি এবং খাদ্যশস্যের ওপর নিয়ন্ত্রণ সরিয়ে দিয়েছিল। তুলা এবং কাপড়ও নিয়ন্ত্রণমুক্ত করা হয়েছিল। মূল্য বৃদ্ধি এবং মুনাফা গ্রহণ দর্শনীয় ছিল। ডিসেম্বর ১৯৪৭ থেকে জুলাই ১৯৪৮ পর্যন্ত, খাদ্যশস্যের পাইকারি মূল্য সূচক সবচেয়ে বেশি ৫৮ শতাংশ বেড়েছে। অন্য সব ভোগ্যপণ্যের দাম প্রায় এক-তৃতীয়াংশ বেড়েছে। জুলাই এবং আগস্ট মাসে কাপড় এবং তুলার ওপর নিয়ন্ত্রণ পুনরায় আরোপ করতে হয়েছিল। যেমন, সেপ্টেম্বরে খাদ্যশস্যের ওপর; এবং ডিসেম্বরে চিনির ওপর। এদিকে, নভেম্বর, ১৯৪৭ থেকে ১৯৪৯ সালের নভেম্বরের মধ্যে দুই বছরে, সাধারণ মূল্য সূচক পাকাপাকিভাবে প্রায় ২৩ শতাংশ থেকে ২৯ শতাংশ বেড়ে গিয়েছিল। একই সময়ে ১৯৪৮-৪৯-এর মধ্যে ভোগ্যপণ্যের উদার আমদানি সরকারি রিজার্ভকে কমিয়েছে (টাকার অংকে) ৬০০ কোটি। সেপ্টেম্বর ১৯৪৯-তে এই আমদানি উদারীকরণের জন্য টাকার অবমূল্যায়নের জন্য চাপ বাড়িয়েছে। একই সময়ে ব্যবসায়ী সম্প্রদায় রেকর্ড মুনাফা নিচ্ছিল। ১৯৪৯-৫০-এর কেন্দ্রীয় বাজেটে এটি প্রতিফলিত। ব্যক্তিগত এবং কর্পোরেট আয়ের উপর প্রত্যক্ষ কর হ্রাস করার জন্য পরোক্ষ কর, বিশেষ করে বিক্রয় কর বৃদ্ধির মাধ্যমে মোট ঘাটতি পূরণ করতে হয়। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রকাশনা 'স্বাধীনতার দ্বিতীয় বছর, আগস্ট ১৯৪৮—আগস্ট ১৯৪৯, ব্যাখ্যা করে যে "সরকারের সামনে সবচেয়ে গুরুতর সমস্যা ছিল পুঁজিবাদের স্থবিরতা যার ফলে সেই বাজারের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে গভীর অন্তর্নিহিত ভয় তৈরি করা হয়েছিল যাতে সঞ্চয় এবং বিনিয়োগের উদ্দীপনা পুনরুজ্জীবিত করা যায়। তাছাড়া, সাধারণভাবে মানুষের জীবনযাত্রার মান বাড়াতে অভিপ্রেত পরিকল্পনার বাস্তবায়ন বিলম্বিত হতে বাধ্য। অর্থমন্ত্রী তাই প্রস্তাব করেছিলেন জনসাধারণের মনে আস্থা পুনরুজ্জীবিত করার এই মৌলিক বিষয়ের সাথে রিলিফের কিছু ব্যবস্থা।"

এসব ছাড়াও আরও কিছু ছিল। এপ্রিল, ১৯৪৮-এ সরকার তাদের শিল্প নীতি রেজুলেশন প্রকাশ করে। শুধুমাত্র

অস্ত্র ও গোলাবারুদ, পারমাণবিক শক্তি এবং রেলওয়ে তৈরির ওপর সরকারি একচেটিয়া আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হবে। সরকার কয়লা, লোহা ও ইস্পাত, খনিজ দ্রব্য, জাহাজ নির্মাণ, উড়োজাহাজ এবং টেলিফোন এবং টেলিগ্রাফ যন্ত্রপাতি তৈরিতে নতুন উদ্যোগ শুরু করার একচেটিয়া অধিকার সংরক্ষণ করেছিল, যদিও "জাতীয় স্বার্থের প্রয়োজনে বেসরকারি খাতের সহযোগিতা চাওয়া হবে।" একইসঙ্গে, রেজুলেশনে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়কে আশ্বাস দেওয়া হল যে বিদ্যমান কোনো প্রতিষ্ঠানকে জাতীয়করণ করা হবে না। অধিকন্তু, নতুন উদ্যোগগুলিকে দশবছরের জন্য সর্বজনীন অধিগ্রহনের সমস্ত সম্ভাবনা থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছিল। শেষমেষ, সরকার বিদেশি সংস্থাগুলিকে আশ্বস্ত করল এই বলে যে তারা ভারতীয়-মালিকানাধীন এন্টারপ্রাইজের মতো একই পরিস্থিতিতে কাজ চালিয়ে যেতে পারে। ম্যানেজিং এজেন্সি সিস্টেমের মাধ্যমে বেশ কয়েকটি ফার্মের উপর ব্যবস্থাপনারত নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগকারী বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলিকে ভেঙে দেওয়ার জন্য কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। বরং, অতিরিক্ত বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার জন্য প্রধান ব্রিটিশ গোষ্ঠীগুলির সাথে আলোচনা চলছিল।

তথাপি, এখন পর্যন্ত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগগুলি ছিল : সম্পত্তির অধিকারী শ্রেণির স্বার্থ রক্ষার লক্ষ্যে নতুন রাজনৈতিক ব্যবস্থার আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোতে অন্তর্ভুক্ত করা। "ডুমভিরেট" (Duumvirate)-এর সময়কালে—যা ১৯৫০ সালের ডিসেম্বরে সর্দার প্যাটেলের মৃত্যুর আগে পর্যন্ত চলছিল—সরকার সাংবিধানিক ব্যবস্থাগুলির উপর কয়েকটি মূল সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যা অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংস্কারের সরাসরি বাস্তবায়নের জন্য কেন্দ্রের ক্ষমতার উপর খুব সংকীর্ণ সীমা নির্ধারণ করেছিল।

বলাবাহুল্য, ভারতীয় সংবিধান এই সময়েই তৈরি হয়েছিল। এখানে উল্লেখ্য, ১৯৬০-এর সংবিধানের সাম্যতার অধীনে এল— 'Directive Principles of State Policy'। এগুলি রাজ্যগুলিকেও সংযুক্ত করল যাতে সুরক্ষিত রাখা হল জীবনযাত্রার সঠিক উপায় সব নাগরিকদের জন্য আর্থিক ব্যবস্থা এমনভাবে কার্যকর করা যাতে সম্পদ ও উৎপাদনের কেন্দ্রীকরণ এড়ানো যায়। সমাজের দরিদ্রতম শ্রেণির জন্য, বিশেষ তপশিলী জাতি ও উপজাতিদের মধ্যে শিক্ষা ও আর্থিক উন্নতি ঘটে, যাতে তারা সমস্ত রকমের শোষণ ও অবিচার থেকে রক্ষা পেতে পারে। উদ্ভূত হল অনুচ্ছেদ ১৯ (Article-19), অনুচ্ছেদ ৩১ (Article-31), অনুচ্ছেদ ৩২ (Article-32), যাতে কেউ সুপ্রিম কোর্ট বা/নিম্নতর কোর্টে তার মৌলিক অধিকার সুরক্ষিত ও কার্যকর করতে পারে। জমিদারি বিলোপ আইনটিও এই সময় পাশ করা হয় নেহরুর আর্তিতে। কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের কথাও আসে এ সময়ে। অনুচ্ছেদ ৩৫২-৩৫৫ (Articles, 352-355) রাষ্ট্রপতিকে এই ক্ষমতা দিল যাতে তিনি ভারত বা ভারতের কোনো অংশে সুরক্ষার দুর্যোগ ঘনিয়ে এলে তিনি জরুবিঅবস্থা জারি করতে পারেন; তা বাইরের শত্রুর আক্রমণেই হোক বা অভ্যন্তরীণ ঝামেলার জন্যই হোক-না-কেন।

১৯৪৯-এ নেহরু গণতান্ত্রিক সামাজিক সংস্কারের জন্য, উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার জন্য ক্যাবিনেটের সম্মতি পেলেন। ওই বছরের শেষেই ফের একবার পরিকল্পনা কমিশন গঠন করার জন্য তিনি উঠেপড়ে লাগলেন। ফের তিনি সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল ও সরকারি আধিকারিকগণ দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হলেন। কিন্তু উত্তরোত্তর বর্ধমান আর্থিক পরিস্থিতি সামলানো ব্যক্তিগত উদ্যোক্তাদের দ্বারা সম্ভব হচ্ছিল না বলে এতে নেহেরুর হাতই শক্ত হল। ১৯৫০ সালের ২৫ জানুয়ারি ওয়ার্কিং কমিটি শেষমেশ পরিকল্পানা কমিশন গঠন করার সপক্ষেই রায় দিল। শেষে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হল পরিকল্পনা নীতির ওপর সব সুপারিশই বিবেচনার জন্য ক্যাবিনেটে জমা দিতে হবে তার আদেশ পাবার জন্য।

''The Directive Principles of State Policy were accepted as the guide to the "economic and social pattern to be attained through planning". যদিও প্রথম পরিকল্পনার খসড়া প্রস্তাব সামাজিক ও প্রতিষ্ঠানগত রূপান্তরের পক্ষে রায় দিলেও, ঠিকঠিকভাবে বলতে গেলে, সমস্ত প্রোগ্রামের একটি অর্থনৈতিক লক্ষ্য ছিল—তা হল উৎপাদন বাড়ানো। যদিও কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে প্রতিষ্ঠানগত সংস্কারের তেমন কোনো ভূমিকা ছিল না, তবে একথা স্বীকার্য যে খসড়া প্রস্তাবটি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছিল, কৃষি-উন্নয়নে, শক্তি, সেচ ও গ্রামীণ উন্নয়নে। এই জোর দেওয়ার কারণ স্বরূপ খসড়া প্রস্তাবটি উল্লেখ করেছিল—"The shortage of food and raw materials is at present the weakest point in the country's economy and a greatest break on a faster tempo of development in the future". (প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা—একটি *খসড়া প্রস্তাব*, পৃষ্ঠা-৭৫)।

১৯৫২ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তিম ভাষ্য বের হল। জাতীয় আর্থিক ও সামাজিক নীতি নির্ধারণে নেহরুর নতুন কর্তৃত্বই বিজয়কেতন ওড়াল।

1.4 ভারতীয় সংবিধানের অধীনে সামাজিক ন্যায়বিচার

১৯৪৯ সালে সংবিধান নিবদ্ধ করা থেকে ভারতের রাষ্ট্রীয় গণতন্ত্রের সূচনা। ভারতের সংবিধানই হল ভারতের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় চিন্তার ভিত্তিস্থল। কিন্তু ভারতীয় সংবিধান কোনো ভারতীয় চিন্তার ফসল নয়। এই সংবিধানের আদি 'Government of India Act 1935'—যা ছিল ব্রিটিশদের তৈরি। এর পিছনে ছিল ইউরোপ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থার গণতন্ত্রীকরণের ইতিহাস। অর্থাৎ ভারতের সংবিধান একান্তভাবে ইউরোপীয় রাষ্ট্রীয় চিন্তার ফসল।

১৯৪৭ সালের পর স্বাধীন ভারত তার সংবিধানকে অবলম্বন করেই ভারতে একটি দৃঢ় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়েছে। প্রাথমিকভাবে বলা যায়, ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে এই আধুনিক গণতন্ত্রের চিত্র বিবর্ণ নয়। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, ভারতই একমাত্র প্রথম অপশ্চিমী দেশ তথা উন্নয়নশীল (গরিব) দেশ, যে একটি দৃঢ় নিবদ্ধ গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন করল যেখানে বিদ্যমান বহুদলভিত্তিক নির্বাচন, সামরিক বাহিনীকে নাগরিক শাসন ব্যবস্থায় অধীনে স্থাপন, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, সংখ্যালঘুর নিরাপত্তা, সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, বাক্ স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা, প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার, গোপন ব্যালট ব্যবস্থা প্রথা ইত্যাদি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হল সংবিধানকে অবলম্বন করেই—এটি খাটো করে দেখা সমীচীন নয়। বলা বাহুল্য, গণতন্ত্র একটি সামাজিক হাতিয়ার। এর দ্বারা সামাজিক অসাম্য, অধিকার কতটুকু দূর হল বা সামাজিক ন্যায়বিচার জনগণ কতটা পেল, তাই বিবেচ্য। এখন জানা যাক, ভারতীয় সংবিধানের অধীনে সামাজিক ন্যায়বিচার কতটা স্থান পেয়েছে।

ন্যায়বিচারের ধারণা সভ্যতা ও সমাজের মতোই পুরনো। ন্যায়বিচার ছাড়া আইনসম্মত সমাজের অস্তিত্ব থাকতে পারে না। যে-কোনো জাতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভগুলোর একটি হল ন্যায়বিচার। ন্যায়বিচারের উপস্থিতি ছাড়া একটি আইনসম্মত সমাজ থাকতে পারে না। যে-কোনো জাতির বৃদ্ধির পেছনে এটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ।

'ন্যায়বিচার হল স্বেচ্ছাচারিতার বিপরীতে আইনের সঠিক প্রয়োগ।' আইনের সঠিক প্রয়োগ বলতে বোঝায় "আইনের যথাযথ প্রয়োগ"। আইনের সঠিক ব্যাখ্যা ও প্রয়োগের মাধ্যমেই সমাজে ন্যায়বিচার পাওয়া যায়।

ন্যায়বিচার মানে প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার প্রাপ্য দেওয়া। ন্যায়বিচার এবং ন্যায্যতা ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত শব্দ যা কখনো-কখনো একে অপরের জায়গায় ব্যবহৃত হয়। ন্যায়বিচার মানে ন্যায্যতার মান।

একটি সভ্য সমাজ তার প্রশাসন ব্যবস্থায় ন্যায়বিচারের অস্তিত্ব ছাড়া যে থাকতে পারে না তা প্রমাণ করার জন্য ঐতিহাসিক প্রমাণ রয়েছে। যে সভ্যতাগুলোতে ন্যায়সঙ্গত ব্যবস্থার উপস্থিতি ছিল না সেগুলো সময়ের সাথে সাথে বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

সমাজের আবির্ভাব এবং সমাজের অগ্রগতির সাথে সাথে প্রশাসনিক ব্যবস্থায় ন্যায়বিচার অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পেয়েছে যার কারণে ক্ষমতায় থাকা ব্যক্তিদের দৃষ্টিভঙ্গি আরও সতর্ক ও নিয়মতান্ত্রিক হয়েছে।

ন্যায়বিচার হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নৈতিক এবং রাজনৈতিক ধারণাগুলির মধ্যে একটি, যার কোনো সর্ব সম্মত সংজ্ঞা নেই। ন্যায়বিচারের দাবি নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে এবং সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে অর্থ লাভ করে। ন্যায়বিচার একটি বিবর্তনীয় ধারণা। প্রাচীন গ্রীক সভ্যতা থেকে আধুনিক সমাজে ন্যায় শব্দের অর্থ পরিবর্তন জানা আকর্ষণীয়।

ন্যায়বিচারের ধারণাটি ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনায় নিহিত রয়েছে। ভারতীয় সংবিধানের প্রণেতারা দেশে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তাই তাঁরা এটি নিশ্চিত করেছিলেন ভারতীয় সংবিধানের তৃতীয় ও চতুর্থ অংশে।

ভারতীয় সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৪, ১৫, ১৬ এবং ১৭ সংবিধানের প্রস্তাবনায় নিহিত ন্যায়বিচারের ধারণাকে প্রতিফলিত করে। এই সমস্ত অনুচ্ছেদগুলি সংবিধানের তৃতীয় অংশের অধীনে অন্তর্ভুক্ত করা হযেছে যা প্রতিটি নাগরিককে মৌলিক অধিকার দেয়।

'সম ন্যায়বিচার এবং বিনামূল্যে আইনি সহায়তা' সম্পর্কিত বিধানগুলি ভারতীয় সংবিধানের ৩৯ক অনুচ্ছেদে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যা প্রত্যেক নাগরিককে আদালতের কর্মকর্তাদের কাছ থেকে বিনামূল্য আইনি সহায়তা পাওয়ার অধিকার দেয়। বিনামূল্যে আইনি সহায়তা পেতে কাউকে বঞ্চিত করা যাবে না। রাষ্ট্রের দায়িত্ব নিশ্চিত করা আইনি ব্যবস্থার কাজ ন্যায়বিচারের ওপর ভিত্তি করে। এটিকে সমান সুযোগ প্রদান করা উচিত, এবং বিনামূল্যে আইনি সহায়তা প্রদান করা উচিত, যাতে নিশ্চিত করা যায় যে নাগরিকগণ ন্যায়বিচারের সুরক্ষার কোনও সুযোগ থেকে তারা বঞ্চিত না হয়।

ভারতীয় সংবিধানে ৩৮ এবং ৩৯ অনুচ্ছেদ বণ্টনমূলক ন্যায়বিচারকে সংজ্ঞায়িত করে। বণ্টনমূলক ন্যায়বিচার মানে নাগরিকদের মধ্যে সম্পদের সুষ্ঠু বণ্টন।

ভারতীয় সংবিধানে তিন ধরনের ন্যায়বিচারের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে—

(১) সামাজিক ন্যায়বিচার। (২) অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার। (৩) রাজনৈতিক ন্যায়বিচার।

❑ সামাজিক ন্যায়বিচার :

সামাজিক ন্যায়বিচার মানে বৃহত্তর সংখ্যক জনগণের জন্য বৃহত্তম ভালো এবং সবাইকে সমানভাবে বিবেচনা করা উচিত। কেশবানন্দ ভারতী মামলায় সর্বোচ্চ আদালত রায় দিয়েছে যে সামাজিক ন্যায়বিচার ভারতীয় সংবিধানের মৌলিক কাঠামোর অংশ।

সামাজিক ন্যায়বিচার বলতে বোঝায় জাতি, লিঙ্গ বা বর্ণের ভিত্তিতে কোনো বৈষম্য ছাড়াই প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যক্তিগত বিকাশের জন্য সমান সামাজিক সুযোগ দেওয়া।

ফলে কোনো কারণেই কোনো ব্যক্তিকে উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সামাজিক অবস্থা থেকে বঞ্চিত করা কখনোই উচিত নয়। সামাজিক ন্যায়বিচারের ধারণা সামাজিক সমতার অনুশীলনের উপর ভিত্তি করে রচিত। সামাজিক ন্যায়বিচার কেবল সেই সমাজেই কার্যকর করা যেতে পারে যেখানে শোষণের উপস্থিতি নেই। এস. আর. বোম্মাই বনাম ইউনিয়ন অফ্ ইন্ডিয়া মামলায়, সর্বোচ্চ আদালত এই রায় দিয়েছে যে সামাজিক ন্যায়বিচার এবং বিচারবিভাগীয় পর্যালোচনা ভারতীয় সংবিধানের দুটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য।

❑ অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার :

অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার একরকম সামাজিক ন্যায়বিচারেরই অংশ; ভারতীয় সংবিধানের আর্থ-সামাজিক ন্যায়বিচার রাষ্ট্রীয় নীতির নির্দেশমূলক নীতির অধীনে অন্তর্ভুক্ত করে। অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার মানে অর্থনৈতিক সুযোগ প্রদান, অর্থনৈতিক অক্ষমতা দূর করা। এটি সর্বদা সামাজিক ন্যায়বিচারের ছত্রছায়ায় বাস্তবায়িত হয়। অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার মানে সমাজের সবার মধ্যে অর্থনৈতিক সমতা থাকা। অর্থনৈতিক অবস্থার ভিত্তিতে ব্যক্তিদের মধ্যে কোনো বৈষম্য থাকা উচিত নয়। কাউকে তার অর্থনৈতিক অবস্থার কারণে কোনো সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা চলবে না।

অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার মানে জাতীয় সম্পদ ও সামাজিক সম্পদ যোগ করে দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং প্রত্যেকের মধ্যে সমানভাবে এই উৎপন্ন সম্পদ বণ্টন করা।

❑ রাজনৈতিক ন্যায়বিচার :

রাজনৈতিক ন্যায়বিচার বলতে রাজনৈতিক স্বেচ্ছাচারিতামুক্ত ব্যবস্থা। সরকারের কাজে রাজনৈতিক নিরপেক্ষতা থাকতে হবে। কোনো ব্যক্তির রাজনৈতিক মর্যাদা তাকে কোনো বাড়তি সুবিধা দেবে না এবং তার সাথে অন্য সকল নাগরিকের মতো আচরণ করতে হবে। প্রতিটি আইন তার রাজনৈতিক মর্যাদা নির্বিশেষে প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য হওয়া উচিত।

বর্তমান সময়ে বিচার বিভাগ মৌলিক অধিকারের রক্ষক হিসাবে কাজ করে। এটি ভারতীয় সংবিধানের অধীনে প্রদত্ত এই তিন ধরনের ন্যায়বিচার প্রয়োগে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দেশে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় এবং প্রস্তাবনায় প্রদত্ত ন্যায়বিচারের ধারণাকে বাস্তবে রূপ দিতে বিচার বিভাগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

ন্যায়বিচার প্রয়োগ একটি জাতির উন্নত রাজনৈতিক জীবনের জন্য অনুঘটক হিসাবে কাজ করে। উন্নত গণতন্ত্রের জন্য ন্যায়বিচারের আরও ভালো প্রয়োগ প্রয়োজন। সব ধরনের ন্যায়বিচারের উপস্থিতি ছাড়া কোনো সমাজ সাংবিধানিক সমাজ হিসেবে বিকশিত হতে পারে না।

তবে ন্যায়সঙ্গত পদ্ধতির ভিত্তিতে একটি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য সরকারের তিনটি অঙ্গের মধ্যে জোরালো সমন্বয়ের প্রয়োজন।

1.5 প্রথম পরিকল্পনার খসড়া রূপরেখা

পরিকল্পনা তৈরি করবার ভার থাকে পরিকল্পনা কমিশনের ওপর এবং এটা তার পরে অনুমোদন বা সংশোধন করে 'জাতীয় উন্নয়ন পর্ষৎ' (National Development Council)—যার মধ্যে অন্যেরা ছাড়াও আছেন প্রত্যেক রাজ্যের

মুখ্যমন্ত্রী। পরিকল্পনা কমিশনের খসড়া জাতীয় উন্নয়ন পর্ষদে গৃহীত হলে সংসদের অনুমোদন দরকার হয় এবং তখনই পরিকল্পনা চূড়ান্ত রূপ নেয়।

এই কাজে প্রধান দায়িত্ব পরিকল্পনা কমিশনের। ১৯৪৮-এ যখন প্রথম শিল্পনীতি ঘোষণা করা হয় তখনই প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু (১৮৮৯-১৯৬৪) এরকম একটা সংস্থার প্রয়োজনের কথা বলেছিলেন, কিন্তু তখন আপত্তি ওঠে। পরে অনেক বাধা অতিক্রম করে ক্যাবিনেটের অনুমতিতে পরিকল্পনা কমিশন নিযুক্ত হল মার্চ, ১৯৫০-এ। ছয় জন এই কমিশনের সদস্য—(১) নেহরু, (২) জি. এল. নন্দ, (৩) ভি. টি. কৃষ্ণমাচারী, (৪) সি. ডি. দেশমুখ, অর্থমন্ত্রী, (৫) ড. জে. সি. ঘোষ এবং (৬) কে. সি. নিয়োগী। তাছাড়াও এর বাইরে ছিলেন আরও একজন সভ্য পি. সি. মহলানবিশ। জওহরলাল নেহরু প্রধানমন্ত্রী হিসেবে হলেন এক্স-অফিসিয়ো (ex-officio) চেয়ারম্যান। ফলে তাঁর কমিশন একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক অবস্থান অর্জন করল। যদিও এটি আসলে বিশেষজ্ঞদের একটি উপদেষ্টা পর্ষদ (advisory body) ছাড়া আর কিছুই নয়। এই পর্ষদ কর্তৃক তৈরি পঞ্চবর্ষ পরিকল্পনাগুলি শুধুমাত্র guideline হিসেবে কাজ করত। আইনের অনুশাসন এখানে ছিল না।

মনে রাখা এ প্রসঙ্গে দরকার, অনেক মাস ধরে রাজ্যস্তর ও কেন্দ্রীয় স্তরে বিস্তর আলাপ-আলোচনার পর প্রথম পরিকল্পনার 'Draft Outline' ১৯৫১ সালে জুলাই মাসে উপস্থাপিত হল কিন্তু যেহেতু এই কমিশনের চেয়ারম্যান ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নেহরু সেহেতু রাজনৈতিকভাবে এর রূপায়ণের দায়ও বর্তাল নেহরুর ওপর। নেহরু একদিকে রাজনৈতিক নেতা ও অন্যদিকে প্রধান পরিকল্পনা-প্রণেতা হিসেবে যথেষ্ট দায়িত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন যথাযথভাবে এবং সংগতিপূর্ণভাবে।

মাইকেল ব্রেচার তাঁর পুস্তকে *Jawaharlal Nehru : A Political Biography* (১৯৯৮) নেহরু সম্বন্ধে যে মন্তব্য করেছেন তা প্রণিধানযোগ্য : Nehru's role in the planning process was crucial, despite the fact that he lacked knowledge of economics and finance. In fact, his influence spanned the entire process, from the drafting stage to implementation, because he stood at the centre of the decisions-making structure by virtue of his position as the Prime Minister, the Chairman of the Planning Commission, and the Chairman of the National Development Council and because he was Jawaharlal Nehru. He was the link between the planning agencies and the goverment. Secondly, he was the pivot around which discussion and decision revolved. Nay, he was the most effective salesman of planning in the country as a whole. অর্থাৎ পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় নেহরুর ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ, যদিও অর্থনীতি এবং ফিনান্স-সংক্রান্ত ব্যাপারে তাঁর জ্ঞান অল্পই ছিল, তবু তিনি ছিলেন সর্বেসর্বা—পরিকল্পনা রূপায়নে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত। তিনি একাধারে প্রধানমন্ত্রী, পরিকল্পনা কমিশনের চেয়ারম্যান, জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এবং নামটি তার জওহরলাল নেহেরু। সরকার ও পরিকল্পনা এজেন্সিদের মধ্যে তিনিই ছিলেন লিঙ্কম্যান। শুধু তাই নয়, সমগ্র দেশ জুড়ে পরিকল্পনার সবচেয়ে কার্যকরী সেলস্‌ম্যানও তিনি।

অধিকন্তু, ভারতের জাতীয় কংগ্রেস কেন্দ্র এবং ফেডেরাল স্টেট—উভয়কেই নিয়ন্ত্রণ করত। তবে এটাও জেনে রাখা দরকার যে এই কমিশনের সাংবিধানিক বা আইনগত স্বীকৃতি ছিল না, এটা পুরোপুরি প্রশাসনিক আদেশে স্থাপিত এবং প্রশাসনিক আদেশ দ্বারা এর সংগঠন ক্ষমতা, কার্যধারা সবই বদলানো যায়। তাছাড়া, যাঁরা সরকার পরিচালনা করেন তাঁরা এই কমিশনের প্রতি কী দৃষ্টিভঙ্গি নেবেন তার ওপরে এর ক্ষমতা নির্ভর করে। প্রথম দিকে নেহরুর নেতৃত্বে

এই কমিশনের প্রভাব এত বেশি হয়েছিল যে নালিশ উঠল, এটা একটা উচ্চতর ক্যাবিনেটের স্থান নিয়েছে। এই অভিযোগে একজন শীর্ষস্থানীয় মন্ত্রী পদত্যাগও করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, পরিকল্পনা কমিশনের প্রধান কাজ অবশ্য পরিকল্পনা তৈরি করা—প্রথমে একটি মূলনীতি সম্বন্ধীয় প্রস্তাব, তারপরে একটি খসড়া এবং তারও পরে চূড়ান্ত পরিকল্পনা। মনে রাখা দরকার যে, রাজ্যস্তর ও কেন্দ্রীয়স্তরে অনেক আলোচনার পর প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৫১-৫২—১৯৫৫-৫৬) যখন আরম্ভ হল তখন দেশ স্বাধীন হবার পর সাড়ে তিন বছর কেটে গিয়েছে। দেশ-বিভাগের কুফল তখন অনেকটা সহ্য হয়ে এসেছে। সরকার তখন রাজনৈতিক কারণেই উন্নয়নের কাজে হাত লাগিয়েছে। নবগঠিত পরিকল্পনা কমিশন যত্ন নিয়ে কাজ আরম্ভ করল। সরকারের হাতে ছিল যুদ্ধের সময়কার জমানো স্টার্লিং। অতএব বিদেশি মুদ্রার ঘাটতি হবে বলে তখনো কিন্তু চিন্তা ছিল না। ১৯৪৬-এ বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডার স্থাপিত হয়ে গিয়েছিল এবং ভারতের আশা ছিল যে প্রয়োজন হলে তাদের কাছ থেকে সাহায্য পাওয়া যাবে। দেশের মধ্যে তখন ১৯৪৮-এ 'ভারতীয় শিল্প অর্থ করপোরেশন' (Industrial Finance Corporation of India) স্থাপিত হয়েছে এবং ১৯৪৯-এ রিজার্ভ ব্যাংকে সরকারের মালিকানায় আনা হয়েছে। ১৯৪৯-এ স্টার্লিং-এর সঙ্গে টাকার বিনিময় হার ঠিকই থাকে, কিন্তু ডলার ও অন্যান্য মুদ্রার তুলনায় টাকার দাম কমে যায়। এতে রপ্তানিতে কিছুটা সাহায্য হয়েছিল। পরে কোরীয় যুদ্ধের সময়েও ভারতের রপ্তানি বাড়ে।

এইসব কারণে প্রথম পরিকল্পনাতে একটা আশাবাদী সুর ছিল। পরবর্তী পরিকল্পনাগুলিতে প্রথমেই উন্নয়ন প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য কী তা বিশদভাবে বলা হয়েছিল। কিন্তু প্রথম পরিকল্পায় যেসব কিছুই ছিল না। আরম্ভে শুধু খসড়া প্রস্তাবে বলা হয়েছিল যে দেশের সমস্ত শ্রম ও সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার করে উৎপাদন বাড়াতে হবে এবং অসাম্য কমাতে হবে। একটা কাম্য লক্ষ্য হিসাবে হাজির করা হয়েছিল যে যথাসম্ভব শীঘ্র দেশের লোকের মাথাপিছু আয় দ্বিগুণ করতে হবে। কমিশন বলেছিল যে এসবের মূলে তিনটি প্রধান সমস্যা—জনসংখ্যা বৃদ্ধি, বিনিয়োগ ও উৎপাদনের মধ্যে দুর্বল সম্পর্ক এবং জাতীয় আয়ে বিনিয়োগের স্বল্প অনুপাত।

তাছাড়া এটাও ঘটনা ছিল যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যে এবং তারপরে ভারতে 'ফসল বাড়াও' আন্দোলনের ওপর জোর পড়েছিল। কৃষির উন্নয়ন সারা দেশের পক্ষে একেবারে বাঁচামরার সমস্যা হয়ে উঠেছিল। ১৯৫১ সালে প্রথম পঞ্চবর্ষ পরিকল্পনাকালে এই ছিল ভারতের অবস্থা। কৃষি বলতে অবশ্য শুধু খাদ্যশস্যের উৎপাদনই বোঝায় না; খাদ্যেতর কৃষিজ দ্রব্যও আছে, যেমন তুলো পাট ইত্যাদি। কিন্তু খাদ্য নিয়েই স্বাভাবিক কারণে দেশের সামনে আর্থিক চ্যালেঞ্জটা হয়ে উঠেছিল সবচেয়ে বৃহৎ, সবচেয়ে জরুরি, সবচেয়ে তীব্র।

প্রথম পঞ্চবর্ষ পরিকল্পনার যে খসড়া দেশের সামনে রাখা হয়েছিল তাতে বলা ছিল, খাদ্য ও কাঁচামালের ঘাটতিই হল বর্তমান মুহূর্তে এদেশের অর্থনীতির দুর্বলতম স্থান—"The shortage of food and raw materials is at present the weakest point in the country's economy".

প্রথম পরিকল্পনায় কৃষি ও কৃষির সহায়ক প্রকল্পগুলির জন্যই অর্থের বরাদ্দ করা হয়েছিল অপেক্ষাকৃতভাবে বেশি। জমিদারি ব্যবস্থার উচ্ছেদ ও ভূমিসংস্কারের প্রয়োজন মেনে নেওয়া হয়েছিল। অবশ্য পরিবার প্রতি জমির মালিকানার ঊর্ধ্বতম সীমা নির্ধারণের প্রশ্নে পরিকল্পনার রচয়িতা ও দেশের নেতাদের মধ্যে কিছু বিরোধ, কিছু দ্বিধা ছিলই। প্রথম পরিকল্পনার খসড়া ও চূড়ান্ত দলিলের ভিতর এ বিষয়ে পার্থক্য লক্ষ করা যায়। মালিকানার সীমা বেঁধে দেবার কথা

চূড়ান্ত দলিলে পাওয়া যাচ্ছে। যেখানে যোজনা কমিশন বলছে, 'আমরা জমির ব্যক্তিগত মালিকানার ঊর্ধ্বসীমা বেঁধে দেওয়ার পক্ষপাতী।' কিন্তু প্রথম খসড়ার সুরটা ছিল অন্যরকম। সেখানে বলা হয়েছিল, "বৈজ্ঞানিক কৃষির জন্য জোতের আয়তন আরো বড় হওয়া দরকার।" এই ছিল খসড়া রচয়িতাদের মত। জোত ভাঙতে গেলে বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে পারে এই আশঙ্কাও প্রকাশ করা হয়েছিল। অবশেষে বলা হয়েছিল যে, জমির ঊর্ধ্বসীমা নির্ধারণের প্রশ্নটা সাবধানে চিন্তা করে দেখতে হবে। যাই হোক, শেষ অবধি মালিকানার মাত্রা বেঁধে দেওয়া হবে এই নীতিরই স্বীকৃতি হয়।

জমিদারি ব্যবস্থা আইনত উচ্ছেদ করা হয়েছে। কিন্তু জমির মালিকানার ওপর যে সীমা আরোপ করা হয়েছে তৎসংক্রান্ত আইন কার্যকর করা সহজ হয়নি। জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের পক্ষে যুক্তিগুলো সহজ। কিন্তু যে জমিদার শহরে থাকে সে কী করে কৃষির উন্নতি ঘটাবে? ছোট জোত কিংবা বড়জোত কোনটি সঠিক? এ নিয়ে তর্ক হয়েছে বিস্তর।

আসলে, ভারতের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৫১-৫৬) ছিল modest in scope and cautious in approach. বাস্তবিক অর্থে, এটিকে কোনোভাবে পরিকল্পনা হিসাবে ধরা যাবে না। বরঞ্চ বলা যাবে এটি ছিল নির্দিষ্ট ছোট বড় নানা প্রকল্পের সমষ্টিমাত্র (an amalgam of specific projects drafted by the pre-independence Planning Department and its successor, the Advisiory Board on Planning.")

খসড়া পরিকাঠামো (ড্রাফট্ আউটলাইনটি)-এর সরকারি খরচের কথা যা বলেছে তার অঙ্ক ছিল ৩.৫ বিলিয়ন ডলার যা আবার ছিল দুটি ভাগে বিভক্ত। কৃষি, সেচ, শক্তি ও যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রসার ঘটিয়ে এবং যে সমস্ত প্রকল্প চালু আছে তা ব্যবহার করে প্রয়োজনীয় ভোগ্যদ্রব্যের জন্য ৩ বিলিয়ন ডলার খরচ করা দরকার হবে উন্নয়নের কাজে।

অন্যদিকে ৬ বিলিয়ন ডলার খরচ করা দরকার হবে উন্নয়নের খাতে। অন্তিম খসড়াটিতে (Final Draft)-তে এই দুই ভাবে বিভক্তিকরণ বাদ পড়ে এক করা হয়। টাকার অঙ্কে তা হল ৪.১ বিলিয়ন ডলার।

উপরন্তু, পরবর্তী সংশোধনে প্রত্যাশিত সরকারি ব্যয় ধরা হল ৫ বিলিয়ন থেকে কিছুটা কম যা নিম্নে দেওয়া গেল—

	ডলার (কোটি)	মোট-এর শতাংশ
কৃষি ও কমিউনিটি উন্নয়ন	৭৪৯.৭	১৫.১
সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ	৮৪২.১	১৭.০
শক্তি	৫৪৬.০	১১.১
শিল্প ও খনি	৩৭৫.৯	৭.৬
যোগাযোগ	১,১৬৯.৭	২৩.৬
সামাজিক সেবা, হাউসিং এবং পুনর্বাসন	১,১১৯.৩	২২.৬
বিবিধ	১৪৪.৯	৩.০
মোট	৪,৯৪৭.৬	১০০.০

তথ্যসূত্র : *ভারত সরকারের পরিকল্পনা কমিশন, দ্বিতীয় পঞ্চ-বর্ষ পরিকল্পনা, পৃষ্ঠা-৫১-৫২*

1.6 প্রথম পরিকল্পনার অধীনে বিভিন্ন কর্মসূচি

প্রথম পঞ্চবর্ষ পরিকল্পনার সময় থেকেই স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, "Community Development (যা কিনা ভারতের শান্ত গ্রামীণ 'বিপ্লব' বলে চিহ্নিত) is the method and Rural Extension agency through which the Five Year Plan seeks to initiate a process of transformation of the social and economic life of the villages." অর্থাৎ, গ্রামীণ জীবনের সামাজিক ও আর্থিক পরিবর্তন ও বিকাশের জন্য সামূহিক পল্লিউন্নয়ন বা কম্যুনিটি ডেভেলপমেন্ট হল সাধনপ্রণালী, আর কৃষি প্রসারণ কার্যক্রম তার মাধ্যম বা হাতিয়ার। কিন্তু কথাটা এভাবে বলা হলেও এ বিষয়ে পরিকল্পনা কর্তাদের ব্যাখ্যায় পরিচ্ছন্নতার অভাব ছিল।

সরকারি পল্লি উন্নয়ন প্রোগ্রামে কি সমস্ত গ্রামবাসীর উন্নয়নের জন্য চেষ্টা করা হবে? না কি কিছু নির্বাচিত গ্রাম ও গ্রামবাসীর জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করা হবে? একদিকে বলা হয়েছে স্বাবলম্বন, সমবায়, সার্বিক উন্নয়ন, অন্যদিকে নির্বাচিত স্থানে নিবিষ্ট প্রচেষ্টার কথা উল্লেখিত আছে। এই সব কথা একই অনুচ্ছেদে একই পৃষ্ঠায় এমনভাবে পাশাপাশি বর্ণিত যে, মনে হয় পরিকল্পনা কৌশলের ভিতরেই আসলে থেকে গেছে একটা অসমন্বিত দ্বন্দ্ব। প্রথম পরিকল্পনায় বলা হয়েছে : "The community development projects which are conceived as a program of intensive developmnet of selected areas, would contribute to raising the level of agricutural production... The intention is to cover the entire country." এখানে একদিকে আছে বাছা বাছা অঞ্চলে উন্নয়নের নিবিড় কার্যক্রমের কথা, অন্যদিকে সারা দেশে উন্নয়ন ছড়িয়ে দেবার সদিচ্ছা। বিভিন্ন উদ্দেশ্য একই সঙ্গে এমনভাবে বলা হয়েছে যে দ্বন্দ্বটা সুপরিস্ফুট হয়ে যায়।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৫২ সালের অক্টোবরে পরিকল্পনা কমিশনের তত্ত্বাবধানে আমেরিকার প্রযুক্তিগত ও আর্থিক সহায়তায় প্রথম পঞ্চান্নটি কমিউনিটি প্রকল্প শুরু হয়েছিল। এগুলি মূলত নিবিড়-কৃষি উন্নয়নের কর্মসূচি হিসাবে কল্পনা করা হয়েছিল এবং প্রকৃতপক্ষে, কেবলমাত্র সেচ থেকে জল পাওয়া যাচ্ছে বা নিশ্চিত বৃষ্টিপাত হবে তার জন্য বরাদ্দ করা হয়েছিল। মূলত, কমিউনিটি প্রজেক্টগুলি কম কৃষি উৎপাদনশীলতার সাথে যুক্ত সমস্ত সমস্যায় সরকারি পদক্ষেপের সমন্বয়ের জন্য একটি বহুমুখী এক্সটেনশন যন্ত্র এনে দিয়েছিল। প্রকল্পের কর্মীরা শুধুমাত্র কৃষি সম্প্রসারণ কর্মী এবং শস্য উৎপাদন, উদ্ভিদ সুরক্ষা, খামার ব্যবস্থাপনা এবং সার বিষয়ক বিশেষজ্ঞই নয়, গ্রামীণ প্রকৌশল, স্বাস্থ্য, সামাজিক শিক্ষা, কল্যাণ, পঞ্চায়েত এবং সমবায়ের সম্প্রসারণ কর্মকর্তারাও এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রতিটি প্রকল্প এলাকাকে একটি নিবিড় উন্নয়ন প্রচেষ্টার জন্য একশটি গ্রামের তিনটি উন্নয়ন ব্লকে বিভক্ত করা হয়েছিল। পরীক্ষিত বীজ, সার, কীটনাশক এবং সরঞ্জামের ব্যবহারের জন্য প্রতি পাঁচটি গ্রামে একজন বহুমুখী সম্প্রসারণ কর্মী নিয়োগ করা হয়েছিল।

কমিউনিটি প্রকল্পের সংকীর্ণ অর্থনৈতিক লক্ষ্য নিয়ে শুরু থেকেই অসন্তুষ্ট ছিলেন নেহরু। তিনি বিশেষভাবে আপত্তি করেছিলেন "সর্বোত্তম এবং সবচেয়ে অনুকূল জায়গাগুলি বেছে নেওয়ার" দিকে, যখন অধিকাংশ কৃষকরাই অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও কমিউনিটি প্রকল্পের দুটি দিক তাঁকে প্রভাবত করেছিল যা পরিকল্পনার সামাজিক লক্ষ্যগুলির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একটি ছিল মৌলিক শিক্ষা, ঋণ এবং গ্রামীণ শিল্পসহ নিম্ন উৎপাদনশীলতার সাথে সম্পর্কিত সমস্ত "সামাজিক" সমস্যাগুলির উপর মনোনিবেশ করার জন্য গঠনমূলক কর্মসূচি পদ্ধতি। অন্যটি ছিল উন্নয়ন প্রকল্পগুলির সম্প্রদায়-কেন্দ্রিক ফোকাস, যা সহযোগিতা এবং স্ব-সহায়তার নীতির উপর

জোর দিয়েছিল। কমিউনিটি প্রকল্পগুলি ভূমি পুনরুদ্ধার, জল নিষ্কাশন, সেচ ব্যবস্থা, এবং রাস্তা নির্মাণ প্রকল্পের খরচের মাত্র এক-তৃতীয়াংশ বাজেট বরাদ্দ করে এবং বাকিগুলির জন্য শ্রম এবং অর্থের উপর নির্ভর করে। প্রকল্পগুলি চালানোর জন্য প্রয়োজনীয় ব্যাপক জনপ্রিয় অংশগ্রহণ সংগঠিত করার জন্য তৃণমূল এজেন্সি হিসাবে গ্রামীণ প্রতিষ্ঠানগুলি তৈরি হয়েছিল। আশা করা হয়েছিল যে, কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট গোটা গ্রামকেই উন্নীত করবে। কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনায় কমিউনিটি প্রকল্পের একদা প্রবক্তা তারলোক সিং-ও পরে বলেন—

বেশ কয়েক দশক ধরে, সুগঠিত সামাজিক সংগঠন হিসাবে, গ্রাম কমিউনিটি ধীরে ধীরে, ক্রমাগতভাবে হ্রাস পাচ্ছে। গ্রামের অভ্যন্তরে এবং বাহিরে এর সদস্যদের উপর কমিউনিটির প্রভাব হ্রাস পেয়েছে। জমির মালিকানায় বৈষম্যের বৃদ্ধি, অ-কৃষকদের কাছে জমির হস্তান্তর এবং জমিদারদের শহরে স্থানান্তর এই প্রবণতার প্রমাণ...গ্রাম কমিউনিটির মধ্যে স্বার্থের সংঘাত তীব্র হয়েছে এবং প্রক্রিয়াটি অব্যাহত রয়েছে। এমনকি মূল্যবোধের অভাব আছে। এখানে এমন কোনো উদ্দেশ্য নেই যা সমাজের সমস্ত সম্প্রদায়কে উদ্দীপ্ত করতে পারে।

1.7 সারসংক্ষেপ

বর্তমান পৃথিবীতে কোথাও অবিমিশ্র ধনতন্ত্র নেই। সর্বত্রই ধনতন্ত্রকে সংস্কার করে 'মিশ্র অর্থব্যবস্থা' গঠনের প্রবণতা দেখতে পাওয়া যায়।

পূর্বনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অর্থনৈতিক কাজে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপই হল পরিকল্পনা। আগে থেকেই উপায় চিন্তা করে কাজ করলে তবেই দ্রুত লক্ষ্যস্থলে পৌঁছানো যায়। অধ্যাপক ডিকিনসন বলেন সমগ্র অর্থব্যবস্থা সামগ্রিকভাবে পর্যালোচনা করে নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ দ্বারা কতখানি উৎপাদন হবে, কি উৎপাদন হবে এবং কার জন্য উৎপাদন হবে এ সম্পর্কে স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাই হল অর্থনৈতিক পরিকল্পনা। হায়েক (Hayek) বলেন অর্থনৈতিক পরিকল্পনা হল কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ দ্বারা অর্থনৈতিক কার্যাবলির পরিচালন। শ্রীমতী বারবারা উটন (Wooton) বলেন পরিকল্পনা হল কোনো সরকারি কর্তৃপক্ষের দ্বারা স্বেচ্ছায় এবং সচেতনভাবে অর্থনৈতিক কাজগুলির মধ্যে কতকগুলিকে বেছে নিয়ে অগ্রাধিকার প্রদান করা। সুনির্দিষ্ট কার্যসূচি অনুসারে কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ অর্থনৈতিক কার্যাবলি পরিচালনা করে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও মানবিক উন্নতি সাধন করাই হল পরিকল্পনার লক্ষ্য। কেন পরিকল্পনা? বর্তমান যুগ পরিকল্পনার যুগ। অধ্যাপক লুইস ঠিকই বলেছেন যে মুষ্টিমেয় উন্মাদ প্রকৃতির লোক ছাড়া আজ আর কেউই পরিকল্পনার বিরোধিতা করেন না।

পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা নিম্নের কারণগুলির জন্য সমর্থন করা যায়:

প্রথমত, অনিয়ন্ত্রিত ধনতন্ত্রের কুফল দূর করার উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। ব্যক্তিগত মালিকানা ও অবাধ প্রতিযোগিতার দরুন সমাজের সর্বাধিক কল্যাণ কখনোই হয়নি। এই ব্যবস্থায় মুনাফা অর্জনই আসল উদ্দেশ্য, সমাজকল্যাণ গৌণ। নিয়ন্ত্রণ ছাড়া অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে ভারসাম্যে উপনীত হবে বলে দাবি করা হয় বাস্তব জীবনে তা অলীক।

দ্বিতীয়ত, উন্নয়নের হার বৃদ্ধি করতে হলে পরিকল্পনা গ্রহণ করা উচিত।

তৃতীয়ত, পরিকল্পনায় মাধ্যমে বিনিয়োগ, আয় বৃদ্ধি করা অপেক্ষাকৃত সহজ।
পরিশেষে, পরিকল্পনার ফলে সীমাবদ্ধ সম্পদের কাম্য ব্যবহার করা সম্ভব হয়।

পরিকল্পনাকে অর্থনৈতিক চিন্তাধারায় সমাজতন্ত্রের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান বলা হয়। বর্তমান যুগ পরিকল্পনার যুগ। তাই এইযুগের মূলমন্ত্র হল, "হয় পরিকল্পনা নয় ধ্বংস।" আয় ও সম্পদের দ্রুত ও সুষম উন্নতির জন্য পরিকল্পনার প্রয়োজন হয়। পরিকল্পিত পদ্ধতিতে অগ্রসর হলে অব্যবহৃত সম্পদ কাজে লাগানো যাবে। জাতীয় আয়বৃদ্ধি পাবে এবং জনগণের দারিদ্র্য দূর করা সম্ভব হবে। ১৯৩৫ সালে রবার্টসন ও বাওলে ভারতের উন্নতির জন্য পরিকল্পনা গ্রহণের কথা উল্লেখ করেছেন। পরিকল্পনা নিলে জনগণের দুর্গতি ও দারিদ্র্য দূর হবে। ১৯৩৮ সালে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি সুভাষচন্দ্র বসু, জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বে জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি (National Planning Committee) গঠিত হয়। কিন্তু এই কমিটির কাজ নানা রাজনৈতিক কারণে আর অগ্রসর হয়নি।

কার্ল মার্কস-এর মতবাদের ওপর ভিত্তি করে সমাজতন্ত্র গড়ে উঠেছে। তাঁর মতে ব্যক্তিগত সম্পত্তি হল সকল সামাজিক কুফলের কারণ। মার্কসতত্ত্বে বিশ্বাসী বলশেভিকগণ ১৯১৭ সালে রাশিয়ার রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষমতা দখল করে মার্কস এবং তাঁর সহযোগী লেখক এঙ্গেলের চিন্তাধারাকে কার্যে পরিণত করার চেষ্টা করে। রাশিয়াতে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পন্থা হিসেবে পরিপূর্ণ জাতীয়করণের ভিত্তিতে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। উন্নয়নের হাতিয়ার হিসেবে রাশিয়ানরাই পরিকল্পনার আবিষ্কর্তা।

ভারতে স্বাধীনতা লাভের পর নেতারা উপলব্ধি করেন দেশ নানা সমস্যায় জর্জরিত। গণদারিদ্র্যের অবসান, বেকারত্বের উচ্ছেদ, কৃষি ও শিল্পের উন্নতি—এককথায় দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের হাতিয়ার হিসেবে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। ভারতের নেতারা সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনার সাফল্যে প্রভাবিত হয়ে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি থেকে সমাজতন্ত্রের ধারণা গ্রহণ করেছেন কিন্তু সেই সঙ্গে ব্যক্তিত্ববিকাশের জন্য অপরিহার্য বিবেচনায় গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকেও পরিত্যাগ করে নাই। সংক্ষেপে ভারতে পরিকল্পনা গ্রহণের স্বপক্ষে যে যুক্তিগুলি আছে তা হল, দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও মূলধন গঠন বৃদ্ধি করা; সীমাবদ্ধ সম্পদের কাম্য ব্যবহার করা, ধন বৈষম্য হ্রাস করা, বেকারত্বের সমাধান করা, সুষম শিল্পবণ্টন এবং সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা।

১৯৩৪ সালে স্যার মোক্ষস্তম্ভম বিশ্বেশ্বরাইয়া [M.Visvesvaraya (১৮৬১-১৯৬২)] *Planned Economy for India* নামক একটি গ্রন্থ রচনা করেন। পরিকল্পিত অর্থনীতি বিষয়ে তাঁর সুচিন্তিত চিন্তাধারা এই গ্রন্থ থেকে জানা যায়। বস্তুত ভারতের পরিকল্পিত অর্থনীতির জনক হিসেবে তাঁকে চিহ্নিত করা অসঙ্গত নয়। তৎকালীন মহীশূর রাজ্যের বিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ার ও দক্ষ প্রশাসক ছিলেন তিনি। গ্রামীণ শিল্প, লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের নানাবিধ কারিগরি সমস্যা ও কৃষি উন্নয়ন বিষয়ে যে তাঁর বিশিষ্ট চিন্তাধারা শুধু যে গ্রন্থ আকারে প্রকাশিত হয়েছিল তাই নয়, মহীশূর রাজ্যে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে তার প্রয়োগ করেও তিনি সাফল্যের নিদর্শন রেখেছিলেন। ওই গ্রন্থে ভারতের উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনার ওপর জোর দেন। তাঁর বক্তব্য ভারতের আর্থিক উন্নয়নের জন্য সরকারের কিছু লক্ষ্যমাত্রা নির্দিষ্ট করা উচিত, যা সরকার মোটেই করেনি। এই পরিকল্পিত পথ সম্পর্কে তিনি শিল্পায়নের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন এবং বলেন শিল্পায়নই হল একমাত্র রাস্তা বা সমাধান।

১৯৩৭ সালে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের তদানীন্তন সভাপতি সুভাষচন্দ্র বসুর উদ্দোগ্যে জওহরলাল নেহরুর সভাপতিত্বে জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি গঠন করেন এবং ১৯৩৮ সালে কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। ১৯৪৩ সালে বোম্বাই এর ৮ জন বিশিষ্ট শিল্পপতি মিলে ১০,০০০ কোটি টাকার একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এটিই হল বোম্বাই পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ছিল পরবর্তী ১৫ বছরে মাথাপিছু আয় দ্বিগুণ করা। প্রায় একই সময়ে বিপ্লবী

মানবেন্দ্রনাথ রায়ের "জনগণের পরিকল্পনা" (People's Plan) প্রকাশিত হয়। এরপর শ্রী এস. এন আগরওয়াল ৩৫০০ কোটি টাকার গান্ধিবাদী পরিকল্পনা (Gandhian Plan) রচনা করেন।

১৯৪৪ সালে সরকার "পরিকল্পনা ও উন্নয়ন" নামে একটি বিভাগ খুলে। বোম্বাই পরিকল্পনার অন্যতম রচয়িতা স্যার আর্দেশীর দালালকে এই বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সদস্য নিযুক্ত করে। এই বিভাগ দুটি স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা রচনা করে। স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ছিল দেশে যুদ্ধপূর্ব স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনা। অবশেষে ১৯৫০ সালে নেহরুর সভাপতিত্বে ভারতীয় পরিকল্পনা কমিশন গঠন করা হয়। প্রধানমন্ত্রী নেহরু তার সভাপতি।

যা হোক, ১৯৫১ সালে পার্লামেন্ট দ্বারা প্রথম পরিকল্পনার খসড়া প্রকাশিত হয়। প্রধানমন্ত্রী নেহরু তার সভাপতি। এই পরিকল্পনা রচনাকালে সহসভাপতি ছিলেন গুলজারিলাল নন্দা। দ্বিতীয় পঞ্চবর্ষ পরিকল্পনার সময়ে ভি. টি. কৃষ্ণামাচারী। যে সব দায়িত্ব ও উদ্দেশ্য যোজনা কমিশনের ওপর ন্যস্ত হয়েছিল, প্রথম পঞ্চবর্ষ পরিকল্পনার শুরুতেই তার বিবরণ আছে। সেখানে বক্তব্য এইরকম—দেশের বাস্তব ও মানবিক সম্পদের হিসেব করে; কোথায় কী ঘাটতি আছে এবং কীভাবে কতটা সেই ঘাটতি দূর করা যায় সে বিষয়ে অনুসন্ধান করে বিভিন্ন লক্ষ্যের ভিতর কোন্‌টাকে কতটা অগ্রাধিকার দিতে হবে এবং কোন্ কোন্ স্তরের ভিতর দিয়ে উন্নয়নের ধারাকে পরিচালিত করা সমীচীন হবে সেসব ধর্তব্যের মধ্যে এনে সামঞ্জস্যপূর্ণ উন্নয়নের স্বার্থে এবং প্রতিস্তরের কাজ যথাযথ সম্পন্ন করার জন্য বিভিন্ন খাতে কতটা অর্থের বিনিয়োগ আবশ্যিক এ বিষয়ে কমিশন প্রস্তাব রাখবে। পরিকল্পনার কাজ ঠিকভাবে অগ্রসর হচ্ছে কিনা, কোথায় কী বাধা আছে, কীভাবে বাধা দূর করা যায়, এইসব বিষয়েও কমিশন তাঁর অভিমত জানাবে। কমিশনের কাজ প্রস্তাব ও পরামর্শ দেওয়া, শেষ সিদ্ধান্ত কমিশনের হাতে নয়। তবে কমিশনের কোনো গুরুত্ব নেই, একথা বলা যাবে না। কমিশনের কাজের গুরুত্ব অপরিসীম।

প্রথম পরিকল্পনার (১৯৫১-৫৬) কার্যকাল ছিল ১৯৫১ সালের এপ্রিল হতে ১৯৫৬ সালের মার্চ পর্যন্ত। প্রথম পরিকল্পনার শুরুতে ভারতের অর্থনৈতিক জীবন ছিল বিপর্যস্ত। খাদ্যঘাটতি, কাঁচামালের অভাব, দেশবিভাগজনিত সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের ওলটপালট, মুদ্রাস্ফীতির প্রবল চাপ, পরিবহনের দূরবস্থা এবং প্রতিকূল বাণিজ্য ব্যালেন্স—এমনই এক পটভূমিকায় রচিত হয়েছিল প্রথম পঞ্চবর্ষী পরিকল্পনা।

এই পরিকল্পনা দ্বিতীয় পরিকল্পনার মতো উচ্চাকাঙ্ক্ষী ছিল না। এর দুটি মূল উদ্দেশ্য ছিল—(১) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও দেশবিভাগের দরুন যে সকল অর্থনৈতিক সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল তা দূর করা এবং (২) এমন এক উন্নয়ন পরিবেশ সৃষ্টি করা যা উত্তরকালে বৃহত্তর প্রচেষ্টার ভিত্তিভূমি হতে পারে। বিনিয়োগ এমন করতে হবে যাতে পরবর্তী ২৭ বছরে মাথাপিছু আয় দ্বিগুণ হতে পারে।

প্রথম পরিকল্পনায় ভারতের সমগ্র অর্থব্যবস্থাকে দুটি ক্ষেত্রে বিভক্ত করা হয়—সরকারি উদ্যোগ ও বেসরকারি উদ্যোগ। রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের ক্ষেত্রে পরিকল্পনায় ২০৬৯ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দ স্থির করা হয়েছিল। পরে তা বেড়ে ২৩৭৮ কোটি টাকা করা হয়।

বিভিন্ন ক্ষেত্রে অগ্রগতি পর্যালোচনা করে বলা যায় যে প্রথম পরিকল্পনার ফলাফল সন্তোষজনক। এই পরিকল্পনার দরুন জাতীয় আয় ১৮ শতাংশ এবং মাথাপিছু আয় ১০.৮ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। জাতীয় আয় বৃদ্ধি ও মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির লক্ষ্য পূরণ হলেও বিনিয়োগের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হয়নি।

প্রথম পরিকল্পনাধীন সময়ে কৃষিজ উৎপাদনের পরিমাণ ২৯ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। কৃষিতে সরকারি বিনিয়োগ ছিল পরিকল্পনার খাতে মোট বিনিয়োগের ৩৬.৯ শতাংশ। পরিকল্পনার দরুন খাদ্যশস্যের উৎপাদন ৫ কোটি টন থেকে

বেড়ে ৬.৫ কোটি টনে এসে দাঁড়ায়। পরিকল্পনাকালে মোট ১ কোটি ৬৩ লক্ষ একর জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা করা হয়। ভূমিসংস্কার কাজের যথেষ্ট অগ্রগতি হয় এবং গ্রামবাসীদের শতকরা ২৫ শতাংশ সমাজ উন্নয়ন ও জাতীয় সম্প্রসারণ সেবার অধীনে আসে। পরিকল্পনার এটি একটি সাফল্য। সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্পের প্রসারও আর একটি সাফল্য। গ্রাম পঞ্চায়েত ও সমবায় সমিতি ব্যবস্থার ব্যাপক প্রসার ঘটে। এই পরিকল্পনাকালে জমিদারি ব্যবস্থায় উচ্ছেদ করা হয়। এগুলি অবশ্যই পরবর্তীকালে সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠায় দেশকে সাহায্য করেছে।

প্রথম পরিকল্পনা কালে শিল্পক্ষেত্রেও কিছুটা অগ্রগতি হয়। এই সময়ে পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থায় উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়। রেলপথগুলি এই সময় ২৫ শতাংশ অতিরিক্ত মালপত্র বহন করতেও সমর্থ হয়। শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণের অন্যান্য দিকেও অগ্রগতি মোটামুটি সন্তোষজনক। গ্রামাঞ্চলে বেকার সমস্যা বেশ কিছু হ্রাস পেলেও, নগরাঞ্চলে বেকার সমস্যা তীব্র আকার ধারণ করে।

প্রথম পরিকল্পনা মোটামুটিভাবে সফল হলেও এটি ত্রুটিমুক্ত নয়। এই পরিকল্পনায় স্বল্পমেয়াদি অপেক্ষা দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্পের ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল।

তাছাড়া কৃষির ওপর অত্যাধিক গুরুত্ব আরোপ করায় বৃহৎ শিল্পগুলি সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষিত হয়েছিল। এমনকি তাদের উন্নয়নের জন্য যৎসামান্য টাকাও ব্যয় করা হয়নি। অধিকন্তু শিল্পোন্নয়নের দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে বেসরকারি উদ্যোগের ওপর ছেড়ে দেওয়াও ঠিক হয়নি। পরিশেষে, পরিকল্পনায় কৃষি উন্নয়নের জন্য দীর্ঘকালীন প্রকল্পের ওপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করায়, কৃষি উৎপাদনে আশানুরূপ বৃদ্ধিও পায়নি। কৃষির ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হলেও ফসল পরিকল্পনার (Crop Planning) কোনো ব্যবস্থা করা হয়নি এবং ফসল বিমাকরণ কৃষি পরিকল্পনায় স্থান লাভ করেনি।

এইসব ত্রুটি সত্ত্বেও প্রথম পরিকল্পনা ভারতের পরিকল্পিত অগ্রগতির পথে নির্ভুল পদক্ষেপ। পরিকল্পনা কমিশনের মতে, পরিকল্পনা জনসাধারণের মধ্যে অভূতপূর্ব উদ্দীপনা ও উৎসাহের সৃষ্টি করে, যার জন্য নেহরুকে অনেকে ধন্যবাদ দিয়েছেন।

1.8 অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলি :

1. অর্থনৈতিক পরিকল্পনা কাকে বলে?
2. মিশ্র অর্থনীতি কাকে বলে?
3. মিশ্র অর্থনীতিকে 'মিশ্র' বলা হয় কেন?
4. ভারতীয় পরিকল্পনার পথিকৃৎ কাকে বলা হয়?
5. বোম্বাই পরিকল্পনা কে কখন রচনা করেন?
6. ভারতে 'জনগণের পরিকল্পনা' (People's Plan) কে তৈরি করেন?
7. ভারতে ন্যাশনাল প্ল্যানিং কমিটি কখন কার অনুপ্রেরণায় গঠিত হয়?
8. ভারতের প্রথম পঞ্চবর্ষ পরিকল্পনার সময়কাল উল্লেখ করো।

9. উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা কাকে বলে?
10. Planned Economy for India বইটি কে কখন রচনা করেন?
11. সামাজিক ন্যায় বলতে কী বোঝ?

মাঝারি উত্তরের প্রশ্নাবলি :

1. বিশ্বেশ্বরাইয়া রচিত পরিকল্পনার পরিচয় দাও।
2. বোম্বাই পরিকল্পনা কী? এটি কখন কী উদ্দেশ্যে রচিত হয়?
3. প্রথম পরিকল্পনার প্রারম্ভে ভারতের অর্থনৈতিক জীবন কেমন ছিল?
4. "প্রথম পঞ্চবর্ষ পরিকল্পনা কৌশলের ভিতরেই থেকে গেছে একটা অসমন্বিত দ্বন্দ্ব"—ব্যাখ্যা করো।
5. সংক্ষেপে যোজনা কমিশনের কাজ বর্ণনা করো।
6. কমিউনিটি প্রকল্পের সংকীর্ণ অর্থনৈতিক লক্ষ্য নিয়ে শুরু থেকেই অসন্তুষ্টিতে ছিলেন কেন নেহরু? এ প্রসঙ্গে তারলোক সিংহের বক্তব্য পরিস্ফুট করো।

দীর্ঘ উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন :

1. ভারতের মতো দেশে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা বা যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করো।
2. অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় উদ্দেশ্যগুলি বিবৃত করো।
3. প্রথম পরিকল্পনার ব্যর্থতা আলোচনা করো।
4. ভারতের প্রথম পরিকল্পনার কী কী উদ্দেশ্য ছিল?
5. প্রথম পরিকল্পনার অগ্রগতি পর্যালোচনা করো।
6. সংবিধানের অধীনে সামাজিক ন্যায়বিচার কীভাবে বর্ণিত হয়েছে?

1.9 গ্রন্থপঞ্জী

- দত্ত, অম্লান (১৯৮৮) : *শতাব্দীর প্রেক্ষিতে ভারতের আর্থিক বিকাশ*। অর্থনীতি গ্রন্থমালা ৬, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা
- ঘোষ, বিশ্বনাথ (১৯৮২) : *অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও ভারতের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা
- Frankel, Francine R. (2005) : *India's Political Economy :* 1947-2004. Oxford University Press.
- সরখেল, জয়দেব ও সেলিম, সেখ (২০২২) : *ভারতীয় অর্থনীতি*, বুক সিন্ডিকেট প্রাইভেড লিমিটেড, কলকাতা
- সেনগুপ্ত, জয়ন্ত (২০১৩) : ভারতে গণতন্ত্রের সংকট, *দশদিশি*, কলকাতা, পৃষ্ঠা-৬০-৬১

একক 2 ◘ গতিশীল শিল্পায়ন এবং মন্থর কৃষি : একটি দ্বন্দ্ব

গঠন

2.1 উদ্দেশ্য

2.2 প্রস্তাবনা

2.3 নেহরু এবং দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অধীনে অর্থনৈতিক উন্নয়ন কৌশল

2.4 দ্বিতীয় পরিকল্পনার রাজনৈতিক উদ্দেশ্য

2.5 দ্বিতীয় পরিকল্পনায় অবহেলিত কৃষিক্ষেত্র

2.6 মজুরি পণ্যের মডেল উদ্ধার হিসেবে এসেও কেন ব্যর্থ হয়েছিল?

2.7 দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ফলাফল

2.8 সারসংক্ষেপ

2.9 অনুশীলনী

2.10 গ্রন্থপঞ্জী

2.1 উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে জানা যাবে :

ভারতে—

- নেহরু এবং দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অধীনে অর্থনৈতিক উন্নয়ন কৌশল কী রূপ ধারণ করেছিল
- এই পরিকল্পনার রাজনৈতিক উদ্দেশ্যই-বা কী ছিল
- কীভাবে কৃষিক্ষেত্র অবহেলিত হয়েছিল
- মজুরি পণ্যের মডেল উদ্ধার হিসেবে এগিয়ে এলেও তা কেন শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছিল এবং
- এই দ্বিতীয় পরিকল্পনার ফলাফলই-বা কী হয়েছিল

2.2 প্রস্তাবনা

প্রথম পরিকল্পনার সময়সীমা শেষ হল। এবার রাশিয়ার পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আদর্শে দেশের পরিকল্পনা রচনা করা হবে। পুঁজির অভাব অনগ্রসর দেশ ভারতে বর্তমান। পুঁজি বাড়ানোর জন্য সঞ্চয়ের হার বাড়াতে হবে। বর্তমান ভোগ নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। শিল্পে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের গুরুত্ব বাড়াতে হবে। ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু কারখানা তৈরিতে মনোনিবেশ করলেন। কারখানাতে জিনিস তৈরির ব্যাপারে নতুন নতুন শিল্পনীতি প্রণয়ন করে উৎপাদন বাণিজ্যে রাষ্ট্রের অগ্রধিকার বাড়িয়ে চলেছেন। এর সঙ্গে তাঁর দীপ্ত ঘোষণা—সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের অর্থনীতি তৈরি করা হবে।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতে সব থেকে উল্লেখযোগ্য খসড়া তৈরি হল এই দ্বিতীয় যোজনা থেকে। সেটির কাল শুরু হল ১৯৫৬-র মাঝামাঝি থেকে, চলল ১৯৬১ সাল অব্দি। খসড়া তৈরি করলেন পদার্থবিদ এবং পরিসংখ্যানবিদ প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ। কোনো অর্থনীতিবিদ নন। এদেশে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সবদিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ মডেলটি দিয়ে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কাঠামো নির্ধারিত হল। তাত্ত্বিক বিচারেও পরিকল্পিত অর্থনৈতিক বিকাশের বিষয়ে মহলানবিশের মডেলটি আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেল।

তখন সবদিক থেকে ভারতবর্ষ অনগ্রসর ছিল। অনগ্রসরতা, পুষ্টির অভাব, শিক্ষার অভাব, গড় পরমায়ুর স্বল্পতা, শিল্পজাত দ্রব্যের ঘাটতি ইত্যাদি বিদ্যমান। কিন্তু সব অভাব সব রকম অসামর্থ্যের মূলে থাকে মূলধনের অভাব। অপ্রতুল মূলধন থেকে কম জতীয় আয়—কম জাতীয় আয় থেকে কম সঞ্চয়—কম সঞ্চয় থেকে কম বিনিয়োগ ও কম আয়—এইভাবে (দারিদ্র্যের) দুষ্টচক্রের মধ্যে অনগ্রসর দেশের অর্থনীতি আটকে থাকে। এই দুষ্টচক্র ভাঙতে গেলে গোড়াতেই দ্রুতহারে মূলধন বাড়িয়ে অর্থনীতিকে একটা বড়সড় ধাক্কা দেওয়ার দরকার হয়। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারকে ছাড়িয়ে যাওয়ার দরকার। এদিকে পুঁজিকেও বাড়াতে হবে। পুঁজি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আর্থিক প্রবৃদ্ধি হয়। সঞ্চয় দিয়েই পুঁজির নির্মাণ এটাও সত্যি কথা। কিন্তু দ্রুত সঞ্চয় বাড়াতে গেলে বর্তমানের ভোগ-উপভোগের ওপর রাশ টানতে হবে। এরপর শিল্পে বিনিয়োগ বাড়াতে হলে মৌলিক জিনিসগুলির উৎপাদন বাড়াতে হবে। এই মৌলিক জিনিসগুলি হল ইস্পাত, কয়লা, সিমেন্ট, বিদ্যুৎ, খনিজ তেল, যানবাহন। প্রথমে সঞ্চয় যখন কম, বিনিয়োগের ক্ষমতা যখন কম, তখন ভোগ্যপণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি যতটা সম্ভব ঠেকিয়ে রেখে উৎপাদনের মৌলিক উপাদানগুলিকে বাড়ানোর ওপরে মহলানবিশের মডেলে জোর দেওয়া হয়েছিল। এর ফলে বর্তমানের ভোগ্যপণ্যের অভাব মেনে নিয়ে ভবিষ্যতে উৎপাদনের বনিয়াদ বড় করা যাবে। তবে একটা কথা এখানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে মৌলিক উপাদানই হোক আর ভোগ্যপণ্যই হোক, উৎপাদন প্রক্রিয়া চালিয়ে নিয়ে যাবে তো সেই বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিযুক্ত শ্রমিকরা, তাদের জন্য কি কিছু করা গেল, যখন এতটাই অঙ্ক কষা হল।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় নেহরু-ফেল্ডম্যান-মহলানবিশের মডেলে প্রথমে দুটি উৎপাদন ক্ষেত্রর মধ্যে সমস্ত অর্থনীতিকে ভাগ করে দেখানো হয়েছিল। তারপরে মহলানবিশ সমস্ত অর্থনীতিকে চারটি উৎপাদন ক্ষেত্রের মধ্যে ভাগ করে মডেলটি পুনর্নির্মাণ করলেন। এখানে ভারী বনিয়াদি শিল্প ছাড়া বাকি তিনটি ক্ষেত্র হল—আধুনিক যন্ত্রচালিত ভোগ্যপণ্য উৎপাদন ক্ষেত্র, কৃষি ও কারুশিল্প নির্ভর ভোগ্যপণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্র ও সেবামূলক পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্র। তৃতীয় ক্ষেত্রে শ্রমিক নিয়োগের সুযোগ বেশি থাকবে। চতুর্থ ক্ষেত্রের মধ্যে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, প্রশাসন ইত্যাদি আসবে। পরবর্তীকালে উৎপাদন ক্ষেত্রগুলিকে আরও বেশি বিভাজন করে জটিলতর পরিকল্পনা তৈরি হল। সমস্ত উৎপাদন ব্যবস্থাকে ষাটটি বা তার থেকেও বেশি ক্ষেত্রে ভাগ করে অঙ্ক কষা হতে লাগল। এই ধরনের বড় বড় অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মডেল রাশিয়াতে কম্পিউটার দিয়ে রচনা করা হচ্ছিল। প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের 'ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটে'র কলকাতার ক্যাম্পাসে রাশিয়া থেকে বিশাল 'উরাল' নামের কম্পিউটার এনে বসানো হল।

2.3 নেহরু এবং দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অধীনে অর্থনৈতিক উন্নয়ন কৌশল

পঞ্চদশ দশকের মাঝামাঝি সময়ে ভারতের দ্রুত শিল্পায়নের দৃষ্টিভঙ্গি মনোযোগের দাবি রাখে। স্থবির বা ধীরে ধীরে ক্রমবর্ধমান রপ্তানির অবস্থার মধ্যে ভারতকে শিল্পায়নে সক্ষম করার জন্য এই পদ্ধতিটি তৈরি করা হয়েছিল। এই

ধরনের পরিস্থিতিতে, মূলধনী পণ্য আমদানির জন্য প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা উপলব্ধ ছিল না এবং ফলস্বরূপ দেশকে অবশ্যই নিজস্ব মূলধনী পণ্য খাত বিকাশ করতে হবে। নেহরু ও প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ স্পষ্টতই সোভিয়েত অভিজ্ঞতা দ্বারা প্রভাবিত, এবং এ. জি. ফেল্ডম্যান (১৮৮৪-১৯৫৮)-এর ১৯২৮ সালের গবেষণাপত্রে এই "আয়ের হার বৃদ্ধির জন্য শিল্পায়ন, ভারী শিল্প, মেশিন বিল্ডিং, বিদ্যুতায়ন..." একটি অভ্যন্তরীণ নকশা তৈরি করেছিলেন ভারতের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার জন্য, শিল্পায়নের কৌশল খোঁজার জন্য যা মূলধনী পণ্য শিল্পের বিকাশ ও সম্প্রসারণের নেতৃত্বে ছিল এবং সরকার দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের দায়িত্ব নিয়েছে। নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছিল একটি ধারাবাহিক পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কাঠামোর মধ্যে যেখানে পাবলিক সেক্টর অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করা হয়েছিল। দ্বিতীয়ত, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৫৫-৬১) থেকে শুরু করে মূলধনী পণ্য খাতের বৃদ্ধির উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছিল। এই জোর দেওয়ার একটি কারণ ছিল যার অন্য নাম "রপ্তানি হতাশাবাদ", একটি বিশ্বাস যে বিশ্ববাজার তুলনামূলকভাবে ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাবে এবং প্রেবিশ-সিঙ্গার যুক্তি অনুসরণ করে যে বাণিজ্যের শর্তাদি ভারতের প্রাথমিক রপ্তানি পণ্যের বিরুদ্ধে যেতে পারে। এটিও বিশ্বাস করা হয়েছিল যে শিল্পায়ন কিছু উপায়ে এগিয়ে যাওয়ার পরেই, সেই বর্ধিত উৎপাদন বৃহত্তর রপ্তানি আয়ে প্রতিফলিত হবে। এটাও যুক্তি দেওয়া হয়েছিল যে ভারতের বৃহৎ অভ্যন্তরীণ বাজারকে বাণিজ্যযোগ্য উৎপাদনের বর্ধিত সরবরাহকে শোষণ করার জন্য, রপ্তানিকে বৃদ্ধির ইঞ্জিন হতে হবে না। তদনুসারে রপ্তানি একটি অবশিষ্ট হিসাবে বিবেচিত হয়।

যদি কেউ ধরে নেয় যে অর্থনৈতিক নীতির প্রাথমিক উদ্দেশ্য হল একটি মূলধনী পণ্য খাত গড়ে তোলা যাতে ভারতের সঞ্চয়ের হার রপ্তানি আয়ের বৃদ্ধি থেকে স্বাধীন হতে পারে, তাহলে পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি সময়ে ভারতের শিল্পায়নকে অবশ্যই সফল বলে বিবেচনা করা উচিত। অভ্যন্তরীণ শিল্পায়নের কৌশলের ফলে শিল্প উৎপাদনের হার বেড়েছে। শিল্পায়নের অগ্রগতির ফলে প্রযুক্তিগত এবং ব্যবস্থাপনাগত দক্ষতা এবং শিল্প ও বৈজ্ঞানিক গবেষণার বৃদ্ধি ঘটেছে। দেশটি উৎপাদিত পণ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে যা মূলত পেট্রোলিয়াম পণ্য, রাসায়নিক এবং মূলধনী পণ্যের আমদানির সংমিশ্রণে প্রতিফলিত হয়। ১৯৬৬ সালের পর মূলধনী দ্রব্য খাত গুরুতর ধাক্কা খেয়েছিল। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শুরুতে মূলধনী পণ্য খাতের অংশ শিল্প উৎপাদনের ৫ শতাংশের কম থেকে ১৯৭৯-৮০ সালে প্রায় ১৮ শতাংশে উন্নীত হয়। তথাকথিত মৌলিক পণ্যের (সার, সিমেন্ট, বৈদ্যুতিক শক্তি ইত্যাদি) ভাগও উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। এইভাবে আপেক্ষিক পরিপ্রেক্ষিতে নীতিনির্ধারকদের দ্বারা মূলধনী পণ্যের অগ্রাধিকার অর্জিত হয়েছিল। কিন্তু উদ্বেগজনক সত্য ছিল যে দ্বিতীয় পরিকল্পনায় অর্থপ্রদানের ভারসাম্যের চাপের লক্ষণগুলি স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান ছিল। ভারী শিল্পের বিকাশের কারণে আমদানির চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় দ্বিতীয় পরিকল্পনায় লেনদেন ব্যালেন্সে চলতি হিসাবের ঘাটতি জিডিপির ২.৩ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। স্থবির রপ্তানির সাথে দ্রুত ক্রমবর্ধমান আমদানির অর্থায়নে অসুবিধাগুলি বৈদেশিক রিজার্ভের উপর যথেষ্ট চাপ সৃষ্টি করে। কারণ রিজার্ভের আমদানি কভার (বা বৈদেশিক মুদ্রার সম্পদ) দ্বিতীয় পরিকল্পনার টার্মিনাল বছরের মধ্যে মাত্র দুই মাসে নেমে আসে। অধিকন্তু, পাবলিক সেক্টরের লোকোমোটিভের গতিশীলতা বাষ্প ফুরিয়ে গিয়েছিল এবং ১৯৫৫-৬৫ সময়কালে ভারতের উৎপাদন খাতে আউটপুট এবং মোট ফ্যাক্টর উৎপাদনশীলতার উচ্চ হারের দিকে যে গতি অর্জিত হয়েছিল তা ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত আর কখনও ফিরে পাওয়া যায়নি। ভারী শিল্পায়নের কৌশল খাদ্য ও কৃষিপণ্যের সরবরাহ বাড়াতে পারেনি। উপরের পটভূমিতে মহলানবিশ মডেলের গতিশীলতাকে এর প্রধান সীমাবদ্ধতার সাথে খুঁজে বের করার চেষ্টা করে এবং ভারতের দ্বিধা : তৎকালীন সময়ের গতিশীল শিল্পায়ন এবং মন্থর কৃষি।

❑ মহলানবিশের উন্নয়ন পরিকল্পনা মডেল :

একটি মডেল সিস্টেমের প্রধান চলকগুলি সনাক্ত করার চেষ্টা করে এবং তাদের মধ্যে বিদ্যমান বিভিন্ন আন্তঃসম্পর্ক দেখায়। একটি আদর্শ দৃষ্টিকোণ থেকে, একটি অর্থনৈতিক মডেল অর্থনৈতিক বাস্তবতার প্রতিফলন হওয়া উচিত। যাই হোক, কোনো মডেল একটি নিখুঁত বাস্তব প্রতিফলন অর্জন করতে পারে না। মডেলটিতে, তাই, একটি বিমূর্ততা রয়ে গেছে। যখন অর্থনৈতিক মডেল নির্দিষ্ট পূর্বনির্ধারিত উদ্দেশ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়, তখন এটি পরিকল্পনা মডেলে পরিণত হয়।

পরিকল্পনা মডেল তিন ধরনের আছে, প্রথমটি হল সমষ্টিগত মডেল যা সমগ্র অর্থনীতিকে বেষ্টন করে। তারা, বিস্তৃত সামষ্টিক অর্থনৈতিক মডেল হওয়ায়, সাধারণত জাতীয় আয়ের সম্ভাব্য বৃদ্ধির হার এবং সঞ্চয় ও বিনিয়োগের সাথে সম্পর্ক নির্ধারণ করার চেষ্টা করে। হ্যারড-ডোমার মডেলটি এমন একটি উদাহরণ, যা জাতীয় আয়ের প্রবৃদ্ধির কাঙ্ক্ষিত বা লক্ষ্যযুক্ত হার এবং বর্ধিত মূলধন—উৎপন্ন অনুপাত-এর মাধ্যমে এই বৃদ্ধির হার অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় সঞ্চয়ের মোট পরিমাণের মধ্যে একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করতে চায়। এই মডেল অনুসারে, সঞ্চয়ের একটি উচ্চ হার প্রবৃদ্ধির উচ্চ হারের দিকে নিয়ে যাবে।

দ্বিতীয় ধরনের পরিকল্পনা মডেল হল ক্ষেত্রভিত্তিক মডেল যা অর্থনীতির কয়েকটি নির্বাচিত ক্ষেত্রের উপর জোর দেয়। তাদের মূল উদ্দেশ্য হল উৎপাদনের মাত্রা এবং এই ক্ষেত্রে বিকল্প উৎপাদনের সম্ভাবনা নির্ধারণ করা। শেষটি হল মাল্টি-সেক্টর আন্তঃশিল্প মডেল। তারা ভোগ এবং বিনিয়োগের আকারে চূড়ান্ত চাহিদার ভেক্টর দেওয়া বিভিন্ন সেক্টরের আউটপুট নির্ধারণ করার চেষ্টা করে। সমষ্টিগত মডেল এবং আন্তঃ-শিল্প মডেলগুলি অর্থনীতির সমস্ত ক্ষেত্রকে অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করে। তারপর এটি একটি অপারেশনাল বা কার্যকর মডেল হয়ে যায়।

মহলানবিশ মডেল পরিকল্পনার একটি বিকল্প পদ্ধতির প্রতিনিধিত্ব করে যা হ্যারড-ডোমার মডেলের দ্বারা জোর দেওয়া সামগ্রিক সঞ্চয়ের ঘাটতির পরিবর্তে মূলধনী পণ্যের ঘাটতি দ্বারা সৃষ্ট প্রতিবন্ধকতার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে এবং দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য সেই বাধাগুলি দূর করার চেষ্টা করে। প্রফেসর মহলানবিশ কর্তৃক প্রণীত দ্বি-সেক্টর মডেল ভারতে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা সম্পর্কিত প্রধান ধারণাগুলির বিকাশে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। হ্যারড-ডোমার মডেলের বিপরীতে, মহলানবিশ মডেলটি সম্ভাবনার উপর যথেষ্ট জোর দিয়েছে যে অর্থনীতিতে প্রকৃত বিনিয়োগের সামগ্রিক হার অর্থনীতির মধ্যে মূলধনী পণ্য শিল্পে উৎপাদনর স্তর দ্বারা সীমাবদ্ধ হতে পারে। এই ধরনের পরিস্থিতিতে, যেহেতু একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সামগ্রিক বৃদ্ধির হার অর্থনীতিতে বিনিয়োগের সামগ্রিক হারের সাথে সরাসরি পরিবর্তিত হতে থাকে, তাই মহলানবিশ মডেলটি মূলধনী পণ্য শিল্পে মোট বিনিয়োগের একটি উচ্চ অনুপাত বরাদ্দ করার পরামর্শ দিয়েছে।

ফেল্ডম্যান মডেল, ১৯২৮ সালের প্রথম দিকে নির্মিত হয়েছিল। ফেল্ডম্যান মডেলে, মজুরি পণ্য এবং কৃষি পণ্যের আউটপুট স্থির রাখা হয়েছিল। এই প্যাটার্নটি তৎকালীন USSR-এর জন্য ভারী শিল্প নির্মাণের নেটওয়ার্কের উপর জোর দিয়েছে। মহলানবিশ ফেল্ডম্যানের মডেলের অনুরূপ একটি মডেল তৈরি করেছিলেন। এটি জওহরলাল নেহরু যাতে মেনে নেন, তার জন্য তাঁর কাছে আবেদন করা হয়েছিল কারণ ভারতীয় অর্থনীতির আধুনিকীকরণ দ্বারা নেহরু শিল্পায়নকে বোঝাতে চেয়েছিলেন। এই ফেল্ডম্যানা ধরনের শিল্পায়নের কৌশল ভারতীয় অর্থনীতিতে বাধ্য করা হয়েছিল।

ফেল্ডম্যান-মহলানবিশ পদ্ধতিটি মূলত একটি মডেল যা অর্থনীতির বিভিন্ন সেক্টরের মধ্যে বিনিয়োগের বরাদ্দ অন্বেষণ করার চেষ্টা করে। ফেল্ডম্যান তাঁর মডেলটি তৎকালীন USSR-এর তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ব্যবহার করেছিলেন এবং মহলানবিশ ভারতের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় মডেলটি ব্যবহার করেছিলেন।

মহলানবিশ মডেল নিম্নলিখিত অনুমানের উপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছিল—

(১) অর্থনীতিটি উন্মুক্ত অর্থনীতি নয়। কোনো রপ্তানি নেই বা রপ্তানি বৃদ্ধিতে গুরুতর বাধা রয়েছে। এটি মূলধনী পণ্য শিল্পে সর্বাধিক বিনিয়োগের কৌশলের দিকে নিয়ে যায় এবং এটি ভাবা হয়েছিল, সামগ্রিকভাবে অর্থনীতিতে উৎপাদনশীলতার বৃদ্ধিকে সর্বাধিক করবে।

(২) একটি নির্দিষ্ট শিল্পে একবার বিনিয়োজিত মূলধন বা যন্ত্রপাতি অন্য শিল্পে স্থানান্তরিত করা যাবে না।

(৩) অর্থনীতি দুটি সেক্টরে বিভক্ত—ভোগাপণ্য ক্ষেত্র এবং বিনিয়োগ পণ্য ক্ষেত্র।

(৪) অর্থনীতিতে সামগ্রিক বিনিয়োগের বৃদ্ধির হার অর্থনীতির মধ্যে মূলধনী পণ্য ক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধির হারের সমান। মডেলটি আমদানির মাধ্যমে অতিরিক্ত মূলধনী পণ্য অর্জনের সম্ভাবনাকে দূরে সরিয়ে দেয়।

(৫) দুটি ক্ষেত্রে কোনো অতিরিক্ত মূলধন নেই এবং মূলধনী পণ্য ক্ষেত্র দ্বারা যা কিছু উৎপাদিত হয় তা সম্পূর্ণরূপে কাজে লাগানো হয়।

(৬) মহলানবিশ অনুমান করে নিয়েছিলেন যে আপেক্ষিক দামসমূহ ধ্রুবক। এইভাবে দুই ক্ষেত্রের বা সেক্টরের মধ্যে বাণিজ্য শর্তের সম্পর্কটি তিনি এড়িয়ে গেছেন।

❑ মহলানবিশ মডেলটিতে কী ছিল?

উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার (Development Planning) ক্ষেত্রে এই মডেলটির মূল কথা হল মূলধনী শিল্পের ওপর গুরুত্ব প্রদান। যুক্তি হল এই যে, বিনিয়োগযোগ্য সম্পদের বড়ো অংশই মূলধনী দ্রব্য শিল্পে বিনিয়োগ করা উচিত। যদি ধরা যায় যে, সেই বিনিয়োগযোগ্য সম্পদের λ_K অংশ মূলধনী দ্রব্যের শিল্পের ক্ষেত্রে এবং λ_C অংশ ভোগ্যদ্রবের শিল্পে যাবে, ($\lambda_K + \lambda_C = 1$), তাহলে মহলানবিশ λ_K-এর জন্য বড়ো মান নির্দেশ করেছেন। এখানে উল্লেখ্য যে $\lambda_K I_C$ হল মূলধনী দ্রব্য ক্ষেত্রের স্বপক্ষে সম্পদের allocation বা বণ্টন এবং $\lambda_C I_t$ ভোগ্যদ্রব্য ক্ষেত্রের জন্য বিনিয়োগের allocation। তিনি তাঁর মডেলে আয়ের (Y) দুটি প্রসারপথ নির্ণয় করেছেন। একটি λ_K-এর বড়ো মান ধরে, অপরটি λ_K-এর ছোট মান ধরে। λ_K-এর মান বড়ো ধরলে স্বল্পকালে উন্নয়নের হার কম হতে পারে। কিন্তু দীর্ঘকাল উন্নয়নের হার বড় হবে। অপরদিকে, λ_K-এ মান ছোট হলে স্বল্পকালে উন্নয়নের হার বেশি হলেও, দীর্ঘকালে উন্নয়নের হার কম হবে। λ_K-এর মান বড় নিলেই দীর্ঘকাল উচ্চ উন্নয়নের হার অর্জন করা যাবে। যেহেতু আয়ের প্রসার পথ হল মহলানিবিশের intrinsically exponential path, সেক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধির হার বেশি হবে। এটাই মহলানিবিশের মত। এখানে মনে রাখা দরকার, λ_K একটি অত্যন্ত দরকারি সিদ্ধান্ত চলক।

এই মডেলটি অনুসরণ করে আমরা এও বলতে পারি যে, λ_K-এর মান যত বেশি হবে, ততই স্বল্পকালে ভোগ্যপণ্যের প্রবৃদ্ধি কম হবে। কিন্তু দীর্ঘকালে এর প্রবৃদ্ধি বেশি হবে। তখন নীতিনির্ধারণের ক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য শিল্পে বিনিয়োগ বেশি বেশি করে করতে হবে।

❑ ১৯৫০ এবং ১৯৬০-এর দশকে ভারতীয় অভিজ্ঞতায় মহলানবিশ মডেলের সীমাবদ্ধতা :

(১) অর্থনীতিতে সামগ্রিক সঞ্চয়ের হার নির্ধারণ করা হয়নি কারণ এটিকে অর্থনীতির কাঠামোগত পরামাপকগুলির একটি কঠোর অপেক্ষক হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে। আয় উপার্জনকারীদের আচরণগত ধরনের মতো গুরুত্বপূর্ণ দিকটি উপেক্ষা করা হয়েছে। অধিকন্তু, মডেলটি কেবল বিনিয়োগের সরবরাহের দিকে মনোনিবেশ করেছে।

(২) চার্লস বেটলহেইম উল্লেখ করেছেন যে ভারতের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাটি ছিল অতি উচ্চভিলাষী। এটি একটি সাহসী বাস্তবায়ন ছিল না।

(৩) মহলানবিশ দ্বি-সেক্টর মডেলে, একজন পরিকল্পনাকারী রয়েছেন, যেমনটি অধ্যাপক অশোক রুদ্র স্পষ্টভাবে বলেছেন, যিনি λ_K-এর সংখ্যাগত মান, (মূলধনী পণ্য উৎপাদনকারী শিল্পগুলিতে বরাদ্দ করা বিনিয়োগের অনুপাত) সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। এটি এক ধরনের একটি একনায়কতান্ত্রিক পরিকল্পনার অনুমান। এটি ভারতের মতো অর্থনীতির জন্য সবচেয়ে অনুপযুক্ত যেখানে সরকার কেবলমাত্র অর্থনীতির একটি ছোট অংশে আদেশের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত কার্যকর করতে পারে। এই দেশে অনেক সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী আছে, একজন নয়। কৃষি এবং অন্যান্য পরিষেবাগুলি সরকারি কর্তৃপক্ষের নির্দেশের সীমার বাইরে রয়েছে। এই বিশাল, অপ্রতিরোধ্য বেসরকারী খাতের অর্থনীতির সমস্ত সিদ্ধান্ত একজন একক সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী গ্রহণ করতে পারে না। তাই মহলানবিশ পদ্ধতির পরিকল্পনায় কৃষির দিকের প্রতি আগ্রহের অভাব আছে। মহলানবিশ কৌশল দ্বারা ভারী শিল্পের ভিত্তি গড়ে তোলার উপর মনোনিবেশের জন্য কৃষি বিনিয়োগের আপেক্ষিক মন্দার কারণ হয়েছিল। ফলস্বরূপ, দেশটি খাদ্যসামগ্রীর আমদানির উপর আরও বেশি নির্ভরশীল হয়ে পড়ে।

(৪) অধ্যাপক মহলানবিশ ভারী শিল্প যেমন ইস্পাত, মেশিন টুলস, ভারী প্রকৌশল, ভারী রাসায়নিক দ্রব্য ইত্যাদির উপর জোর দেন যা সরকারি ভোগ্যপণ্য উৎপাদনে কাজে লাগে না। ভোগ্যপণ্যের উৎপাদনের মাত্রা বৃদ্ধির জন্য তখন অতিরিক্ত বিনিয়াগের প্রয়োজন ছিল। তাই এই উদ্দেশ্যে একটি সম্পূর্ণ নতুন শিল্প নেটওয়ার্ক তৈরি করা প্রয়োজন ছিল। সে সময় ভারতে এ ধরনের অতিরিক্ত সম্পদের বিকল্প ছিল না। এ কারণেই ভারী শিল্পগুলো ভোগ্যপণ্যের প্রবাহ বাড়াতে পারেনি।

(৫) অতিরিক্ত বেকার যে বাড়বে, সে সম্পর্কে কোনো যত্ন নেওয়া হয়নি। পরিকল্পনা প্রণেতাদের ধারণা ছিল যে জাতীয় আয়ে তাদের অনুমিত ৫% বার্ষিক বৃদ্ধি পূর্ণ কর্মসংস্থানের দিকে পরিচালিত করবে। এই মূলধনের ভিত্তি তৈরির কৌশলটি এই কারণে সমালোচিত হয়েছিল যে এটি ভারতে মুদ্রাস্ফীতির চাপ তৈরি করবে। ভারতীয় অভিজ্ঞতা, বিশেষ করে ১৯৬৫-৬৬-এর পরে এই মতকে যথেষ্ট সমর্থন দেয়।

অমিয় কুমার দাশগুপ্ত (১৯০৩-১৯৯২) প্রথমে মহলানবিশ মডেলের উচ্চ প্রশংসা করেছিলেন। পরে তিনি মত বদলান এবং বলেন এই মডেলটির ফলাফল বেকারি বৃদ্ধি ঘটাবে এবং পরিশেষে অর্থনীতিকে দীর্ঘকালে একটি বিরুদ্ধ বা বিপরীত বৃদ্ধির (anti-growth) দিকে নিয়ে যাবে।

মহলানবিশ বিনিয়োগ পণ্যের ওপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন কিন্তু অন্যান্য সেক্টরকে তিনটি সাব-সেক্টরে বিভক্ত করেছিলেন—(ক) শিল্প, (খ) কৃষি ও কুটির শিল্প এবং (গ) পরিষেবা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ইত্যাদি, আয় বৃদ্ধির সাথে বেকারত্ব হ্রাসের বিষয়টিতে আলোকপাত করে।

মোট বিনিয়োগের মাত্র এক-তৃতীয়াংশ বিনিয়োগ পণ্য খাতে যাবে যেখানে দুই-তৃতীয়াংশ তিনটি উপ-খাতে নিবেদিত হবে। সময়ের সাথে সাথে মহলানবিশ মডেলের সীমাবদ্ধতাগুলি স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে ওঠে। ফলস্বরূপ, তৃতীয় পরিকল্পনার সময়কালে বহু-খাতের আন্তঃশিল্প (multi-sectoral) মডেলগুলি তৈরি করা হয়েছিল। কিন্তু তৃতীয় পরিকল্পনায় আবার ভারী শিল্পের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। চতুর্থ পরিকল্পনায় ভারী শিল্পের ওপর জোর দেওয়া থেকে সরে এসে কৃষির ওপর জোর দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু পঞ্চম পরিকল্পনায় এটি আবার পরিবর্তন করা হয়।

কিন্তু এটা সত্য যে সম্পদ সংগ্রহের প্রশ্নে এই মডেলটির প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে। কারণ মহলানবিশের দৃষ্টিভঙ্গি বিভিন্ন সেক্টরের পারস্পরিক নির্ভরতা বিবেচনা নিয়ে অর্থনীতির উন্নয়ন এবং পদ্ধতিগত পরিকল্পনার উপর জোর দেয়, এইভাবে বিনিয়োগের হার, বিনিয়োগের বরাদ্দ এবং আউটপুট-মূলধন অনুপাত এবং তাদের প্রভাবের মতো সময়ের সাথে সাথে বিভিন্ন অর্থনৈতিক চলকগুলির মধ্যে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তুলে ধরে, একটি গাণিতিক মডেলের নির্ভুলতার সাথে স্বল্পমেয়াদি ও মধ্যমেয়াদি নীতির জন্য। প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ সুখময় চক্রবর্তী বলেছিলেন যে, যারা পরিকল্পনা প্রণয়নের সমস্যার পরিমাণগত পন্থা নিয়ে কাজ করছেন তাদের জন্য মহলানবিশের মডেল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষ করে বড় আকারের অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে।

❑ প্রাপ্তি :

মৌলিক ও ভারী শিল্পের বিকাশ অর্থনৈতিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত। ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা বলে যে একটি দেশের প্রথমে কৃষি, তারপর ভোগ্যপণ্য শিল্প এবং সর্বশেষ মৌলিক ও ভারী শিল্প গড়ে তোলা উচিত। এগুলিকে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পর্যায় হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। ভারত সর্বপ্রথম আগের ধাপগুলি এড়িয়ে যায় এবং পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি, প্রধানত পাবলিক সেক্টরে ভারী এবং মূলধনী পণ্য শিল্পের বিকাশের দিকে পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য ছিল। বেসরকারি খাত কঠোর নিয়মের অধীনে ছিল। তিনটি নতুন স্টিল প্ল্যান্ট, প্রতিটি ১ মিলিয়ন টন ক্ষমতার, পাবলিক সেক্টরে স্থাপন করা হয়েছিল এবং ভারী বৈদ্যুতিক এবং ভারী মেশিন টুলস শিল্প, ভারী মেশিন বিল্ডিং এবং ভারী প্রকৌশলের অন্যান্য শাখাগুলির ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছিল। সিমেন্ট ও কাগজ শিল্পের জন্য যন্ত্রপাতি উৎপাদনও প্রথমবারের মতো শুরু হয়। রাসায়নিক শিল্পের ক্ষেত্রে একটি বিস্তৃত ফ্রন্টে অগ্রগতি ছিল, যা শুধুমাত্র বড় ইউনিটের দিকে পরিচালিত করে না এবং মৌলিক রাসায়নিকের উৎপাদন ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়, যেমন, নাইট্রোজেনাস সার, কস্টিক সোডা, সোডা অ্যাশ এবং H_2SO_4, তবে একটি প্রস্তুতকারকের কাছেও ইউরিয়া, অ্যামোনিয়াম ফসফেট, পেনিসিলিন, সিন্থেটিক ফাইবার, নিউজ-প্রিন্ট ইত্যাদির মতো নতুন পণ্যও গুরুত্বপূর্ণ। স্টিলের ইঙ্গটগুলির উৎপাদন দ্বিগুণ, অ্যালুমিয়িামের 2.5 গুণ, মেশিন টুলস ৭ গুণ, পেট্রোলিয়াম পণ্যগুলির ৫৮ শতাংশ এবং রাসায়নিক উৎপাদন বেড়েছে ৯০ শতাংশ। সাইকেল, সেলাই মেশিন, টেলিফোন, বৈদ্যুতিক পণ্য, টেক্সটাইল এবং চিনির যন্ত্রপাতির মতো অন্যান্য শিল্পেরও উৎপাদন রেকর্ডমাত্রায় হয়েছে। সর্বোপরি, এটা বলা যেতে পারে যে একটি স্বনির্ভর অর্থনীতির লক্ষ্যের দিকে ত্বরান্বিত প্রবৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় যা কিছু মৌলিক শর্ত তা দ্বিতীয় পরিকল্পনার সময় সফলভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

2.4 দ্বিতীয় পরিকল্পনার রাজনৈতিক উদ্দেশ্য

দ্বিতীয় পরিকল্পনার সময় ভারতের জাতীয় কংগ্রেসই ছিল একমাত্র দল। এই দলের নিয়ামক তখন পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু। তিনি একাধারে বহু কমিটির মাথা, পরিকল্পনা কমিশন সহ। পরিকল্পনা গ্রহণ করে ভারতকে উন্নীত করাই ছিল তাঁর একমাত্র রাজনৈতিক উদ্দেশ্য। তৎকালীন সোভিয়েত রাশিয়া ফেল্ডম্যান মডেল অনুসরণ করে, রাশিয়াকে শিল্পায়িত উন্নত দেশে পরিণত করে। নেহরু তাই আমেরিকা ও পশ্চিমী ভাবাদর্শে ভাবিত না হয়ে, সোভিয়েত পরিকল্পনার মডেলটি গ্রহণ করলেন। তিনি মনে করলেন শিল্পায়ন এবং পরিকল্পনাই হল ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ। তিনি রাষ্ট্রকে বিশেষ ক্ষমতা দিলেন এবং বেসরকারী সংস্থাকে খাটো চোখে দেখলেন যে সমস্ত বিরোধী দল তখন বিদ্যমান ছিল, তারাও আর বিরোধিতা না করে নেহরুর এ প্রস্তাব মেনে নিল। নেহরু নির্বিবাদে মহলানবিশের সহায়তায় তাঁর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধিত করলেন—আমদানি-প্রতিস্থাপন শিল্পায়ন ঘটিয়ে, যদিও মুষ্টিমেয় অর্থনীতিবিদ এর তীব্র বিরোধিতা করলেন। ভকিল-ব্রহ্মানন্দ মডেলটি সেইজন্য উপেক্ষিত হল। ভকিল পরিকল্পনা কমিশনের সঙ্গে সবরকম সম্পর্ক ছিন্ন করলেন। তখন একতরফা মহলানবিশ-ফেল্ডম্যান মডেল গ্রহণ না করে যদি ভকিল-ব্রহ্মানন্দের মজুরি-পণ্যের মডেলটির খানিকটাও নেহরু অন্তর্ভুক্ত করতেন, তবে ভারতকে ৩.৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধির হার ১৯৮১ পর্যন্ত যা বলবৎ ছিল, তা ভারতে ঘটত না। আধুনিক গবেষণায় তা প্রমাণিত হয়েছে।

2.5 দ্বিতীয় পরিকল্পনায় অবহেলিত কৃষিক্ষেত্র

নেহরু-মহলানবিশের উন্নয়নের কৌশল যদিও ভারতকে একটি ভারী শিল্পের ভিত্তি গড়ে তুলতে সাহায্য করতে সফল হয়েছে তবু তা ভারসাম্যহীন প্রবৃদ্ধি। কৃষি বৃদ্ধি এবং গ্রামীণ দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থানের পূর্বের প্রতিশ্রুতিকে বিপরীত করার ভারসাম্যহীন পদ্ধতির সাথে একটি বড় ধাক্কা বলে মনে হয়েছিল। কৃষি উৎপাদন বছরের পর বছর ওঠানামা করে এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে বেকারত্বের বকেয়া ৯ মিলিয়ন অনুমান করা হয়েছিল, যদিও পরিকল্পনাটি প্রায় ৮ মিলিয়ন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সফল হয়েছিল। এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনার সময় ভারতীয় অর্থনীতি "টেক-অফ" পর্যায় থেকে অনেক দূরে ছিল। শিল্পায়নের অগ্রগতির জন্য একটি কৃষি উদ্বৃত্ত অপরিহার্য। শিল্পের বৃদ্ধি কৃষি বৃদ্ধির জন্য সমানভাবে অপরিহার্য। কৃষি ও শিল্পকে একসঙ্গে এগিয়ে যেতে হবে। প্রকৃতপক্ষে মহলানবিশের দৃষ্টিভঙ্গি পরিকল্পনা কৃষির দিক থেকে মনোযোগের পরিবর্তনের শিকার হয়েছিল। বিনিয়োগ বরাদ্দের ক্ষেত্রে এবং নীতি সংস্কারের ক্ষেত্রে উভয় ক্ষেত্রেই কৃষি উন্নয়নকে কম অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছিল, স্পষ্টতই এই বিশ্বাসে যে কৃষি আর কোনো সমস্যা তৈরি করবে না এবং একটি গতিশীল শিল্পায়ন কৃষিক্ষেত্রে সমানভাবে গতিশীল উন্নয়ন শুরু করতে সাহায্য করবে। কেউ কেউ এমনও সমালোচনা করে বলছেন যে, পরিকল্পনাবিদদের দ্বারা কৃষির অবহেলা পূর্বনির্ধারিত ছিল।

বাস্তবতা হল যে, প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বাদ দিলে, সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণের সাথে কৃষির অংশ কার্যত স্থির থেকে গেছে। কৃষি উৎপাদন, বিশেষ করে খাদ্যশস্য, পাট, তুলা ও তৈলবীজের উৎপাদনে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। পরিকল্পনাবিদ্‌রা ১৯৫৭-৫৮ এবং ১৯৫৯-৬০ সালের বর্ষার ব্যর্থতার জন্য কৃষি উৎপাদনের পতনকে দায়ী করেছিলেন, কিন্তু আসলে খাদ্য উৎপাদন বাড়ানোর জন্য যথেষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। ভারতের পর্যাপ্ত জল সরবরাহ এবং উর্বর মাটির কারণে, বৈজ্ঞানিক কৃষির প্রয়োগের মাধ্যমে ফলন দ্বিগুণ বা তিনগুণ করা যেতে পারে।

জনসংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং সরকার শিল্পের ওপর তার উন্নয়ন প্রচেষ্টাকে কেন্দ্রীভূত করার ফলে ভারতকে প্রচুর পরিমাণে খাদ্যশস্য আমদানি করতে হয়েছিল, যার বেশির ভাগই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে। ইউএস এগ্রিকালচার ট্রেড ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড অ্যাসিসট্যান্স অ্যাক্ট অফ ১৯৫৪, যা PL480 প্ল্যান নামেও পরিচিত, ১৯৫৭ সালে শুরু হয়। তারপরে এক দশক ধরে মার্কিন মুলুক খাদ্যশস্য ভারতে প্রেরণ করে। ১৯৫৯ সালে, ভারতের খাদ্য সংকটের উপর ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের একটি প্রতিবেদনে কৃষি গবেষণা, সম্প্রসারণ, উপকরণ নিবিড়তা বৃদ্ধি এবং প্রণোদনার উপর অনেক বেশি মনোযোগ দেওয়ার সুপারিশ করা হল।

পরিশেষে বলা যায়, বোম্বে প্ল্যান (ভারতের জন্য অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিকল্পনা)-এর লেখক থেকে শুরু করে নেহরু এবং মহলানবিশ পর্যন্ত সকলেই শিল্পকে ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নের চাবিকাঠি হিসেবে দেখেছেন। নেহরু এবং তাঁর সহযোগীদের জন্য বড় আকারের শিল্পায়ন ছিল প্রযুক্তি এবং বৈজ্ঞানিক চেতনার একটি বাহক। কৃষি উৎপাদন চিরাচরিত পদ্ধতির সাথে যুক্ত ছিল এবং এইভবে নতুন প্রযুক্তির প্রয়োগের জন্য সামান্য সুযোগ প্রদান হিসাবে দেখা হয়েছিল, যা সেই সময়ে আমূল পরিবর্তনের দাবি করেছিল। শুধুমাত্র ভূমি সংস্কার এবং ক্ষুদ্র সেচ ব্যবস্থাপনাকে কৃষিতে প্রবৃদ্ধির প্রধান উৎস হিসেবে দেখা হয়। তথাকথিত সবুজ বিপ্লব শুধুমাত্র ১৯৬০-এর দশকের শেষের দিকে ভারতে ঘটেছিল। ভারতের মতো একটি দেশে যেখানে জনসংখ্যার ৭০ শতাংশ কৃষি এবং সংশ্লিষ্ট ক্রিয়াকলাপের উপর নির্ভরশীল, সেখানে কৃষি থেকে শ্রম প্রত্যাহার অন্যান্য উৎপাদনশীল কর্মকাণ্ড এবং পেশাকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রায় সমতুল্য হিসাবে দেখা হয়। এর ফলে কৃষিকে বিবেচনা না করে শিল্প বিকাশের উপর একচেটিয়া জোর দেওয়া মারাত্মক হয়ে ওঠে। শিল্পায়ন উল্লম্বভাবে এগিয়ে এবং কৃষিকে অনুভূমিকভাবে প্রসারিত করা হয়েছিল। ফলে কৃষির চেয়ে শিল্পের বিকাশ ঘটতে থাকে দ্রুত। ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত, কৃষি উৎপাদনের সূচক শিল্প উৎপাদনের থেকে খুব বেশি বিচ্যুত হয়নি। ১৯৫৮ সাল নাগাদ, শিল্প উৎপাদনের সূচক ১৬০-এ দাঁড়িয়েছিল। ১৯৫৮-এর পরে, দুটি প্রবণতা খুব দ্রুত এবং আমূলভাবে বিচ্যুত হয়েছিল, কারণ ১৯৬০-৬৩ সালে কৃষি উৎপাদন প্রায় ১৫০-এ স্থির হয়ে পড়েছিল। প্রথম তিনটি পরিকল্পনার সময় (১৯৬৫-৬৬ বাদ দিয়ে), ভারতের কৃষি বার্ষিক ৩ শতাংশের বেশি হারে বৃদ্ধি পেয়েছিল, ১৯৫১ থেকে ১৯৬৫ সালের মধ্যে প্রতি বছর ৭ শতাংশ চক্রবৃদ্ধি হারে শিল্প কৃষির চেয়ে বেশি বৃদ্ধি পেয়েছিল। ভারতের মতো একটি কৃষি অর্থনীতিতে মজুরি পণ্যের সিংহভাগ খাদ্যশস্য এবং অন্যান্য কৃষি-ভিত্তিক পণ্য নিয়ে গঠিত। শিল্পায়ন এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য কর্মসূচির পাশাপাশি স্থিতিশীল মূল্যে মজুরি পণ্যের পর্যাপ্ত সরবরাহ প্রয়োজন। কিন্তু এমনটা হয়নি। কর্মসূচি ও পরিকল্পনা বরাদ্দে শিল্প ও কৃষির মধ্যে চাহিদা ও সরবরাহের পারস্পরিক নির্ভরতা সম্পূর্ণরূপে স্বীকৃত হয়নি। সুখময় চক্রবর্তী (১৯৯৩) উল্লেখ করেছেন যে এমনকি মহলানবিশ নিজেও কৃষি উন্নয়নে প্রাতিষ্ঠানিক বাধার সমস্যা মোকাবিলার জন্য কোনো প্রচেষ্টা করেননি। মহলানবিশ কৃষি খাতে উদ্ভূত বৃদ্ধির বাধাগুলি পর্যাপ্ত পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করেননি, যদিও ভারতীয় পরিসংখ্যান ইনস্টিটিউটে সেই সময়ে নিযুক্ত তাঁর পরামর্শদাতা ড্যানিয়েল থর্নার বেশ কয়েকটি গবেষণাপত্রে এই বিষয়গুলিতে জোর দিয়েছিলেন এবং কৃষি ক্ষেত্রকে উন্নীত করার জন্য আবেদন করেছিলেন।

2.6 মজুরি পণ্যের মডেল উদ্ধার হিসাবে এসেও কেন ব্যর্থ হয়েছিল?

অধ্যাপক মহলানবিশের মত ছিল যে বিরাট শ্রমশক্তি এবং গ্রামাঞ্চলে প্রাপ্তব্য কাঁচামালের প্রাচুর্যের সদ্ব্যবহার করলে, অনেকটা মূলধনী বিনিয়োগের পরেও কৃষি ও কুটীর শিল্পের জন্য বিরাট ক্ষেত্র উন্মুক্ত থাকবে, এবং সেই ক্ষেত্র থেকেই

জনসাধারণের খাদ্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্যের অভাব মিটবে। পরে যখন বিদ্যুৎশক্তি, সেচ-ব্যবস্থা ইত্যাদির ক্ষেত্রে যথেষ্ট বিকাশ হবে, তখন আরো বেশি ভোগ্যপণ্যের উৎপাদন সম্ভব হবে। কুটীর শিল্পে কর্মসংস্থানও হবে ব্যাপকভাবে। অবশ্য মহলানবিশ এদিকটা একেবারেই ভালো করে ব্যাখ্যা করেননি। ফলে এই মডেল যে যথেষ্ট সমালোচিত হবে, তা বলাই বাহুল্য।

ভকিল ও ব্রহ্মানন্দ তাঁদের লিখিত পুস্তকে মজুরিপণ্যের একটি পুরোপুরি মডেল তৈরি করে তাঁরা বলেছিলেন যে কর্মসংস্থান ও অবশ্য প্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্যের উৎপাদন এই দুই লক্ষ্যের দিকে নজর রেখেই ভারতের উন্নয়ন পরিকল্পনা রচনা করা উচিত।

❑ মজুরি-পণ্যের মডেলটি সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা :

সি. এন ভকিল এবং পি. আর. ব্রহ্মানন্দ ১৯৫০-এর দশকে ভারতীয় প্রেক্ষাপটে উন্নয়ন পরিকল্পনার মহলানবিশ কৌশলের বিকল্প হিসাবে উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য মজুরি-পণ্য পদ্ধতির পরামর্শ দিয়েছিলেন। কৌশলটিকে প্রথমে তাঁদের বইতে রূপরেখা দেওয়া হয়েছিল, যার শিরোনাম ছিল *প্ল্যানিং ফর অ্যান এক্সপ্যান্ডিং ইকোনমি* (১৯৫৬), এবং তারপরে তাঁদের পরবর্তী লেখাগুলিতে প্রসারিত হয়েছে। ব্রহ্মানন্দ পরে এই কৌশলটির বিশ্লেষণমূলক কাঠামোকে তাঁর বিখ্যাত গবেষণাপত্রে প্রসারিত করেন, যার নাম The Extended Wage Goods Strategy of Development (1973) এবং পরে তাঁর প্ল্যানিং ফর এ ওয়েজ গুডস ইকোনমি (১৯৯৫) বইয়ে আরও বিস্তৃত করেন।

এই ভকিল এবং ব্রহ্মানন্দ কৌশলের (সংক্ষেপে ভিবিএস) মূল বৈশিষ্ট্য হল তাৎক্ষণিকভাবে কর্মসংস্থান এবং ভোগ সম্প্রসারণের উপর জোর দেওয়া যাতে ভারতীয় জনসংখ্যার সাধারণের জন্য দারিদ্র্য বিমোচন করা যায় এবং সমতা সহ প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করা যায়। মহলানবিশ কৌশলের সাথে এর অপরিহার্য পার্থক্য হল ভারতীয় অর্থনীতির দীর্ঘমেয়াদি প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনাকে উৎসাহিত করার পরিবর্তে স্বল্পমেয়াদে আয় এবং কর্মসংস্থানের উপর জোর দেওয়া হয়েছে যা প্রাথমিকভাবে বিস্তৃত হলে স্থায়ী পদ্ধতিতে বাড়ানো যেতে পারে, বৈদেশিক বাণিজ্যের মাধ্যমে তুলনামূলক সুবিধার নীতির মাধ্যমে যাতে মজুরি পণ্যগুলি ধীরে ধীরে মূলধনী পণ্যের উৎপাদনে রূপান্তরিত হয়। ক্ষুদ্র ও মাঝারি আকারের গ্রামীণ শিল্প, কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন এবং বঞ্চিতদের সামাজিক ন্যায়বিচার দান অত্যন্ত জরুরি। এটি ভোগ্যপণ্যের বৃদ্ধির মাধ্যমে বর্তমান প্রজন্মের কল্যাণ বাড়ানোর জন্য পর্যাপ্ত সুরক্ষার সাথে ভারতীয় অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি কর্মসূচিকে ত্বরান্বিত করবে। এটা ঠিক যে মজুরি পণ্য উৎপাদনের জন্য মূলধনী দ্রব্যের প্রয়োজন হবে, কিন্তু যদি অ-মৌলিক জিনিসের বিপরীতে মৌলিক পণ্যের সম্প্রসারণের উপর জোর দেওয়া হত, তাহলে বিলাসবহুল ভোগ্যপণ্যের ঝুড়ি বাড়ানোর সমস্যা তৈরি হয় না। মেঘনাদ দেশাই (১৯৯৮)-এর ভাষায় : "এই থিসিসের মূল ধারণাটি হল যে ভারতে বেকারত্বের কারণ পুঁজির ঘাটতির কারণে, বা মেশিন সামগ্রীর আকারে নয়, বরং মজুরি পণ্যের ঘাটতির কারণে।" ভকিল এবং ব্রহ্মানন্দ যুক্তি দিয়েছিলেন যে, ছদ্মবেশী বেকারত্বের সম্ভাব্য সঞ্চয়কে 'মৌলিক' বিনিয়োগ পণ্য খাতে আরও উৎপাদনশীল ব্যবহারে রূপান্তরিত করা যায়। এক অর্থে, এই উপলব্ধিটি আর্থার লুইসের (১৯৫৪) গবেষণাকেই প্রতিধ্বনি করে। কিন্তু দুঃখের কথা, একটি দরিদ্র শ্রম-প্রচুর অর্থনীতিতে অর্থনৈতিক উন্নয়নের হাতিয়ার হিসাবে Wage good model ও তাঁদের অন্তর্দৃষ্টি সেই সময়ে ভারতীয় নীতিনির্ধারকদের কাছে কোনো গুরুত্ব পায়নি। VBS-এর অনেক ভবিষ্যদ্বাণী ভারতীয় অর্থনীতির পরবর্তী উন্নয়নে সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছিল।

এক অর্থে, ভকিল এবং ব্রহ্মানন্দ গ্রাম ও ক্ষুদ্র শিল্প এবং কৃষি খাতের সম্প্রসারণসহ গ্রামীণ উন্নয়নের ভিত্তিতে দরিদ্র মানুষের অর্থনৈতিক 'স্বরাজ' বিষয়ে মহাত্মা গান্ধীর ধারণা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। মজুরি পণ্য কৌশলের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে এবং একটি শ্রম উদ্বৃত্ত অর্থনীতিতে শ্রম নিবিড় কৌশলকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে—ভারতের মতো দেশে, একদিকে যেমন কর্মসংস্থান এবং আয়ের সর্বোচ্চকরণের লক্ষ্য, এবং দক্ষতা গঠন এবং সমগ্র অর্থনীতিতে চাহিদা সংযোগের বিস্তারের দিকে নজর দেওয়া হয়েছে, অন্যদিকে তাঁরা কৃষি ও গ্রাম ও ক্ষুদ্র শিল্পের বৃদ্ধিকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছেন। ভিবিএস সেই মূলধনী পণ্যগুলির উৎপাদনের ওপর জোর দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে। এই ধরনের বিনিয়োগ কৌশল রাজনীতিবিদ্‌দের দ্বারা প্ররোচিত দুর্নীতিগ্রস্ত এবং অদক্ষ আমলাতন্ত্রের নেতৃত্বে লাইসেন্স এবং ভর্তুকি রাজের প্রয়োজনীয়তা দূর করবে। এটি ভারতের মতো একটি দরিদ্র দেশে অর্থনৈতিক অগ্রগতির সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি এবং ভকিল এবং ব্রহ্মানন্দ এই ধারণাটিকে "ইন্টিগ্রেটেড ওয়েজ গুডস" (IWG) মডেলের পরিপ্রেক্ষিতে দেখিয়েছেন। তাঁদের মডেলের ধারণার সাথে ঘনিষ্ঠ মিল রয়েছে কার্ল মার্কসের বর্ধিত পুনরুৎপাদন ব্যবস্থার ধারণার সঙ্গে এবং তাঁরা এটিকে কার্যকর চাহিদার ধারণার সাথে একত্রিত করেছেন।

মজুরি-পণ্য কৌশলের প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্যগুলি সংক্ষিপ্ত করে বলা যেতে পারে : (a) 'মজুরি-দ্রব্য'-এর সমন্বিত ঝুড়ি (Composite basket) জীবিকা নির্বাহ এবং কর্ম সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় ভোগের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেয়। (b) মূলধনী পণ্যের 'মৌলিক' শ্রেণির বৃদ্ধিকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত যা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সমাজের "মজুরি পণ্যের ঝুড়ি" সম্প্রসারণের জন্য প্রয়োজনীয়। (c) যথাযথ আর্থিক, এবং প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা যত্ন সহকারে গ্রহণ করা হলে, মজুরি পণ্যের সম্ভাব্য সঞ্চয় অর্থনীতির প্রবৃদ্ধির হার বাড়াবে। (d) কর্মসংস্থান সম্প্রসারণের উপর জোর দিয়ে মজুরি-দ্রব্যের কৌশল গ্রহণ করলে এই দেশে প্রবর্তিত মহলানবিশ-ফেল্ডম্যানের বিভিন্ন ধরনের পরিকল্পনায় অনুমান করা 'ট্রিকল-ডাউন' হাইপোথিসিসের বা চুঁইয়ে পড়া প্রকল্পের তুলনায় তা অনেক বেশি ন্যায়সঙ্গত হবে। (e) মজুরি-দ্রব্যের কৌশলটি স্বল্পমেয়াদে উৎপাদন দক্ষতাকে সর্বাধিক করবে, জনসংখ্যার মধ্যে ব্যবহারকে সমানভাবে ছড়িয়ে দেবে, অর্থনীতিতে মুদ্রাস্ফীতির সম্ভাবনা হ্রাস করবে, এবং বিদেশী পুঁজির উপর কম নির্ভরতা আনবে।

এক অর্থে, সমন্বিত মজুরি পণ্য কৌশল সমাজতান্ত্রিক শাসনের অধীনে চিনের উন্নয়নের পথের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। চিন, ভারতের চেয়ে বড় জনসংখ্যার আকারের সাথে, বেশিরভাগ দেশীয় প্রযুক্তি ব্যবহার করে কৃষি এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের বিকাশের প্রাথমিক পর্যায়ে কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং সবার জন্য ন্যূনতম ব্যবহারের মানকে জোর দিয়েছে। শুধুমাত্র সাম্প্রতিক দশকগুলিতে, চিন তার অর্থনীতিকে উন্মুক্ত করেছে এবং বিদেশী পুঁজি আমদানি করার অনুমতি দিয়েছে। চিন বার্ষিক ৯ শতাংশের মতো উচ্চ প্রবৃদ্ধির হার অর্জন করেছিল। এটি কোনওভাবেই ছোট অর্জন নয় এবং ভারত সম্ভবত তুলনীয় স্তরের উন্নয়নও অর্জন করতে পারত যদি নেহরু এবং তাঁর নিকটস্থ পরিকল্পনা-প্রণেতারা প্রাথমিক বছরগুলিতে VBS দ্বারা প্রস্তাবিত উন্নয়ন কৌশলের সঠিক পথ বেছে নিতেন। কিন্তু এর জন্য প্রয়োজন ছিল প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার। ভারতীয় রাজনৈতিক নেতৃত্ব পরিকল্পনার মহলানবিশ কৌশলের আড়ালে একটি "মিশ্র" অর্থনীতি পরিচালনা ও নিরীক্ষণের জন্য আমলাতন্ত্রের ব্রিটিশ মডেলের সহায়তায় শিল্পায়নের সোভিয়েত মডেলকে পছন্দ করেছিল। এটি আমাদের সমাজ ও অর্থনীতিতে আমূল কাঠামোগত এবং প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার শুরু করার রাজনৈতিক ঝুঁকি এড়িয়ে গেছে। চিন ঝুঁকি নিয়েছে এবং সাফল্যের মুখ দেখেছে। ভারত করেনি, এবং ভারতের জনগণ এবং অর্থনীতি বারবার সঙ্কটের মাধ্যমে এর মূল্য পরিশোধ করছে। ভকিল এবং ব্রহ্মানন্দ ৬০ বছর আগে এই

বিপজ্জনক পরিণতির বিরুদ্ধে সতর্ক করেছিলেন, ব্যষ্টিগত স্তরে ভারতীয় অর্থনীতির পরম বাস্তবতা সম্পর্কে তাঁদের দূরদর্শিতা এবং উপলব্ধির ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, কিন্তু রাজনৈতিক বিবেচনাগুলি সমন্বিত মজুরি পণ্য কৌশলের এই দুর্দান্ত ধারণাটিকে সরিয়ে দিয়েছে।

১৯৭৩ সালে, পি. আর. ব্রহ্মানন্দ একটি 'বর্ধিত মজুরি পণ্য কৌশল' প্রস্তাব করেছিলেন যেখানে তিনি পিয়েরো স্রাফা (১৯৬০)-এর কাঠামো অনুসারে মৌলিক এবং অ-মৌলিক পণ্যগুলির মধ্যে পার্থক্য করেছিলেন। বৈদেশিক বাণিজ্যকে অন্তর্ভুক্ত করে মজুরিপণ্য সাব-সিস্টেম প্রসারিত করার সুযোগেরও পক্ষে কথা বলেছেন। এটি এমন সময় তাঁর দ্বারা প্রস্তাবিত হয়েছিল যখন দেশ ইতিমধ্যেই খাদ্যশস্য উৎপাদনের ভিত্তি প্রসারিত করেছে ব্রহ্মানন্দের সুনিপুণ বর্ধিত মজুরি পণ্য কৌশল অনুসরণ করে। এম. জে. মনোহর রাও (১৯৯৬) একটি অপ্টিমাইজেশান কাঠামোর পরিপ্রেক্ষিতে ভকিল-ব্রহ্মানন্দ মজুরি পণ্য কৌশলকে আনুষ্ঠানিক রূপ দিয়েছেন এবং আমাদের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় গৃহীত মহলানবিশ কৌশলের সাথে ভারতীয় অর্থনীতিতে কর্মসংস্থান সৃষ্টির উপর তার অনুমানগুলির তুলনা করেছেন। তাঁর মতে, মজুরি পণ্যের মডেলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিকটি ছিল যে এটিতে কর্মসংস্থান সম্প্রসারণের জন্য একটি অন্তর্নির্মিত পক্ষপাত ছিল এবং একটি সামাজিক কল্যাণ অপেক্ষক ছিল, যা একটি শ্রম-উদ্বৃত্ত অর্থনীতিতে পূর্ণ কর্মসংস্থানে পৌঁছানোর জন্য প্রয়োজনীয় সময় কমানোর প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছিল। রাও-এর গবেষণা দেখায় যে, VBS-তে প্রায় ৬.২ শতাংশের তাৎক্ষণিক বৃদ্ধির হার অর্জন করা সম্ভব, যেখানে মহলানবিশ মডেলে এটি সম্ভব নয়।

যা হোক, আমাদের অর্থনীতির বিকাশের প্রাথমিক পর্যায়ে VBS কৌশলটি গ্রহণ করলে (ক) বৈদেশিক সম্পদের উপর নির্ভরতা কমে যেত, (খ) বাজেট সহায়তার মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা রাখা যেত। ভারত তার পরিকল্পনার প্রাথমিক দিনগুলিতে একটি ভুল কৌশল বেছে নিয়েছে। আমাদের দেশে সমন্বিত মজুরি কৌশল গৃহীত হলে পরিকল্পনার নামে সরকারি নিয়ন্ত্রণের আধিক্য এবং সংশ্লিষ্ট অপচয় এড়ানো যেত। এই ধরনের কাঠামোতে পরিকল্পনা করা প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার আনা যেত, এবং দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য বিশেষ কর্মসূচির সূচনা নিশ্চিত করত।

একটি পদ্ধতিগত স্তরে, উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য VBS হল Wage Goods Paradigm একটি উদাহরণ, যা একটি নির্দিষ্ট কৌশলের চেয়ে অনেক বেশি বিস্তৃত পটভূমিকে অন্তর্ভুক্ত করে। মজুরি পণ্যের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করার একটি বিষয় হল মজুরি, ভাল ঝুড়ির উপাদানগুলি চিহ্নিত করা এবং তাদের মূল্যায়ন এবং সমষ্টির জন্য একটি পদ্ধতি উদ্ভাবন করা। ঝুড়িতে থাকা বিভিন্ন উপাদানের ভিন্নতা এবং সময়, স্থান এবং অঞ্চলের মাধ্যমে তাদের বিবর্তিত প্রকৃতির কারণে সমস্যাটি অভ্যন্তরীণভাবে কঠিন। ভারতে উন্নয়নর মজুরি পণ্যের দৃষ্টান্তের গবেষকদের সামনে একটি বড় চ্যালেঞ্জ হল উপযুক্ত পরিসংখ্যানগত পদ্ধতির বিকাশ করা যাতে মজুরি পণ্যের ঝুড়ির সঠিক মূল্যায়ন করা যায় এবং মডেলটি কার্যকরা করা যেতে পারে। নীতির স্থপতিরা সাধারণ নিয়মগুলি চান। তাত্ত্বিক এবং পরিসংখ্যানবিদ্দের কাজ হল উপলব্ধ রাশিতথ্যের সাথে সম্পর্কিত বিভাগগুলিকে সংজ্ঞায়িত করা এবং সামঞ্জস্য করা এই ধরনের নিয়মগুলি বের করার জন্য, যা প্রয়োগ করা যেতে পারে, একটি সময়ে এবং সময়ের সাথে সাথে একটি অর্থনীতির কার্যকারিতার জন্য প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশের সূচনা করতে। অতএব, এমনকি যদি কেউ উন্নয়নের মজুরি ভাল দৃষ্টান্ত মেনে চলে, তবে সেই অনুযায়ী একটি উদ্দেশ্যমূলক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা সহজ নয়, কারণ আমাদের অর্থনীতিতে আমাদের

কাছে প্রয়োজনীয় প্রকার এবং ফর্মের ডেটা বা রাশিতথ্য নেই যাতে এই দৃষ্টান্ত অনুসারে বিকল্প অনুমানগুলি যাচাই করা যায়। তা সত্ত্বেও, এই যুক্তি দেওয়া যেতে পারে যে মহলানবিশ কৌশলের অনুকূলে পরিকল্পনা করার জন্য ভারতীয় অর্থনীতিতে তার মৌলিক শিল্প কাঠামো গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিল। কিন্তু জোরপূর্বক আমদানি প্রতিস্থাপনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল ভারতে মহলানবিশ কৌশলের প্রতিফলন হিসাবে। তার জন্য তখন জাতির জন্য প্রচুর সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যয় জড়িত হল এবং এটি দুর্নীতিগ্রস্থ ব্যবস্থাকে প্রশ্রয় দিতে সহায়তা করেছিল, যার ফলে স্বনির্ভরতা, সামাজিক ন্যায়বিচার শুধু কথার কথাই রয়ে গেল।

2.8 দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ফলাফল

দ্বিতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্যগুলি সংক্ষেপে হল—(i) পরিকল্পনাকালে জাতীয় আয়ের বার্ষিক ৫ শতাংশ হারে বৃদ্ধি, (ii) শিল্পের দ্রুত উন্নতি ঘটাতে মূল ও ভারী শিল্পের ওপর গুরুত্ব দান, (iii) কর্মসংস্থান বৃদ্ধি এবং সেই উদ্দেশ্যে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের প্রসার ঘটানো এবং (iv) আয় ও সম্পদ বণ্টনে অসাম্য হ্রাস করা এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন দূর করা। এই সমস্ত উদ্দেশ্য পূরণ করতে দ্বিতীয় পরিকল্পনায় যে তাত্ত্বিক মডেলের ওপর নির্ভর করা হয় সেটি হল নেহরু-ফেল্ডম্যান-মহলানবিশ মডেল। এই কৌশলের কথা হল, মূল ও ভারী শিল্পের বিনিয়োগ বাড়ালে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার বেশি হবে। তাই এই পরিকল্পনায় শিল্প, পরিবহন ও যোগাযোগের ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনার সাফল্য প্রথম পরিকল্পনার থেকে তুলনায় কম। এই পরিকল্পনায় জাতীয় ও মাথাপিছু আয়ের অভীষ্ট লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হয়নি। শিল্পের উৎপাদন গড়ে বার্ষিক ৭ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেলেও তা লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে কম ছিল। তবে এই পরিকল্পনাকালে গ্রামীণ ও ক্ষুদ্র শিল্পের যথেষ্ট প্রসার ঘটে। তাছাড়া, এই পরিকল্পনার সময়েই সরকারি উদ্যোগে তিনটি ইস্পাত কারখানার নির্মাণ শুরু হয়। কারখানাগুলি হল দুর্গাপুর, ভিলাই ও রাউরকেল্লা ইস্পাত কারখানা।

দ্বিতীয় পরিকল্পনার **প্রথম** ও প্রধান ব্যর্থতা হল কৃষি উৎপাদনের ঘাটতি এবং তার ফলে খাদ্যশস্যের দামের দ্রুতহারে বৃদ্ধি। ফলে সাধারণ দামস্তরও বাড়ে। পরিকল্পনাকালে দামস্তর ৩০ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। পরিকল্পনার চতুর্থ বছরের শেষে কিছু প্রকল্পও কাঁটছাট করতে হয়, কেননা বরাদ্দ টাকায় সব প্রকল্পের রূপায়ন করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি।

এই পরিকল্পনার **দ্বিতীয়** ব্যর্থতা হল, বৈদেশিক বাণিজ্যে ঘাটতি। বিশ্ব অর্থনীতিতে মুদ্রাস্ফীতির ফলে শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জামের আমদানি ব্যয় ভীষণভাবে বেড়ে যায়। ফলে বাণিজ্য ব্যালেন্সে (balance of trade) ঘাটতি হয়েছিল ২৩০৭ কোটি টাকা। ঋণ শোধ ইত্যাদির দায় যোগ করে এবং অন্যান্য খাতের আয়-ব্যয় ধরে নিয়ে নীট ঘাটতি ছিল ২০৫৯ কেটি টাকা। এটা পূরণ করা হয়েছিল বিদেশি সাহায্যে। আন্তর্জাতিক তহবিল থেকে ধার নিয়ে এবং সঞ্চিত বিদেশি মুদ্রার ভাণ্ডার থেকে ব্যয়িত অর্থ দিয়ে।

আগেই উল্লেখ করেছি পরিকল্পনার লক্ষ্য। এগুলি সাময়িকভাবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে পরস্পরবিরোধী হলেও, শেষ পর্যন্ত একটি আর একটিকে সাহায্য করবে বলে ধরা হয়েছিল। এই পরিকল্পনার **তৃতীয়** ব্যর্থতা হল এগুলির মধ্যে সমন্বয় রেখে এই পরিকল্পনা অগ্রসর হতে পারেনি। তবে দ্বিতীয় পঞ্চ বর্ষ পরিকল্পনা কালে কয়েকটি প্রধান ক্ষেত্রে যে বৃদ্ধি হয়নি, তা বলা যাবে না। নীচের ২.১ সংখ্যক সারণিতে তা দেখানো হল।

সারণি ২.১ : দ্বিতীয় পরিকল্পনাতে উৎপাদন

	১৯৫৫-৫৬ উৎপাদন	১৯৬০-৬১ প্রস্তাবিত উৎপাদন	১৯৬০-৬১ বাস্তব উৎপাদন
খাদ্যশস্য (মিলিয়ন টন)	৬৫.৮	৭৫.০	৭৬.০
ইস্পাত (লক্ষ টন)	১৭.০	৪৩.০	৩৫.০
অ্যালুমিনিয়াম (হাজার টন)	৭.৩	২৫.০	১৮.৫
মিলের কাপড় (মিলিয়ন গজ)	৫,১০২	৮৫০০	৫১২৭
কয়লা (মিলিয়ন টন)	৩৮.৪	৬০.০	৫৪.৬
বিদ্যুৎ (মিলিয়ন কিলোওয়াট)	৩.৪	৬.৯	৫.৭

তথ্যসূত্র : দ্বিতীয় পঞ্চ-বর্ষ পরিকল্পনা

এই পরিকল্পনার **চতুর্থ** ব্যর্থতা হল বেকারি দূর করতে ব্যর্থতা। এই পরিকল্পনায় ভারী শিল্পের ওপর জোর দেওয়া হয়। এ ধরনের শিল্প সাধারণত মূলধন নিবিড়। ফলে কর্মসংস্থান তেমন বাড়েনি এবং বেকারত্ব বেড়েছে। অনেক অর্থনীতিবিদ্ তাই অভিযোগ করেন যে, ভারতীয় অর্থনীতির প্রধান যে সমস্ত সমস্যা বিদ্যমান, যেমন বেকারি, বৈদেশিক বাণিজ্যে ঘাটতি, মুদ্রাস্ফীতি প্রভৃতি সমস্যা তা দ্বিতীয় পরিকল্পনা থেকেই শুরু হয়েছে। আসলে, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় গৃহীত কৌশল ছিল অসম উন্নয়ন কৌশল (unbalanced growth strategy)। কৃষিকে অনেকটা অবহেলা করেই ভারী শিল্পের ওপর জোর দেওয়া হয়েছিল। আসলে কৃষির সমস্যাবলি এই মডেলে কোনো গুরুত্বই পায়নি। কৃষিকে জুড়ে দেওয়া হয়েছিল হস্তশিল্পের সঙ্গে। কৃষিতে ১৯৬১ সালে যুক্ত ছিল মোট জনসংখ্যার ৭০ শতাংশ মানুষ এবং মোট জাতীয় আয়ের ৫০ শতাংশ আসত কৃষি থেকে। কৃষির উৎপাদন বাড়িয়ে কৃষি থেকে সঞ্চয় বাড়িয়ে মোট বিনিয়োগযোগ্য উদ্বৃত্ত কীভাবে বাড়িয়ে তোলা যায়, অর্থনৈতিক উন্নয়নের এই মূল প্রশ্নটাই তখনকার রাজনৈতিক নেতা ও পরিকল্পনা প্রণেতাদের আলোচনার বাইরে ছিল। ফলভোগ করতে হচ্ছে আজও। অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় থেকে যদি বিনিয়োগযোগ্য উদ্বৃত্ত গঠন করা না যায় তাহলে বিদেশি সাহায্য ছাড়া গতি নেই। তাছাড়া, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের কোনো ভূমিকা এই মডেলে না থাকার দরুন ধরেই নেওয়া হয়েছিল ভারত "বদ্ধ অর্থনীতি" হয়েই থেকে যাবে এবং আমদানি-প্রতিস্থাপন শিল্পায়ন কার্যকরী হবে। এই শিল্পায়ন ১৯৮১ সাল অবধি বলবৎ ছিল। বিপুল পরিমাণ মূলধনি দ্রব্য আমদানির জন্য যে বিদেশি মুদ্রার প্রয়োজন, রপ্তানি বাড়িয়ে তার সংস্থান করা যায়নি। ফলে দেখা দিল একদিকে খাদ্যের সংকট, অন্যদিকে বিদেশি মুদ্রার সংকট। খাদ্যের জন্য ভারত ক্রমশ মার্কিনি সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ল। ১৯৫৬ থেকে ১৯৬৬ সালের মধ্যে পাবলিক ল-৪৮০ (PL-480) আইনের অধীনে ভারত ১৫৬৩.৭ কোটি টাকার সাহায্য আমেরিকা থেকে পেয়েছে। এর মধ্যে ৬২.৮ শতাংশই ছিল ধার (৩-৪ শতাংশ সুদে ৪০ বছরে পরিশোধযোগ্য)। ধারের শর্ত এমনভাবে করা হয়েছিল যাতে পরবর্তীকালে ভারতে কৃষি উপকরণের বাজারে মার্কিনী বহুজাতিক সংস্থাগুলির একচেটিয়া কর্তৃত্ব কায়েম করতে সুবিধা হয়। ডিটমার রদারমুন্ড তাঁর বিখ্যাত পুস্তকে 'An Economic History of India : From Pre-colonial Times to 1986' (১৯৮৮) বলেছেন যে : India's Second FYP shows genuinely India's Dilemma : Dynamic Industrialization and Static Agriculture; as heavy industry in the public sector was considered to be the major item once

more, as it was the very symbol of economic independence and was thought to be critical for the maintenance of political independence (ভারতীয় দ্বিতীয় পরিকল্পনা নিশ্চিতভাবেই ভারতীয় দ্বন্দ্বকেই নির্দেশ করে যার একদিকে গতিশীল শিল্পায়ন এবং অন্যদিকে স্থবির কৃষি। সরকারি ক্ষেত্রে ভারী শিল্পকেই মূল উপাদান হিসেবে ধরা হয়েছিল কেননা তা ছিল আর্থিক স্বাধীনতার প্রতীক এবং রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্য রক্ষার এক কুশলী হাতিয়ার।)

এখানে উল্লেখ্য, পরিকল্পনা কমিশন এবং রাজ্যগুলির মধ্যে যে বিবাদ জন্ম নিল, তাতে এক তীব্র আর্থিক সংকট ১৯৫৭-৫৮ সালে দেখা দিল এবং পরিকল্পনার বহর কমানোর জন্য নানা ধরনের চাপ আসতে শুরু করল। ১৯৫৮ সালের মার্চ মাসে, বিদেশি মুদ্রাভাণ্ডার নাটকীয়ভাবে তলানিতে ঠেকল। এই পাঁচ বছরে মোট লেনদেন ব্যালেন্সের ঘাটতির পরিমাপ হল টাকার অঙ্কে ১,১২০ কোটি টাকা। পরিকল্পনা কমিশন বলে দিল যে ২০০ কোটি টাকা মেটানো হবে ভারতের স্টারর্লিং ব্যালেন্স থেকে এবং বাকিটা বৈদেশিক সাহায্য থেকে। পরিকল্পনার দুই বছরেই লেনদেন ব্যালেন্সের খাতে ঘাটতি বেড়ে হল ৮২১ কোটি টাকা। ভারত তখন বৈদেশিক মুদ্রার সম্পদ থেকে নিল ৪৭৯ কোটি টাকা। প্রতীয়মান হল যে লেনদেন ব্যালেন্সের ঘাটতি এই পাঁচ বছরে হবে ১,৭০০ কোটি টাকা।

এই লেনদেন ব্যালেন্সের সংকটের মূলে কাজ করেছে প্রতিরক্ষার আমদানির জন্য ক্রমবর্ধমান চাহিদা, লোহা এবং ইস্পাতের সাধারণ মূল্যবৃদ্ধি এবং বৈদেশিক মুদ্রার ক্রমবর্ধমান ব্যয়ভার। আরও একটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার এখানে কাজ করেছে। তা হল যা ভাবা হয়েছিল তার চেয়েও দ্বিগুণভাবে খাদ্যশস্যের আমদানিকে ঘিরে। অধিকন্তু, অর্থমন্ত্রী তখন আমদানি লাইসেন্স-এর ওপর যথাযথ নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে পারেনি। এইসব ঘটনাগুলি একত্রে মিলে যাওয়ার পর সরকারি ক্ষেত্রকে যতটা উন্নীত করা যেত, তা আর হয়ে উঠল না, সরকারি-ক্ষেত্রের প্রোগ্রামগুলি যে শেষ অবধি শেষ করা যায়নি, তার একমাত্র কারণ—'বৈদেশিক মুদ্রার সংকটই।' ক্রমে স্পষ্ট হল, মুদ্রাস্ফীতির চাপ অনেক শিল্প প্রজেক্টে টাকার মূল্যে ব্যয় বাড়িয়ে দিয়েছে।

এসব ব্যর্থতা সত্ত্বেও একথা অনস্বীকার্য যে, দ্বিতীয় পরিকল্পনাই ছিল একটি পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা যেখানে উন্নয়নের জন্য একটি সচেতন প্রয়াস লক্ষ করা যায়। প্রয়াসটি ছিল, অসম উন্নয়ন কৌশল গ্রহণ করে শিল্পায়ন ঘটানো। তাছাড়া, দ্বিতীয় পরিকল্পনাতেই ভারতে মূল ও ভারী শিল্পের বুনিয়াদ তৈরি হয়। দুর্গাপুর, ভিলাই ও রাউরকেল্লায় ইস্পাত শিল্পের ভিত্তিস্থাপন ঘটে। তবে একথাও বলা যায় যে, কৃষি উৎপাদনের স্থিতিশীলতা ও স্বয়ংসম্পূর্ণতা না এনে, শিল্পায়ন ঘটানো যায় না—এই হল এই পরিকল্পনার একটি শিক্ষণীয় বিষয়।

2.8 সারসংক্ষেপ

ভারতের দ্বিতীয় পঞ্চবর্ষ পরিকল্পনাকালে পণ্ডিত নেহরু তাঁর কেম্ব্রিজের বন্ধু আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পদার্থবিদ্ ও রাশিবিজ্ঞানী প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ (১৮৯৩-১৯৭২)-কে একটা পরিকল্পনা খসড়া নির্মাণ করতে অনুরোধ করেন। মোটামুটি দেশে পাঁচ বছরে কতটা বাৎসরিক উন্নতির জন্য দরকার এবং মোটামুটি ১.১ কোটি নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি কীকরে করা যাবে—এটাই তাঁকে পরিকল্পনার মাধ্যমে স্থির করতে বলা হয়। এই কাজটি সম্পন্ন করার জন্য প্রশান্তচন্দ্র দেশি ও বিদেশি প্রখ্যাত বহু অর্থনীতিবিদদের সাহায্য গ্রহণ করেন। যে পরিকল্পনাটি তিনি গঠন করেন তাতে আধুনিক প্রযুক্তিভিত্তিক ভারী শিল্পের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। প্রশান্তচন্দ্রের পরামর্শ ছিল মোট উদ্‌বৃত্তের

সিংহভাগ উপকরণ তৈরিতে বিনিয়োগ করা হোক। এর ফলে ভোগ্যপণ্যের জোগান আপাতত না বাড়লেও অর্থব্যবস্থার উৎপাদন ক্ষমতা ভবিষ্যতে অনেক বেশি হারে বৃদ্ধি পাবে। উপকরণ তৈরির ক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তি-নির্ভর ভারী ও মূল শিল্প দ্রুত গড়ে তোলার তিনি পক্ষপাতী ছিলেন। সোভিয়েত রাশিয়ার ফেল্ডম্যান মডেলের অনুকরণেই তিনি ভারতের দ্বিতীয় পঞ্চবর্ষ পরিকল্পনাটি গঠন করেন।এই কারণে এটিকে 'নেহরু-ফেল্ডম্যান-মহলানবিশ মডেল' আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে। ভারতবর্ষের মতো দেশে এই মডেলের কার্যকারিতা সম্বন্ধে অনেকেই উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদদ্বয় চন্ডুলাল নগিনদাস ভকিল এবং পাল্লাহাল্লি রামাইয়া ব্রহ্মানন্দ (১৯২৬-২০০২)।

এই দুইজন ভারতের দ্বিতীয় পঞ্চবর্ষ পরিকল্পনায় (১৯৫৬-৬১) ভিত্তিস্বরূপ মহলানবিশ নকশাকে সমালোচনা করে যৌথভাবে তৈরি করেন বিকল্প Wage-goods model (শ্রমজীবী ব্যবহার্য দ্রব্যকে অধিকতর গুরুত্ব দিয়ে)। অধ্যাপক মহলানবিশের নকশাতে প্রাথমিক স্তরে ভারী শিল্পকে গুরুত্ব দেবার পক্ষে যুক্তি দিলেন। ভকিল এবং ব্রহ্মানন্দ সেই যুক্তিকে বাতিল করে গোড়ার দিকে শ্রমজীবীদের জন্য অত্যাবশ্যক খাদ্য, বস্ত্র ইত্যাদির উৎপাদনের ওপর জোর দিতে বলেছিলেন।

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় মূলধনী দ্রব্যের জোগান বৃদ্ধির কৌশলকে ভকিল সম্পূর্ণ পশ্চাৎমুখী কৌশল বলে অভিহিত করেছেন। দ্বিতীয় পরিকল্পনা চালু হবার সাথে সাথেই তিনি যোজনা কমিশনের সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করেন। মহলানবিশের নির্দেশে রচিত দ্বিতীয় পরিকল্পনার সম্পূর্ণ বিরোধিতা করে ভকিল তাঁর তরুণ ছাত্র এবং বোম্বে স্কুলের সহকর্মী পি. আর. ব্রহ্মানন্দের সহযোগিতায় "Planning for an Expanding Economy" (১৯৫৬) রচনা করেন। এখানেও তিনি নতুন নতুন নিয়োগ সৃষ্টির প্রস্তাব রাখেন এবং আর্থিক প্রবৃদ্ধিতে শ্রমিক-ভোগ্য দ্রব্যের, খাদ্য ও শিল্পজাত উভয় ধরনের ভোগ্য দ্রব্যেরই ভূমিকার গুরুত্বকে তুলে ধরেন। শ্রমিক-ভোগ্য দ্রব্যের জোগানে অপ্রতুলতা দেখা দিলেই অর্থব্যবস্থায় মূল্যস্ফীতি যে অবশ্যম্ভাবী সে কথা এই গ্রন্থটিতে জোরের সঙ্গে উল্লেখ করা হয়। তবে এই পরামর্শ নেহরু ও পরিকল্পনা প্রণেতারা মেনে নেননি। ফলে ভকিল-ব্রহ্মানন্দদের মজুরি-পণ্যের মডেল উদ্ধারকর্তা হিসেবে এলেও তা বিকল্প হিসাবে কাজে লাগেনি।

2.9 অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলি :

1. অর্থনৈতিক পরিকল্পনা কাকে বলে?
2. ভারতে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার দুটি লক্ষ্য উল্লেখ করো।
3. পরিকল্পনা ছুটি কী?
4. ভারতের প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনার সময়কাল উল্লেখ করো।
5. পরিকল্পনার অর্থসংস্থান বলতে কী বোঝ?
6. Planned Economy for India বইটি কে কখন রচনা করেন?
7. পরিকল্পনা কমিশনের প্রধান কাজ কী ?

8. রাশিয়ার কোন্ মডেলের অনুকরণ করে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকীর ভিত্তিস্তর নির্মিত হয়েছিল?

মাঝারি উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলি :

1. দ্বিতীয় পঞ্চ-বর্ষ পরিকল্পনার লক্ষ্যগুলি উল্লেখ করো।
2. দ্বিতীয় পঞ্চ-বর্ষ পরিকল্পনার রাজনৈতিক উদ্দেশ্য কী ছিল?
3. মহলানবিশ মডেলটি কী কী অনুমানের ওপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছিল?
4. পরিকল্পনা মডেল কত প্রকার? এদের বৈশিষ্ট্য কী?

দীর্ঘ উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলি :

1. মহলানবিশ মডেলের বিকল্প মজুরিপণ্যের মডেল উদ্ধার হিসেবে এসেও তা কেন ব্যর্থ হয়েছিল?
2. দ্বিতীয় পঞ্চ-বর্ষ পরিকল্পনায় মহলানবিশ মডেলের গুরুত্ব উল্লেখ করো? এই মডেলটি কী সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছিল?
3. মহলানবিশ মডেলের সীমাবদ্ধতাসহ এর ইতিবাচক দিকগুলি আলোচনা কর। কৃষির সমস্যাবলি এই মডেলে কেন গুরুত্ব পায়নি?
4. দ্বিতীয় পঞ্চবর্ষ পরিকল্পনার ফলাফল বিশ্লেষণ করো।

2.10 গ্রন্থপঞ্জী

- Chakravarty, Sukhamoy (1987): *Development Planning* : *The Indian Exprience.* New Delhi : Oxford University Press.
- Chakraborty, Bidyut (২০০৮) : *Indian Politics & Society since Independence : Events, Process & Ideology,* London, Routledge
- দত্ত, ভবতোষ (১৯৮৭) : *ভারতের আর্থিক উন্নয়ন,* আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা
- বন্দ্যোপাধ্যায়, আশিসকুমার (২০১০) : ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নের রণকৌশল : অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ, *কক্ষপথ,* প্রথমবর্ষ, প্রথম সংখ্যা, জুলাই, কলকাতা, পৃষ্ঠা-৪৮
- Karmakar, Asim K. (2007): Mahalanobis Strategy of Development Planning : A Tale of India's Dilemma. *Artha Beekshan*. Vol. 16 - No.2, September. pages 58-68.
- কৌসল, জি (১৯৭৯) : *ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস : ১৭৫৭ থেকে ১৯৬৬,* কল্যাণী পাবলিশার্স, নিউ দিল্লি।
- বর্ধন, প্রণব (১৯৮৫) : *রাষ্ট্র, সমাজব্যবস্থা ও দেশের শ্রীবৃদ্ধি,* আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা
- রুদ্র, অশোক (১৯৮৫) : *ভারতবর্ষের কৃষি অর্থনীতি,* আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা
- সরখেল, জয়দেব ও সেলিম, সেখ (২০২২) : *ভারতীয় অর্থনীতি,* বুক সিন্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা
- Thakur, Anil Kumar & Mukherjee, Debes (2010) eds., *Economic Philosophy of Jawaharlal Nehru*, New Delhi : Deep and Deep Publications.

একক 3 ◘ পরিকল্পনার সমাজতান্ত্রিক নীতির ওপর আক্রমণ

গঠন

3.1 উদ্দেশ্য

3.2 প্রস্তাবনা

3.3 বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলের উত্থান

3.4 বেসরকারি উদ্যোগের উত্থান

3.5 তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা এবং এর ব্যর্থতা

3.6 পরিকল্পনার সামাজিক লক্ষ্য থেকে পশ্চাদপসরণ

3.7 পরিকল্পনার ছুটির সময়সীমায় (১৯৬৬-৬৯) কৃষিনীতি পুনর্গঠনের প্রচেষ্টা

3.8 প্রভুত্বশালী শ্রেণিসমষ্টিগত অভ্যন্তরীণ সংঘাত

3.9 ১৯৬৯ থেকে ১৯৭৪ সালের মধ্যবর্তী সময়সীমায় সমতা, সামাজিক ন্যায়বিচার ও স্বনির্ভরতার ওপর অগ্রাধিকার

3.10 পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচির প্রবর্তন

3.11 সারসংক্ষেপ

3.12 অনুশীলনী

3.13 গ্রন্থপঞ্জী

3.1 উদ্দেশ্য

এই অধ্যায় পাঠ করলে জানা যাবে :

ভারতে—

- কীভাবে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলের উত্থান ঘটেছিল;
- বেসরকারি উদ্যোগের উত্থানের কতিপয় বক্তব্য;
- তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ও এই পরিকল্পনার ব্যর্থতা;
- কীভাবে পরিকল্পনার সামাজিক লক্ষ্য থেকে পশ্চাদ্‌পসরণ ঘটেছিল;
- কীভাবে পরিকল্পনার ছুটির বছরগুলোতে কৃষিনীতির পুনর্গঠন হয়েছিল এবং
- প্রভুত্বশালী শ্রেণিসমষ্টিগত অভ্যন্তরীণ সংঘাত সম্পর্কে সম্যক ধারণা;

- কীভাবে ১৯৬৯ থেকে ১৯৭৪ সালের মধ্যবর্তী সময়সীমায় সমতা, সামাজিক ন্যায় বিচার ও স্বনির্ভরতার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল এবং
- পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কেন দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচির প্রবর্তন হয়েছিল

3.2 প্রস্তাবনা

এই অধ্যায়ে আমরা রাজনৈতিক আবহাওয়ায় তৃতীয় পঞ্চবর্ষ পরিকল্পনা (১৯৬১-৬৬) এবং চতুর্থ পরিকল্পনার ছুটির বছরগুলি (১৯৬৬, ৬৮, ৬৯) অন্তর্ভুক্ত করে চতুর্থ পঞ্চবর্ষ পরিকল্পনার (১৯৬৯-৭৪) অধীনে আর্থিক সমতা, সামাজিক ন্যায়বিচার ও স্বনির্ভরশীলতার ক্ষেত্রে ভারত কতদূর অগ্রসর হয়েছে, তার কথা আলোচনা করব। এই সময়সীমায় বা তারও আগে থেকে যে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলগুলির যেভাবে উত্থান হয়েছে তার কথাও আলোচনা করব। বেসরকরারি উদ্যোগেরও উত্থান এর একটি অংশ হিসেবে বিবেচিত হবে। তাছাড়া পঞ্চম পঞ্চবর্ষী পরিকল্পনায় যে সমস্ত দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে, সে-সবও উল্লেখ করা হবে।

3.3 বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলের উত্থান

স্বাধীনতার পর পরই কংগ্রেস দলই এককভাবে রাজনৈতিক ক্ষমতায় এল। রাজেন্দ্রপ্রসাদ প্রথম ভারতীয় প্রেসিডেন্ট হলেন এবং পি. ট্যান্ডন কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট হলেন কিন্তু সময়ের সাথে সাথে কতিপয় কংগ্রেস নেতা কংগ্রেস-এরই কাজকর্মে খুশি হলেন না। ১৯৪৮ সালে সোসালিস্ট পার্টি গঠিত হল। ১৯৫১ সালে জে. বি কৃপালিনীর নেতৃত্বে এল কিষাণ মজদুর প্রজা পার্টি (KMPP)। এই দলগুলি কংগ্রেসকে দোষারোপ করল নানা কারণে—যেমন, এই কংগ্রেস দল গরিবদের স্বার্থ বা পুরোনো গান্ধীবাদী ধারণা রক্ষা করতে ব্যর্থ বা গান্ধীবাদী মত থেকে সরে এসেছে।

কংগ্রেস দল অন্য চ্যালেঞ্জেরও সম্মুখীন হল। যেমন এই দলকে জনসংঘের উত্থানও সহ্য করতে হয়েছিল। জনসংঘ তখন হিন্দু ভোটব্যাংককে আত্মস্থ করে ধর্মীয় কাঠামোকে সুদৃঢ় করেছিল। হিন্দু মহাসভা ও রামরাজ্য পরিষদও গঠিত হল, যারা জনসংঘের থেকেও গোঁড়া ছিল। কমিউনিস্ট পার্টি অব্ ইন্ডিয়া (CPI) এল এবং তৎসহ বামদলের নানা সংগঠন।

❑ কংগ্রেস এবং আঞ্চলিক দল :

কংগ্রেস দল 'অনগ্রসর জাতি' ইস্যু বা হিন্দু জাতীয়তাবাদের চেয়ে আঞ্চলিক দলগুলির হাতে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে যারা অনেক রাজ্যে জায়গা পেয়েছে। এখানে 'আঞ্চলিক দল' শব্দটি স্পষ্টভাবে এবং প্রকৃতপক্ষে উভয়ই অন্তর্ভুক্ত আঞ্চলিক দলগুলো। যতক্ষণ না পরবর্তী দলগুলি-যারা চরিত্রে জাতীয় বলে দাবি করে—অনেক রাজ্যে শক্তিশালী সমর্থন আকর্ষণ করতে পারে, ততক্ষণ তাদের 'আঞ্চলিক' হিসাবে বিবেচনা করা উপযুক্ত।

আমরা যদি তাৎপর্যপূর্ণ আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলগুলি বিবেচনা করি, তবে ষোলটির মধ্যে মাত্র ছয়টি 'অনগ্রসর জাতি' ইস্যুতে জোর দিয়েছে, এবং শুধুমাত্র একটি (মহারাষ্ট্রে শিবসেনা) হিন্দু শাসনতন্ত্র অনুসরণ করেছে। বেশিরভাগই তা অনুসরণ করেনি।" নীচে তারকাচিহ্ন দিয়ে চিহ্নিত দলগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যারা কংগ্রেসের সাথে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক গড়ে তুলেছে।

সারণি নং ৩.১
'অনগ্রসর জাতি'র স্বার্থ রক্ষা

অনগ্রসর জাতি ইস্যুতে যে আঞ্চলিক দলগুলি আগ্রহ দেখিয়েছিল	যে আঞ্চলিক দলগুলি 'অনগ্রসর জাতি' ইস্যুতে আগ্রহ দেখায়নি
• রাষ্ট্রীয় জনতা (বিহার) • দ্রাবিড়া মুন্নেত্রা কাজাগাম (তামিলনাড়ু)* • এআইএডিএমকে (তামিলনাড়ু) • সমাজবাদী পার্টি (উত্তরপ্রদেশ) • জনতা দল (এস) (বিহার, তবে কর্ণাটক নয়) • জনতা দল (ইউ) [বিহার, তবে কর্ণাটক নয়]	• শিবসেনা (মহারাষ্ট্র) • বিজু জনতা দল (ওড়িষ্যা) • তেলেগু দেশম পার্টি (অন্ধ্রপ্রদেশ)* • সিপিআই-এম (কেরালা) • সিপিআই-এম (পশ্চিমবঙ্গ) • তৃণমূল কংগ্রেস (পশ্চিমবঙ্গ) • অসম গণ পরিষদ (আসাম) • লোক জনশক্তি পার্টি (বিহার)* • বহুজন সমাজবাদীপার্টি (উত্তরপ্রদেশ) • আকালি দল (পাঞ্জাব) • ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল লোকদল (হরিয়ানা) • ন্যাশনাল কনফারেন্স (জম্মু ও কাশ্মীর) • জে অ্যান্ড কে পিপলস্ ডেমোক্রাটিক পার্টি (জম্মু এবং কাশ্মীর)

উপরের তালিকাভুক্ত বেশিরভাগ আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল কংগ্রেসকে সর্বভারতীয় দল হিসেবে দুর্বল করেছিল, অবশ্য কংগ্রেস বেশিরভাগ জায়গা ফিরে পেতে সংগ্রাম করেছিল। যখন কংগ্রেস একটি স্বতন্ত্র রাজ্যে একটি শক্তিশালী আঞ্চলিক দলের মুখোমুখি হয়, তখন এটি প্রায়শই তার প্রধান প্রতিপক্ষের মতো হতে শুরু করে। এই সাধারণীকরণের কিছু ব্যতিক্রম আছে। সবচেয়ে প্রাণবন্ত হল পশ্চিমবঙ্গে, যেখানে ভারতের সর্বোচ্চ সুসংগঠিত কমিউনিস্ট পার্টি-মার্কসবাদী (সিপিআই-এম)-এর মুখোমুখি হয়েছিল এই কংগ্রেস দল।

অন্ধ্রপ্রদেশ—যেখানে ১৯৮৩ সাল থেকে কংগ্রেসের প্রধান প্রতিপক্ষ হল তেলেগু দেশম পার্টি, যা সর্বদা একটি একক ব্যক্তিত্ব দ্বারা পরিচালিত। আসলে, 'কংগ্রেস' বিভিন্ন রাজ্যে খুব ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করেছিল। এটি ১৯৮০ সাল থেকে সত্য। অবশেষে, এটা লক্ষণীয় যে কংগ্রেস আঞ্চলিক দলগুলির কাছে রাজ্য স্তরে যথেষ্ট জায়গা হারায় এবং শেষ পর্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ে।

পরিশেষে বলা যায় ভারতের মতো দেশে সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিভিন্নতার কারণে বিভিন্ন আঞ্চলিক সমস্যাগুলিকে কেন্দ্র করে বা আঞ্চলিক আবেগ-অনুভূতিকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন আঞ্চলিক স্তরে রাজনৈতিক দলের উদ্ভব ঘটে থাকে। এবং এই আঞ্চলিক দলগুলো অনেকক্ষেত্রেই ক্ষমতার ভারসাম্য বজায় রাখার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে, যখন তথাকথিত কোনো জাতীয় রাজনৈতিক দল নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ লাভ করতে সমর্থ হয় না। আর

এমতাবস্থায় জাতীয় দলগুলো রাজনীতির সমীকরণ বদলাতে বিভিন্ন আঞ্চলিক দলগুলোর সাথে জোট গঠন করে থাকে। আঞ্চলিক দলগুলোর অস্তিত্বকে তারা কোনোভাবেই অস্বীকার করতে পারে না। বিশেষ করে আঞ্চলিক স্তরের সামাজিক-রাজনৈতিক সমস্যাগুলির কেন্দ্রীয় ও রাজ্য উভয়স্তরেই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। আর জোট গঠনের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক দলগুলোর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। অনেক ক্ষেত্রেই জোটের শরিক দলগুলো রাজনৈতিক দিক থেকে ভীতি প্রদর্শন-এর পথ বেছে নেয় অতিরিক্ত ক্ষমতা লাভের জন্য। সেক্ষেত্রে সরকারের স্থায়িত্ব সংকটের মুখে পড়ে এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এই ধরনের প্রবণতা গণতান্ত্রিক ভাবমূর্তিকে নষ্ট করে দেয়।

তবে সাম্প্রতিককালে ২০১৪ সালের ষোড়শ ও ২০১৯ সালে সপ্তদশ সাধারণ নির্বাচনে BJP-এর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে NDA সরকার ভারতের কেন্দ্রে শাসন ক্ষমতায় আসার পরে জোটবদ্ধ রাজনীতি অনেকটাই বেসামাল হয়ে পড়েছে।

সাহসী পদক্ষেপ

বর্তমানে নির্বাচন কমিশন দলীয় কার্যকলাপের ওপর ভিত্তি করে বাস্তবে অস্তিত্বহীন ৮৬টি রাজনৈতিক দলের রেজিস্ট্রেশন বাতিল ও ২৫৩টি দলকে নিষ্ক্রিয় বলে অভিহিত করেছে। আর্থিক বেনিয়ম, কর ফাঁকি এবং কিছু ক্ষেত্রে বড় রাজনৈতিক দলের সৃষ্টি করা বিভিন্ন স্বীকৃত বা অস্বীকৃত এই ছোট দলগুলো ভোটারদের বিব্রত করার মাধ্যমে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার ওপর যে আঘাত হানে, সেটা আটকাতে এই পদক্ষেপ নির্বাচন কমিশনের প্রাথমিক ভাবে যথার্থ বলে মনে হয়।

3.4 বেসরকারি উদ্যোগের উত্থান

স্বাধীনতা লাভের ৯ মাসের মধ্যে '১৯৪৮-এর শিল্পনীতি'র ঘোষণা প্রকাশ করা হয়। ১৯৪৮ এর শিল্পনীতির মূল ভিত্তি ছিল মিশ্র অর্থনীতি এবং উদ্দেশ্য ছিল সবরকম শিল্পকে শ্রেণিবিভক্ত করা যাতে কোথায় সরকারি উদ্যোগ এবং কোথায় বেসরকারি উদ্যোগের ব্যবস্থা হবে তা নির্দিষ্ট করা। সমস্ত শিল্পকে চারভাগে ভাগ করা হয়েছিল। প্রথম শ্রেণিতে ছিল জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ তিনটি শিল্প—অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণ, পরমাণু শক্তি উৎপাদন এবং রেল পরিবহণ। এই তিনটি শিল্পে সরকারি একচেটিয়া, থাকবে। দ্বিতীয় শ্রেনিতে ছিল কয়লা, লৌহ-ইস্পাত, বিমান নির্মাণ, টেলিফোন, টেলিগ্রাফ, বেতার এবং খনিজ তৈল। এই শিল্পগুলির ক্ষেত্রে নতুন শিল্পস্থাপনের অধিকার থাকবে কেবলমাত্র সরকারের। তৃতীয় শ্রেণিতে তালিকাভুক্ত হল সেইসব শিল্প, যাদের বেলাতে বেসরকারি উদ্যোগে নতুন প্রতিষ্ঠানও স্থাপিত হতে পারবে। এই তালিকাতে ছিল লবণ, মোটর-যান, ট্রাক্টর, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, সিমেন্ট, চিনি, কাগজ ও নিউজ-প্রিন্ট ইত্যাদি। চতুর্থ শ্রেণিতে পড়ল বাকি সব শিল্প যেগুলির ক্ষেত্রে বেসরকারি উদ্যোগকে সাধারণভাবে কোনো বাধা দেওয়া হবে না। কিন্তু প্রয়োজন হলে সরকারি নিয়ন্ত্রণেও বাধা থাকবে না।

এই ঘোষণাতে সরকারি উদ্যোগের ক্ষেত্র নির্দিষ্ট হল এবং বেসরকারি উদ্যোগের জন্যও ব্যাপক ক্ষেত্র রাখা হল।

নতুন শিল্পনীতি কার্যকর করার জন্য ১৯৫১ সালে 'শিল্প (উন্নতি ও নিয়ন্ত্রণ) আইন' পাশ করা হয়। ১৯৪৮-এর ঘোষণা এবং ১৯৫১ সালের আইন সরকারি শিল্প নীতির তথা ভারতের মিশ্র অর্থনীতির মূল ভিত্তি।

১৯৭০ সালে আবার একটি শিল্পনীতি ঘোষিত হয়। দত্ত কমিটি যা শিল্প লাইসেন্সের ফলাফল বিচার করে তখন

দেখান যে কয়েকটি খুব বড় পারিবারিক শিল্পগোষ্ঠী প্রাধান্য স্থাপন করেছে। অনেক ক্ষেত্রে অধিকাংশ লাইসেন্স এঁরাই পান এবং কখনো কখনো প্রাপ্ত লাইসেন্স চেপে রেখে অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানকে উদ্যোগী হতে দেন না। আমদানি বিকল্প' নীতি কার্যকর হওয়ায় ধনীলোকের জন্য ব্যবহৃত ভোগ্যপণ্যের প্রসার হয়েছে, এটাও কমিটি দেখান।

১৯৭০ সালেই পাশ করা হয় মনোপলি অ্যান্ড রেসট্রিকটিভ ট্রেড প্র্যাকটিসেস এ্যাক্ট (সংক্ষেপে 'MRTP'), যার উদ্দেশ্য ছিল একচেটিয়া ব্যবসায় এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতার সংকোচনকে শাসনে আনা। ১৯৭৩ সালে এল ফরেন এক্সচেঞ্জ রেগুলেশন অ্যাক্ট [সংক্ষেপে 'ফেরা' (FERA)], যার উদ্দেশ্য ছিল বিদেশি মালিকানার গুরুত্ব কমানো। 'MRTP' আইনে একচেটিয়া বা প্রভাবশালী শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রসার ও কর্মনীতির নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু এর জন্য যে স্থায়ী কমিশন নিযুক্ত হয়েছিল তার সঙ্গে তৎকালীন সরকার সব সময়ে সহযোগিতা করেনি। এই সব সুযোগের সদ্ব্যবহার করে বেসরকারি শিল্পপতিরা ফুলে ফেঁপে উঠেছিল। টাটা, বিড়লা, রিলায়েন্স টেক্সটাইলের মতো শিল্পপরিবারের চমকপ্রদ সম্প্রসারণ হয়েছিল', যা পরিকল্পনার লক্ষ্যের সঙ্গে আদৌ সংগতিপূর্ণ ছিল না। কার্যত ভারতের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারণে কার্যত এইসব ব্যবসায়গোষ্ঠীর প্রভাব-প্রতিপত্তি উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছিল।

3.5 তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা এবং এর ব্যর্থতা

ভারতীয় অর্থনীতি যে কতখানি কৃষিনির্ভর তা দ্বিতীয় পরিকল্পনার ফলাফলেই যথেষ্ট প্রমাণ দেয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় কৃষিক্ষেত্রের অসাফল্য ভারতীয় অর্থনীতির উন্নয়নের প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। রাজনৈতিক ভাবধারায় পুষ্ট অর্থনীতি প্রণেতারা একবারও হৃদয়ঙ্গম করেনি যে ভারতীয় অর্থনীতি যথার্থই কৃষিনির্ভর। এবং জনসাধারণ শুধু যন্ত্র ভক্ষণ করে না। ফলে, তৃতীয় পরিকল্পনায় (১৯৬১-৬২—১৯৬৫-৬৬) তারা কৃষির ওপর গুরুত্ব আরোপ করল।

তৃতীয় পরিকল্পনায় পাঁচটি উদ্দেশ্য ঘোষণা করা হয়—(ক) বাৎসরিক ৫% -এর বেশি হারে জাতীয় আয় বৃদ্ধি করা এবং এই উন্নয়ন হারের সঙ্গে সংগতি রেখে পরবর্তী পরিকল্পনাগুলিতে বিনিয়োগ করা; (খ) খাদ্যশস্যে স্বয়ম্ভরতা অর্জন করা এবং শিল্প ও রপ্তানির প্রয়োজন মেটানোর উদ্দেশ্যে কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধি করা; (গ) আগামী ১০ বছরের জন্য দেশের নিজস্ব সম্পদ দ্বারাই শিল্পোন্নয়নের ব্যবস্থা করা, (ঘ) দেশের মানর সম্পদের পূর্ণতম ব্যবহার ও কর্মসংস্থানের সুযোগসুবিধার ব্যাপকতম সম্প্রসারণ করা এবং (ঙ) সুযোগসুবিধার ক্ষেত্রে ব্যাপকতর সাম্য প্রতিষ্ঠা করা, আয় ও সম্পদ বণ্টনে বৈষম্য দূরকরা ও অর্থনৈতিক ক্ষমতার সুষম বণ্টনের ব্যবস্থা করা।

এই সময়ে উন্নয়ন নিয়ে রস্টো প্রমুখ অর্থনীতিবিদগণ বলছিলেন যে বিনিয়োগ প্রকল্প এবং উন্নতির হার এমন হওয়া উচিত যে বৃদ্ধির হার 'স্বয়ং-সঞ্চালিত' (self-sustained growth) হবে, এক পরিকল্পনার সাফল্য থেকে পরের পরিকল্পনার সাফল্যের পথ তৈরি হবে। ভারতের পরিকল্পনাকারগণ এই প্রস্তাবে উৎসাহিত হয়েছিলেন। কিন্তু নিশ্চয়ই কোনো রাজনৈতিক কারণে ভূমিকায় এ-ধরনের কথা বলার পরেও যে সব প্রকল্প-সমষ্টি তৃতীয় পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল তার মধ্যে দ্বিতীয় পরিকল্পানার চেয়ে বেশি কিছু ছিল না—অবশ্য উৎপাদনের পরিমাণগত বৃদ্ধির জন্য প্রচেষ্টা ছাড়া। পরিকল্পনা কমিশনের মতে পাঁচ বছরে জাতীয় আয় প্রায় ৩০ শতাংশের মতো বাড়াতে হলে তৃতীয় পরিকল্পনাকালে মোট বিনিয়োগের প্রয়োজন হবে ১০,৫০০ কোটি টাকা, যার মধ্যে সরকারি বিনিয়োগ হবে ৭,৫০০ কোটি টাকা এবং বেসরকারি বিনিয়োগ ৩,০০০ কোটি টাকা। পাঁচ বছরে প্রধান উৎপাদন ক্ষেত্রে বৃদ্ধির হার কীরকম আশা করা হয়েছিল তার চিত্র ৩.২ সংখ্যক সারণিতে দেওয়া হল।

সারণি ৩.২ : তৃতীয় পরিকল্পনার উৎপাদন-লক্ষ্য

	বাস্তব উৎপাদন ১৯৬০-৬১	প্রস্তাবিত উৎপাদন ১৯৬৫-৬৬
খাদ্যশস্য (মিলিয়ন টন)	৭৬.০	১০০.০
বিদ্যুৎ (লক্ষ কিলোওয়াট)	৫৭.০	১২৭.০
কয়লা (লক্ষ টন)	৫৪৬	৯৭০
ইস্পাত (লক্ষ টন)	৩৫.৬	৯২.০
অ্যালুমিনিয়াম (হাজার টন)	১৮.৫০	৮০.০
সিমেন্ট (লক্ষ টন)	৮৫.০	১৩০.০
মিলের কাপড় (মিলিটন গজ)	৫,১২৭	৫,৮০০

উৎস : তৃতীয় পরিকল্পনা

❑ আর্থিক সংস্থান

এই সব লক্ষ্যে এবং জাতীয় আয়ের ৩০ শতাংশ বৃদ্ধিতে পৌঁছনোর জন্য সরকারি খাতে যে ৭,৫০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ ধরা হয়েছিল তার মধ্যে ৬,৩০০ কোটি টাকা ছিল মূলধনী সম্পদ নির্মাণে এবং ১,২০০ কোটি টাকা নতুন চলতি ব্যয়ে—শিক্ষা ইত্যাদি খাতে। বেসরকারি বিনিয়োগ ধরে নিলে মোট বিনিয়োগ হবার কথা ১০,৫০০ কোটি টাকা। এবারেই প্রথম অন্যান্য সরকারি প্রতিষ্ঠানের লাভের ৪৫০ কোটি টাকা আলাদা করে দেখানো হয়েছিল। তৃতীয় পরিকল্পনাতে বিশদভাবে আগামী পাঁচ বছরের আন্তর্জাতিক লেনদেনের একটা হিসাব তৈরি করার চেষ্টাও করা হয়েছিল। রপ্তানি বাড়ানোর পরিকল্পনা ছিল। আমদানির পরিমাণও ধরা হয়েছিল ৫,৭৫০ কোটি টাকা।

❑ তৃতীয় পরিকল্পনার ব্যর্থতা

এই তৃতীয় পরিকল্পনাকালেই কমিশনের নজর পড়ল মূল্যবৃদ্ধির দিকে। তবে তৃতীয় পরিকল্পনা কালে আরো মূল্যবৃদ্ধির রোধ করার প্রচেষ্টা যে প্রয়োজন হবে সেটা কমিশন জোর দিয়ে বলেছিলেন। আশা করা হয়েছিল যে খাদ্যশস্য ও অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের উৎপাদন ও সরবরাহ বাড়াতে পারলে মূল্যবৃদ্ধির ভয় অনেটা কমবে। মূল্য নিয়ন্ত্রণ নিয়েও কমিশন আলোচনা করেছিল। তবে বাস্তব ঘটনা হল খাদ্যশস্য ও প্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্যের দামবৃদ্ধি এই পরিকল্পনার একটি নেতিবাচক দিক। ১৯৫৫ সালে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বাড়াতে তদানীন্তন 'রেশনিং ব্যবস্থা' (Rationing system) তুলে দেওয়া হয়েছিল। আবার এই ব্যবস্থায় ফিরে যাওয়ার প্রয়োজন হয়ে পড়ল—এবং তার সঙ্গে সরকারি ক্রয় ও মজুতভাণ্ডার গঠন, বিশেষত খাদ্যশস্যের।

কর্মসংস্থানের সুযোগ সম্প্রসারণের ক্ষেত্রেও এই তৃতীয় পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়েছিল। তৃতীয় পরিকল্পনা শেষে ১২০ লক্ষ লোক কর্মহীন থেকে যাবে, এটা পরিকল্পনাকারীরা জানত, তা সত্ত্বেও যতটা জোর পড়া উচিত ছিল কর্মবৃদ্ধির জন্য ততটা কমিশন দেয়নি। আঞ্চলিক অসাম্য কমানোর কথাও বলা হয়েছিল কিন্তু আঞ্চলিক বৈষম্য কমানো যায়নি। ব্যক্তিগত অসাম্য নিয়ে যথারীতি আলোচনা হয়েছিল কিন্তু সরাসরি কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়নি। কয়েকটি

রাজ্যে—যেমন পশ্চিমবঙ্গে—জমিদারি প্রথা বিলুপ্ত করা হয়েছিল দ্বিতীয় পরিকল্পনার সময়ে। কিন্তু আয় বণ্টনে তার কোনো প্রভাব তখনও দেখা যায়নি। বরং ভূমিহীন কৃষকদের সংখ্যা দিন দিন বাড়তে আরম্ভ করেছে এটাই দেখা গেল।

এককথায়, তৃতীয় পরিকল্পনা প্রায় সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ। এর কারণ হল—১৯৬২ তে চিনাবাহিনী ভারতের উত্তর ও উত্তর-পূর্ব সীমান্ত আক্রমণ করে; ১৯৬৫-তে সামরিক সংঘর্ষ হয় ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে। এর ফলে সরকারি প্রতিরক্ষা-ব্যয় অনেক বাড়াতে হয় এবং পরিকল্পনার জন্য বিনিয়োগ কমাতে হয়। বৈদেশিক সাহায্যও আশানুরূপ আসেনি।

১৯৬৪-৬৫-তে খাদ্যশস্য উৎপাদন খুব ভালো হয়েছিল। কিন্তু তার পরের দুই বছর উৎপাদন অনেক নেমে যায়। এতে জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি ব্যাহত হয় এবং তদুপরি বিদেশ থেকে খাদ্য আমদানির প্রয়োজনও দেখা দেয়। শিল্পের জন্য কৃষিজাত কাঁচামালও বিদেশ থেকে আনতে হয়। তৃতীয় পরিকল্পনাকালে ভারতের আমদানি করতে হয়েছিল ২.৫ কোটি টন খাদ্যশস্য, ৩৯ লক্ষ গাঁট তুলা এবং ১৫ লক্ষ গাঁট পাট। খাদ্যশস্যের বিপুল আমদানির পরেও দেশে মাথাপিছু প্রাপ্তব্য খাদ্যের পরিমাণ কমে গিয়েছিল। পুরো পাঁচ বছরে শিল্প-উন্নয়নের বৃদ্ধির হার ধরা হয়েছিল বছরে ১১ শতাংশ। কিন্তু সেটা গিয়ে দাঁড়াল গড়পড়তা ৮.২ শতাংশ। বহু শিল্পে উৎপাদন ক্ষমতা অব্যবহৃত থেকে গেল।

প্রধানত খাদ্য সরবরাহের স্বল্পতার জন্য মূল্যবৃদ্ধির হার-ও বাড়ল। ১৯৬০-৬১ সালের তুলনায় পাইকারি মূল্যসূচি ১৯৬৫-৬৬ সালে বেড়েছিল ৩২ শতাংশ। আন্তর্জাতিক লেনদেন বা লেনদেন ব্যালেন্সেও চাপ পড়ল। খাদ্যশস্যের ও অন্যান্য দ্রব্যের দাম বৃদ্ধিতে বাণিজ্য খাতে ঘাটতি (balance of trade deficit) হল বিরাট এবং সেটা বিদেশি সাহায্য দিয়ে পূরণ করা গেল না। পরে তৃতীয় পরিকল্পনার পাঁচ বছর শেষ হবার তিন মাসের মধ্যে ১৯৬৬ সালের জুন মাসে রিজার্ভ ব্যাংকের গভর্নর পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য টাকার বহির্মূল্য কমাতে বাধ্য হলেন আন্তর্জাতিক সংস্থার চাপে। বলা হল, যে বাইরের মুদ্রার তুলনায় টাকার দাম কমলে, বিদেশে ভারতীয় জিনিস সে দেশের টাকায় সস্তা হবে এবং তাতে রপ্তানি বাড়বে এবং আমদানির জন্য চাহিদা কমবে। কিন্তু শেষপর্যন্ত এতে কাজের কাজ কিছু হল না। রপ্তানির বাজার অনেক জটিল কার্যকারণের ক্ষেত্র এবং ভারতের আমদানিও কমল না। উৎপাদন, বহির্বাণিজ্য, দ্রব্যমূল্য ইত্যাদি সমস্যার জটিলতা এত বেশি বেড়ে গেল যে অসাম্য কমানোর দিকে নজর দেওয়া সম্ভব হল না। বলা বাহুল্য, তৃতীয় পরিকল্পনা থেকেই শুরু হল উন্নয়ননীতি রূপায়নে শ্লথগতি।

3.6 পরিকল্পনার সামাজিক লক্ষ্য থেকে পশ্চাদপসরণ

জওহরলাল নেহরু যে সামাজিক ভাবনায় দেশকে ও গণতন্ত্রকে দেখেছিলেন তা ছিল সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের। তিনি শোষণ ও বঞ্চনার নিরসন চেয়েছেন, ভূস্বামী ও জমিদারতন্ত্রের অবসান চেয়েছেন, আবার ব্যক্তি স্বাধীনতা ও সম্পত্তির অধিকারকেও তিনি রক্ষা করতে চেয়েছেন—ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে শিল্পের পরিকাঠামো নির্মিত হবে। প্রযুক্তি ও অন্যান্য উপকরণ সংগৃহীত বা উৎপাদিত হবে, যার সুফল বেসরকারি শিল্পের মালিকেরাও ভোগ করবে। দারিদ্র্য দূরীকরণ, ভূমিসংস্কার ও রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ এই তিন ফলায় উন্নয়নের স্বপ্ন তিনি যা দেখছেন, প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনায় তাই তিনি রূপদান করেছেন। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, আবাসন, সেচ, বিদ্যুৎ ও পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়নের মধ্য দিয়ে তাঁর সামাজিক গণতন্ত্রের ভাবনা পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে।

ভারতের দ্বিতীয় গভর্নর জেনারেল ভারতরত্ন রাজা গোপালাচারী, মিনু মাসানি, অর্থনীতিবিদ বি. আর. শেনয় প্রমুখ

বৃহত্তর স্বাধীনতার পক্ষে সওয়াল করে নেহরুর দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকীয় বিরোধিতা করেন। বি. আর. শেনয়-এর 'Note of Dissent on the Second Five Year Plan' কে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা হ্রাস ও পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রতি একটা চ্যালেঞ্জ-এ হিসাবে বিবেচনা করা যায়। যাই হোক তাঁরা ভারতকে সমাজতন্ত্রের প্রতি আসক্তি বা প্রভাব থেকে মুক্ত করতে অসমর্থ ছিলেন। স্বাধীনোত্তর ভারতে নেহরুর সমাজবাদী ধারণা ছিল অপ্রতিদ্বন্দ্বী। এজন্য অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও পরিকল্পনার সামাজিক লক্ষ্য গোপালচারীর কাছে অস্পষ্ট থাকার জন্য তিনি উদারবাণিজ্যের নীতি সমর্থন করেন। এরই ভিত্তিতে ১৯৫৭ সালে 'স্বতন্ত্র পার্টি' গঠন করে জাতীয় কংগ্রেস দল ভাগ করেন। ফলে নেহরুর সমাজতান্ত্রিক নীতি তীব্র আক্রমণের সম্মুখীন হল। এবং রাজা গোপালাচারীর বিরোধিতার ফলে সমাজতান্ত্রিক নীতি তীব্র আক্রমণের সম্মুখীন হল। এবং রাজা গোপালাচারীর বিরোধিতার ফলে সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে ভারত গঠন বা সমাজবাদের প্রসার কিছুটা সীমিত হয়ে পড়ে। চতুর্থ লোকসভা নির্বাচনে তাঁর দল ৪৪টি আসনে জয়লাভ করে। যাইহোক, ১৯৭৩ সালে এই পার্টির অস্তিত্ব প্রায় বিলুপ্ত হয়।

রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ইতিহাস এখন এই সাক্ষ্যই বহন করে যে, পঞ্চবর্ষী পরিকল্পনার অধীনে জাতীয় কংগ্রেসের দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং অসাম্য দূরীকরণের অঙ্গীকার বাস্তবায়ন না হওয়ার সুযোগ নিয়ে সমস্ত চতুর বিরোধী দল, আঞ্চলিক দল এককাট্টা হয়ে গণতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সংস্কারকে তীব্র আক্রমণ করে।

এর ফলে ১৯৬০-এর দশকের শুরুতেই, অসাম্য দূরীকরণের সামাজিক লক্ষ্য এবং দ্রুত শিল্পায়নের সুদৃঢ় বাহু জোর ধাক্কার সম্মুখীন হল। এমনকি রাজনৈতিক ঐকমত্যও এই অর্থনৈতিক ব্যর্থতা এবং সেই সময়ের দৃশ্যমান ক্রমবর্ধমান দুর্নীতির জন্য যথেষ্ট বাধাপ্রাপ্ত হয়। নেহরু বাধ্য হয়ে তৃতীয় সাধারণ নির্বাচনের ইস্তাহারে দলের লক্ষ্য ঘোষণা করলেন যাতে গান্ধীবাদী "কো-অপারেটিভ কমনওয়েলথ" এর সাথে মার্কসীয় পন্থার "একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের" মেলবন্ধন প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন তিনি সড়ক, রেল ও বায়ুপথে ২০ মিলিয়ন ভারতীয় নাগরিকদের কাছে পৌঁছলেন ১৪,০০০ মাইল অতিক্রম করে। তাছাড়া, এই প্রথম তাঁর গোটা দলের জন্য নির্বাচন প্রচার অভিযানে বের হন এবং তাঁর কতিপয় নির্বাচিত প্রার্থীর কাছে যান। এসত্ত্বেও, নির্বাচনী ফলাফল আশানুরূপ হল না। মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ও গুজরাট ও মহীশূরের সম্ভাব্য দুই মুখ্যমন্ত্রীসহ ৩৯ জন কংগ্রেসের মন্ত্রী তাদের নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বীদের কাছে পরাজিত হলেন।

3.7 পরিকল্পনার ছুটির সময়সীমায় (১৯৬৬-৬৯) কৃষিনীতি পুনর্গঠনের প্রচেষ্টা

১৯৬৫-৬৬-তে অর্থনৈতিক দুর্যোগ এতই নৈরাজ্যজনক হল যে সরকার এবং পরিকল্পনা কমিশন চতুর্থ পরিকল্পনার জন্য কোনো স্থির সিদ্ধান্ত নিতে পারল না। ঠিক করা হল যে তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে চতুর্থ পরিকল্পনা রচনা করা হবে। লাল বাহাদুর শাস্ত্রীও তখন জাতীয় নিরাপত্তার জন্য পরিকল্পনাকে আর সর্বোচ্চ রক্ষাকবচ হিসেবে ধরলেন না। বরং, তিনি সঙ্গে সঙ্গেই পরিকল্পনা কমিশনকে আদেশ দিলেন যে, দেশের যা কিছু সম্পদ তাকে কাজে লাগিয়ে উন্নতি ঘটাতে হবে। কেননা দেশের সুরক্ষা ও (কৃষির) উন্নয়ন দ্রুত ত্বরান্বিত করতে হবে। অধিকন্তু তিনি একই সঙ্গে কমিশনকে আদেশ দিলেন যে ১৯৬৬-৬৭ সালের জন্য বার্ষিক পরিকল্পনা করতে হবে। এবং তৎসহ জোর দিলেন খুব দ্রুত যেন কৃষির উন্নয়ন হয় এবং শিল্পের যেন যথাযথ সদ্ব্যবহার হয়।

বছর বছর পরিকল্পনা তৈরি করার অর্থ হল বাজেট তৈরির কাজটাকে আরও একটু ব্যাপকতর করা। পরিকল্পনার প্রধান যে কাজ—একটি দীর্ঘকালীন পরিপ্রেক্ষিত রচনা করা সেটাই বন্ধ হয়ে গেল। ফলে কোনো বড় নতুন প্রকল্পে হাত দেওয়া সম্ভব হল না। আগেকার যেসব প্রকল্প অসম্পূর্ণ ছিল সেগুলিকে সম্পূর্ণ করাই হল তখনকার মতো প্রধান কাজ।

এই অবকাশ (Plan Holiday) বা বার্ষিক পরিকল্পনা পর পর তিন বছর চলেছিল—১৯৬৬-৬৭, ১৯৬৭-৬৮ এবং ১৯৬৮-৬৯।

১৯৬৬-৬৭ সালে আবার অনাবৃষ্টির ফলে, কৃষি উৎপাদন অভূতপূর্বভাবে ব্যাহত হল। কৃষি উৎপাদন ১৯৬৪-৬৫ এবং ১৯৬৫-৬৬-তে কমল ১৭ শতাংশ। এক বছরের মধ্যেই খাদ্যশস্যের পাইকারি দাম বেড়ে হল ১৪ শতাংশ। যে সমস্ত রাজ্য খাদ্যশস্যে উদ্বৃত্ত ছিল, তাদেরকে কেন্দ্রীয় সরকারও বাধ্য করতে পারল না, যে তারা খাদ্যশস্য খাদ্যসংকটে পড়া রাজ্যে পাঠাক। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা অবশেষে বাধ্য হলেন শহরে রেশনিং ব্যবস্থা চালু করতে, যেখানে জনসংখ্যা ১০,০০০-এরও বেশি। ১৯৬৫ সালে নভেম্বরে সুব্রহমানিয়াম কংগ্রেস পার্লামেন্টারি পার্টিতে বললেন যে সরকারি সমস্ত আপদ্‌কালীন মজুত (buffer stock) সব আর অবশিষ্ট নেই। একমাত্র বিকল্প ব্যবস্থা প্রচুর পরিমাণ খাদ্যশস্যের আমদানি করা। এই সময়, আমেরিকা ভারত ও পাকিস্তানের ওপর বিরক্ত হয়ে, তাও বন্ধ করে দিল। PL-480-এর আওতায় আমেরিকা কোনো নতুন দীর্ঘমেয়াদী চুক্তিতেও স্বাক্ষর করল না। উপরন্তু আমেরিকার জনসন প্রশাসন ভারতের ওপর নানারকম বিধিনিষেধ আরোপ করল।

ভারত তখন কী ধরনের নীতি নেবে, তার ভারেই জর্জরিত ছিল। বিদেশি সাহায্যের আমেরিকান নীতি সুব্রহমনিয়মের বাহুই শক্ত করল। ১৯৬৫ সালের নভেম্বর মাসে ভারতের কৃষিমন্ত্রী আমেরিকা গেলেন এবং ফিরে এসে "নতুন কৃষি প্রকল্পের" কথা বললেন। ওই বছরেই ডিসেম্বর মাসে আমেরিকার সেক্রেটারি অব্ এগ্রিকালচার ফ্রিমানের সঙ্গে সুব্রহ্মমানিয়ামের কথাবার্তা, বিশেষ করে সারের ক্ষেত্রে, এক নতুন মোড় নিল।

ডিসেম্বরে গোড়ার দিকে সুব্রহমনিয়াম এবং শাস্ত্রীর মধ্যে যে কথাবার্তা হল—তাতে গুরুত্ব পেল উচ্চফলনশীল চাষ, উন্নত ইনপুটের ঘনীভবন এবং উৎপাদনকারীদের উৎসাহ দেওয়া—এবং সেটাই পূর্ণ ক্যাবিনেটে পেশ করা হল। অর্থমন্ত্রীর প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও ক্যাবিনেটের ভোটাভুটিতে এরই সপক্ষে সবাই অভিমত দিলেন। ঠিক প্রায় এই সময়েই, কেন্দ্রীয় সরকার এক নয়া ছাড়-নীতি প্রবর্তন করল যেখানে বিদেশি ব্যক্তিগত কোম্পানিগুলি সার শিল্পতে ভারতে বিনিয়োগ করতে পারবে। যে সমস্ত কোম্পানি ১৯৬৭ সালের ৩১ শে মার্চের মধ্যে চুক্তিতে সাক্ষর দান করবে, তাদের ইচ্ছেমত তারা নিজেদের দাম নির্ধারিত করতে পারবে এবং সাত বছরের জন্য এই স্বাধীনতা তারা ভোগ করতে পারবে।

ইন্দো-পাকিস্তান যুদ্ধের অবসানকল্পে সই দেওয়ার জন্য এবং পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আয়ুব খানের সঙ্গে সমঝোতা করার জন্য তাসখন্দে যাওয়ার আগে টি. টি. কৃষ্ণামাচারির জায়গায় পশ্চিমবঙ্গের সাংসদ শচীন্দ্র চৌধুরীকে অর্থমন্ত্রী হিসাবে বেছে নিলেন শাস্ত্রী। কিছুদিনের মধ্যেই আমেরিকা প্রথম চুক্তিতেই ভারতকে $৫০ মিলিয়ন ডলার ধার দিল প্রয়োজনীয় সার এবং সার তৈরির কাঁচামাল কেনার জন্য। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য শ্রীযুক্ত শচীন্দ্র চৌধুরী ছিলেন বিশ্বব্যাংকের খুব ঘনিষ্ঠ।

জানুয়ারি ১১, ১৯৬৬ সালে তাসখন্দ থেকে বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো শাস্ত্রীর মৃত্যুসংবাদ দিল্লিকে শোকগ্রস্ত করল। গুলজারিলাল নন্দা শাস্ত্রীর স্থলে ভারতের প্রধানমন্ত্রী হলেন।

যা হোক, ১৯৬৭-৬৮ তে কৃষির ফলন খুব ভাল হওয়াতে জাতীয় আয় বেড়ে গিয়েছিল তবে এই বৃদ্ধির হারটা পাওয়া যাচ্ছে পূর্বের বছরে নীচু ভিত্তি হিসাব করে। পরের বছর ১৯৬৮-৬৯ আবার এই বৃদ্ধির হার কমে গিয়ে হয় মাত্র ১.৮ শতাংশ। সবসুদ্ধ বার্ষিক পরিকল্পনার তিন বছরে জাতীয় আয়ের মোট বৃদ্ধি হয়েছিল, মাত্র ১২ শতাংশ,

গড়পড়তা বছরে প্রায় ৩.২৫ শতাংশ।

কৃষিজ উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্য নতুন কারিগরি কৌশল প্রবর্তনের (New Agricultural Strategy) প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। এর জন্য শাস্ত্রীকে ধন্যবাদ। ১৯৬০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়েই সরকার নতুন কৃষিজ উৎপাদন কৌশলের প্রবর্তন করে, যা 'সবুজ বিপ্লব' নামে পরিচিত হয়ে ওঠে। সবুজ বিপ্লবের মুখ্য উপাদান জলসেচের নিয়মিত ব্যবস্থা, রাসায়নিক সারের প্রয়োগ, কীটনাশক ওষুধের ব্যবহার, উন্নততর বীজের ব্যবহার ইত্যাদি। এসবের ফলে অতি অল্পসময়ের ব্যবধানে কৃষিজ উৎপাদনের নাটকীয় উন্নতি ঘটে। বার্ষিক পরিকল্পনার শেষ বছরে (১৯৬৮-৬৯) খাদ্যশস্য উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৯.৫৬ মেট্রিক টন। এবং এই উন্নতি ক্রমশ দীর্ঘস্থায়ী চরিত্রের হতে থকে। খাদ্যশস্যের ক্ষেত্রে প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করা গেছে, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

তবু কয়েকটি কথা এ সময়ের প্রেক্ষিতে বলতে হবে। তিনটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও পরিকল্পনার অবকাশ শেষ হবার পরেও এবং সেচ ও সার প্রকল্পে বিরাট বিনিয়োগ হওয়া সত্ত্বেও ভারতীয় কৃষি উৎপাদন বৃষ্টির ওপর নির্ভরশীল থেকে গেল। দ্বিতীয়ত, ভারতের মোট উৎপাদনের কাঠামোতে কৃষির গুরুত্ব বাড়ল না—যার ফলে দেখা গেল কৃষি উৎপাদন ব্যাহত হলেই মোট জাতীয় আয় কমে যাচ্ছে।

3.8 প্রভুত্বশালী শ্রেণিসমষ্টিতে অভ্যন্তরীণ সংঘাত

এখানে প্রভাবশালী বিত্তবান শ্রেণিগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সংঘাতের কথা আলোচিত হবে।

শিল্প বাণিজ্যে পুঁজিবাদী, ধনী চাষি এবং পেশাদারশ্রেণি, এদের সবাই মোটামুটি দেশের সবচেয়ে ধনী কুড়ি শতাংশের মধ্যে। এদের সঙ্গে দারিদ্র্য সীমার নীচে দেশের চল্লিশ শতাংশ জনসাধারণের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ফারাক অবশ্যই প্রকাণ্ড এবং গভীর। কিন্তু বিত্তবান শ্রেণিগুলির মধ্যেও প্রচুর বিভেদ-বৈষম্য এবং স্বার্থসংঘাত রয়েছে। বিত্তবান শ্রেণিগুলির ভেতরকার স্বার্থ-সংঘাতের গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব পড়ে দেশের অর্থনৈতিক বিকাশের এমনকি রাজনৈতিক ব্যবস্থারও গতিপ্রকৃতির ওপর। ভারতবর্ষের বিশাল আয়তন, সামাজিক বিচ্ছিন্নতা ও খণ্ডিত বিক্ষিপ্ত রাজনীতির পরিবেশে এই সংঘাত নানা বিচিত্র রূপ নেয়।

নাগরিক ব্যবসায়ী-শিল্পপতি ও পেশাদারশ্রেণির সঙ্গে গ্রাম ভারতবর্ষে প্রতিপত্তিশালী ধনী চাষীদের দ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে এসেছে। দেশের রাজনীতির এক বড় ফাটল হচ্ছে 'ভারত' বনাম 'ইন্ডিয়া'র মধ্যে, পল্লী আর নগরের মধ্যে; ভারতবর্ষের শিল্পবহুল নাগরিক ধনতান্ত্রিক কেন্দ্রের সঙ্গে পরিধিস্থ অল্পবিত্ত বহুলসংখ্যক কৃষককুলের 'অসম বিনিময়' (আনইকুয়াল এক্সচেঞ্জ) ও কৃষিপণ্যমূল্য আর কৃষি ও শিল্পের মধ্যে বিনিময়ের হার (বা টার্মস্ অফ ট্রেড) এখানে গুরুত্ব পেয়েছে। কৃষিপণ্য বিক্রয়ের অধিকাংশই ধনী চাষিদের নিয়ন্ত্রণে, তাও আবার প্রধানত অল্প কয়েকটি রাজ্যে। তাই কৃষি ও শিল্পের মধ্যে বিনিময়ের হার আসলে ব্যবসায়ী-শিল্পপতিদের বিক্রীত পণ্যের সঙ্গে কিছু ধনীচাষিদের বিক্রীত পণ্যের আপেক্ষিক মূল্য।

জানা দরকার ষাটের দশকে এবং তার পরেও কৃষি পরিবারগুলির সঞ্চয়ের একটা বড় অংশ কৃষির বাইরে চলে গেছে, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক ইত্যাদি সরকারি অর্থপ্রতিষ্ঠানের সম্প্রসারণে এর পথ সুগম হয়েছে। ব্যাঙ্কে জমা সঞ্চয়ের প্রতিদানে অবশ্যই সুদে আয় হয় এই কৃষি পরিবারগুলির, কিন্তু সরকার এই সঞ্চয়লব্ধ অর্থের ব্যয় ও বিনিয়োগ

অনেকাংশ করে কৃষির বাইরে। তবে মনে রাখা দরকার কর ব্যবস্থায় ভারসাম্যহীনতা যথেষ্ট প্রবল, শিল্প-বাণিজ্যের তুলনায় কৃষিতে বিত্ত এবং আয়ের উপর কর নামমাত্র।

আসল কথা ধনী কৃষকদের প্রতি অবিচার এবং শিল্প বাণিজ্যের প্রতি সরকারের পক্ষপাতিত্বের ধারণা শহর ও গ্রামের বিত্তবান শ্রেণির মধ্যে বিবাদের ইন্ধন জুগিয়েছে। কৃষ্টিতে, আচার-ব্যবহারে, জীবনযাত্রার ধাঁচে এই দুই শ্রেণির লোকের মধ্যে এমনিতেই অনেক ফারাক রয়েছে। জীবনযাত্রার ধাঁচে এই প্রভেদ অবশ্য ক্রমেই কমার কথা, কেননা সচ্ছল চাষি পরিবারের তরুণেরা শহরের কলেজে চাকরিতে যাচ্ছে, তাদের অর্জিত শহুরে হাবভাব এবং বিলাসসামগ্রীর অনুপ্রবেশ ঘটছে গ্রামের জীবনেও। একথা বলা দরকার যে ইদানীং দেশের বিভিন্ন অংশে কৃষকদের আন্দোলনের ঘটনার সংখ্যা, তীব্রতা এবং সাফল্য যে বেড়েছে তার অর্থ সব সময় এই নয় যে নাগরিক শ্রেণিগুলির সঙ্গে এদের স্বার্থসংঘাত গভীরতর হচ্ছে, কৃষকদের রাজনৈতিক ক্ষমতা বৃদ্ধিরই সূচক বলে এর ব্যাখ্যা করা যায়। রাজ্য সরকারগুলির নীতি নির্ধারণ ও নির্বাহে ধনী চাষিদের প্রভাব অনেকদিন ধরেই চলে আসছে, কিন্তু ইদানীং এদের সাংগঠনিক শক্তিও দৃঢ়তর হয়েছে এবং সমস্ত ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চেও এরা এখন বেশ জোরদার হয়ে উঠছে। এছাড়া নাগরিক বিত্তবান শ্রেণিগুলি অর্থশক্তির প্রতাপে ধনী কৃষকদের সংখ্যা গুরুত্বের সুবিধার মোকাবিলা সহজেই করতে পারে।

নাগরিক ও গ্রামীণ বিত্তবানদের স্বার্থসংঘাত নিয়ে আলোচনা করলাম, এবার (বিশেষ করে কাজকর্মে নিযুক্ত) পেশাদার শ্রেণির সঙ্গে অন্য বিত্তবান শ্রেণির দ্বন্দ্বের কথা বলব। শিল্পে বাণিজ্যে পুঁজিবাদীরা প্রায়শই লাইসেন্স ইত্যাদি অনুজ্ঞাপত্র বিতরণের ব্যাপারে আমলাদের যথেচ্ছভাবে ক্ষমতার বিরুদ্ধে এবং তাদের তুষ্ট না রাখতে পারলে নানা প্রকারের বাধা বিলম্ব এবং ক্ষয়ক্ষতির সম্পর্কে অভিযোগ করে থাকে। জনপ্রিয় সমাজবাদী শ্লোগানগুলি রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের প্রসারণ এবং এই পেশাদার আমলাতন্ত্রের ক্ষমতাবৃদ্ধির সহায়ক হয়। আমলাতন্ত্রের জটিল নিয়ন্ত্রণবিধি গোলকধাঁধায় বৃহৎ ও কৌশল তাঁদের আয়ত্তে।

শিল্পপতিদের তুলনায় ধনী চাষিদের আমলাতন্ত্রের সঙ্গে কারবার করতে হয় কম, তবুও পণ্যমূল্য নির্ধারণে, শস্য ক্রয়ে, শস্য চালানের বিধিনিষেধে, ঋণ ও রাসায়নিক সারের বণ্টনব্যবস্থায় এদের ভূমিকা অপরিসীম। স্থানীয় ধনী চাষিদের কাছে সরকারি আমলাতন্ত্রও হার মানে।

পরিশেষে বলা যায়, ভারতীয় রাজনীতিতে যতই দিন যাচ্ছে, ততই শ্রেণিসমষ্টির তুমুল দর-কষাকষি আর অংশীদারদের ভাগ-বাঁটোয়ারা নিয়ে বচসার দঙ্গল ততই প্রকাশ্যে সরব হচ্ছে। জনমানসে এই রাজনীতির ভাবমূর্তি তাই ক্রমশই কুশ্রী আকার নিচ্ছে। একথা আজ অনস্বীকার্য যে ভারতবর্ষের মতো বিশাল বিচ্ছিন্ন বহুখণ্ডে বিভক্ত সমাজে আর্থিক পরিচালনা করে সুরক্ষার ব্যবস্থা আর গণতান্ত্রিক রাজনীতির সর্বজনীন মুক্ত অর্গলহীনতা একই সঙ্গে বজায় রাখা অত্যন্ত দূরূহ। স্বাধীনতার পর প্রথম কিছু বছরে জনমানসে রাষ্ট্রনেতৃত্বের ভাবমূর্তি এই ছকের ভারসাম্য রক্ষা করতে সাহায্য করেছিল। কিন্তু ইদানীংকালে রাজনীতিতে কোলাহলমুখর বিত্তবান স্বার্থগোষ্ঠীর কামড়াকামড়িতে রাষ্ট্রায়ত্ত আর্থিক ব্যবস্থা প্রায়ই ক্ষতবিক্ষত হয়েছে এবং হচ্ছে।

3.9 সমতা, সামাজিক ন্যায়বিচার ও স্বনির্ভরতার ওপর অগ্রাধিকার

প্রথম পঞ্চবর্ষ পরিকল্পনা থেকে শুরু করে চতুর্থ পরিকল্পনা পর্যন্ত জাতীয় আয় ও মাথাপিছু আয়বৃদ্ধির লক্ষ্যটি ছিল অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। অবশ্য চতুর্থ পরিকল্পনায় অর্থনৈতিক বিকাশের সঙ্গে স্থায়িত্বের লক্ষ্যণটিকেও বিশেষ গুরুত্ব

দেওয়া হয়। 'খসড়া' পঞ্চম পরিকল্পনাকালে উচ্চ অর্থনৈতিক বিকাশের লক্ষ্যের পরিবর্তে দারিদ্র্য দূরীকরণের ও স্বনির্ভরশীলতা অর্জনের উদ্দেশ্য প্রাধান্য পেয়েছিল।

প্রথম তিনটি পরিকল্পনায় আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনের লক্ষ্যটি কোনো স্বীকৃতি পায়নি। চতুর্থ পরিকল্পনাতেই সর্বপ্রথম সুস্পষ্টভাবে এই উদ্দেশ্যের কথা ঘোষিত হয়। পঞ্চম ও ষষ্ঠ পরিকল্পনাতেও দারিদ্র্য দূরীকরণ ও আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন অন্যতম লক্ষ্য বলে ঘোষিত হয়। পঞ্চম পরিকল্পনাকালে দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যটি অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হলেও আয়ও সম্পদ বণ্টনে অসমতা দূরীকরণের লক্ষ্যটি বিশেষ স্বীকৃতি পায় নি। প্রসঙ্গত বলা দরকার যে বেকারত্ব দূরীকরণের উদ্দেশ্যটি প্রথম স্বীকৃতি ও অগ্রাধিকার পায় জনতা সরকারের ষষ্ঠ পরিকল্পনায় (১৯৭৮-৮৩)। কিন্তু জনতা সরকারের পতনের পর ১৯৮০ সালে নতুন ষষ্ঠ পরিকল্পনা (১৯৮০-৮৫) রচিত হলে এই উদ্দেশ্যটিকে পিছনের সারিতে ঠেলে দেওয়া হয়।

এবার আসি অর্থনৈতিক অসাম্য ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রসঙ্গে। সামাজিক ন্যায় বিচার বলতে যুগপৎ অর্থনৈতিক অসাম্য দূরীকরণ ও দারিদ্র্যের অপসারণকে বোঝায়। ন্যূনতম স্বাধিকার বা entitlement থাকবে। জাতীয় আয় বৃদ্ধির সঙ্গে সমাজের মুষ্টিমেয় উচ্চবিত্ত শ্রেণি এবং প্রবর গোষ্ঠীর (Elite) অনুকূলে জাতীয় আয়ের বণ্টন কাম্য নয়; কিন্তু ভারতে এমনটিই ঘটেছে অদ্যাবধি। এখানে আয়সৃষ্টিকারী সম্পদের বণ্টননীতি অতিমাত্রায় অসম এবং এর ফলে এই অসমতার মাত্রাটা তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে।

ভারতের অর্থনৈতিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাসকারী লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি অনেকটা প্রহেলিকার মতো। পরিকল্পনা প্রণেতারা আশা করেছিলেন যে অর্থনৈতিক বিকাশের সুফল সমাজের সর্বস্তরে ছড়িয়ে পড়বে এবং দরিদ্র লোকের সংখ্যা উত্তরোত্তর হ্রাস পাবে। কিন্তু এমনটি হল না। পরিকল্পনা-প্রণেতারাও এই অবস্থার জন্য অনেকাংশে দায়ী। যেমন সর্বপ্রথম পঞ্চম পরিকল্পনায় দারিদ্র্য দূরীকরণ উদ্দেশ্যটি ঘোষিত হয়। পরিকল্পনা কমিশনের ১৯৭২ সালের মে মাসের পেপার "Towards Self Reliance : Approach to the Fifth Five Year Plan"-এ স্পষ্ট করেই লেখা হয়—The basic premise is to anchor to the objective of removal of poverty। এর আগে দারিদ্র্য দূরীকরণের উদ্দেশ্যে নিতান্তই সাময়িক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

3.10 পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচির প্রবর্তন

যে পটভূমিকাতে পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৭৪-৭৫—১৯৭৮-৭৯) রচনা করা হল সেটা খুবই নৈরাশ্যমূলক। পরিকল্পনার চূড়ান্ত রূপ দিতে কমিশনের প্রায় দেড় বছর লেগে গেল কোনো এক অদৃশ্য কারণে এবং সেটা প্রকাশিত হল ১৯৭৬-এর সেপ্টেম্বরে। খনিজ তেলের সমস্যা তখন খুব তীব্র হয়ে উঠেছে ব্যারেল প্রতি দাম বাড়ার জন্য। এদিকে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য যে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল, তার কোনো প্রভাবও তখনও দেখা যায়নি।

পঞ্চম পরিকল্পনার যে 'খসড়া প্রতিবেদন' প্রকাশ করা হয় তা বিশ্লেষণের দিক থেকে চূড়ান্ত পরিকল্পনার থেকেও গভীর ও তথ্যনিষ্ঠ। খসড়া প্রতিবেদনে যা খোলাখুলি বলা যায়, তা রাজনৈতিক কারণে জাতীয় উন্নয়ন পর্ষদ ও সংসদ অনেকটা কাঁটছাট করে। চূড়ান্ত রূপে যখন তা প্রকাশিত হল, তখন দেখা গেল তা সারসংক্ষেপ বা সারমর্মের রূপ নিয়েছে। পশ্চাৎপটে যে বিশ্লেষণ ছিল তার কোনো আভাস তাতে ছিল না।

যাই হোক, এই পরিকল্পনার মুখ্য দুটি উদ্দেশ্য হল—(ক) দারিদ্র্য বিমোচন এবং (খ) অর্থনৈতিক স্বয়ম্ভরতা অর্জন।

পঞ্চম পরিকল্পনাতেই প্রায় সুস্পষ্টভাবে দারিদ্র্য দূরীকরণের উদ্দেশ্য ঘোষিত হল। ভাবতে অবাক লাগে যে, ভারতের মতো দেশে পঞ্চম পরিকল্পনার আগে দারিদ্র্য দূরীকরণের উদ্দেশ্য অর্থনৈতিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হিসাবে গৃহীত হয়নি। চতুর্থ পরিকল্পনা পর্যন্ত সমাজের দুর্বলতল শ্রেণির জন্য কোনো বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। চতুর্থ পরিকল্পনা পর্যন্ত দারিদ্র্য দূরীকরণের কোনো কর্মসূচি ছিল না। এই আগের পরিকল্পনাগুলিতে মনে করা হয়েছিল যে, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দরিদ্র জনসংখ্যার পরিমাণ কমে আসবে এবং দারিদ্র্যের সমস্যার সমাধান হবে। অর্থাৎ পরিকল্পনার নীতি প্রণেতারা 'চুঁইয়ে পড়ার তত্ত্ব' বা 'Trickle down theory'-এর ওপর বিশ্বাস রাখছিলেন। কার্যত এটি কাজ করেনি। বরং আসল অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে, প্রতিটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় দরিদ্র জনসাধারণের সংখ্যা ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। সেজন্য পঞ্চম পরিকল্পনা থেকে দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য বিশেষ কয়েকটি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। ১৯৭১ সালে সংসদীয় নির্বাচনের আগে ইন্দিরা গান্ধী গরিবি হঠাও শ্লোগানের প্রবক্তা হিসেবে প্রতীয়মান হন। এরপর পঞ্চম পরিকল্পনাতেও সর্বপ্রথম দারিদ্র্যের কারণ নির্ধারণ ও দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য নির্দিষ্ট কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এই পরিকল্পনায় দরিদ্র জনসাধারণের মান উন্নয়নের জন্য 'নূন্যতম প্রয়োজন প্রকল্প' গ্রহণ করা হয়।

গ্রামাঞ্চলে দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য যে সমস্ত কর্মসূচি নেওয়া হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল : 'সুসংহত গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্প', 'জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান প্রকল্প' এবং 'গ্রামীণ ভূমিহীনদের নিয়োগ নিশ্চিতকরণ প্রকল্প'।

3.11 সারসংক্ষেপ

এই এককে আমরা জানতে পারলাম কীভাবে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলের উত্থান হল। এবং এও জানতে পারলাম বেসরকারি উদ্যোগ ভারতের আর্থিক-রাজনৈতিক আকাশে কতটা প্রভাব বিস্তার করেছিল।

তাছাড়া তৃতীয় ও পঞ্চম পরিকল্পনারও সময় রাজনৈতিক অর্থনীতি কীভাবে দিক পরিবর্তন করেছে তাও। জানতে পারলাম সামাজিক ন্যায়বিচার, সমতা ও স্বনির্ভরতার ক্ষেত্রে কীভাবে জোর দেওয়া হয়েছিল। বিশেষ করে জানতে পারলাম যে, স্বাধীনতার পর পরই যে রাষ্ট্র নেতৃত্ব ছিল, তারা জাতীয় অর্থনৈতিক বিকাশে রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সম্পর্কে তাঁদের ঐক্যবদ্ধ চিন্তাধারার সাহায্যে তৎসহ দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় কীভাবে অনেক পরিবর্তন আনে এবং ধনী কৃষক ও বিত্তবান শ্রেণিগুলির সঙ্গে সম্পর্ক সম্বন্ধে জানতে পারলাম। কিন্তু পরবর্তীকালে এই রাষ্ট্রনেতাদের সর্বপ্রাধান্য থাকা সত্ত্বেও বিত্তবান শ্রেণির স্বার্থকে উপেক্ষা করা দুরূহ হয়ে পড়ল। তারপর যখন মর্যাদাসম্পন্ন নেতারা একে একে বিদায় নিলেন, ততই রাজনীতির স্রোত ঘোলা হল এবং এই বিত্তবান শ্রেণির স্বার্থ ততই মজবুত হল।

3.11 অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলি

1. স্বাধীনতা পরপরই ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ছাড়া যে সমস্ত রাজনৈতিক দলের উত্থান হয়েছিল, তাদের কয়েকটির নাম উল্লেখ কর।

2. আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল বলতে কী বোঝ?
3. কয়টি আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল 'অনগ্রসর জাতি' ইস্যুতে জোর দিয়েছিল?
4. প্রথম শিল্পনীতির ঘোষণা কোন্ সালে করা হয়?
5. প্রথম শিল্পনীতির মূল ভিত্তি কী ছিল? শিল্প (উন্নতি ও নিয়ন্ত্রণ) আইন কোন্ সালে প্রকাশ করা হয়?
6. ১৯৭০ সালের দত্ত কমিটির বক্তব্য কী ছিল?
7. 'MRTP' কী?
8. তৃতীয় পরিকল্পনার সময়কাল উল্লেখ করো। পরিকল্পনার ছুটি বলতে কী বোঝ?
9. PL-480 কী?
10. পঞ্চম পঞ্চবর্ষী পরিকল্পনায় কয়েকটি দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচির নাম উল্লেখ করো।

মাঝারি উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলি :

1. জোট গঠনে আঞ্চলিক দলগুলির গুরুত্ব কী ছিল?
2. ভারতের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারণে ব্যবসায়ীগোষ্ঠীর প্রভাব-প্রতিপত্তি কীভাবে উত্তরোত্তর বেড়ে উঠল তা ব্যাখ্যা করো।
3. তুমি কী মনে কর আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল ভারতের জাতীয় কংগ্রেসকে সর্বভারতীয় দল হিসাবে দুর্বল করেছিল? বর্তমান সময়ে এই দলগুলির জোটবদ্ধ রাজনীতি কী অনেকটা বেসামাল হয়ে পড়েছে? তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও।
4. বেসরকারি শিল্পপতিরা কোন্ কোন্ সুযোগের সদ্ব্যবহার করে ফুলে-ফেঁপে উঠেছিল?
5. তৃতীয় পরিকল্পনার (১৯৬১-৬৬) পাঁচটি উদ্দেশ্য কী ছিল?
6. পঞ্চম পরিকল্পনার সময়কাল উল্লেখ করো।

দীর্ঘ উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলি

1. বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও বিশেষ করে আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলের উত্থান সম্বন্ধে একটি নাতিদীর্ঘ টীকা লেখো।
2. আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলের ভূমিকা আলোচনা করো।
3. তৃতীয় পরিকল্পনার ব্যর্থতার জন্য কোন্ কোন্ বিষয়কে দায়ী করা যায়।
4. পরিকল্পনার ছুটির বছরগুলিতে ভারতের আর্থিক উন্নয়ন সম্পর্কে একটি টীকা লেখ?
5. ষাট-এর দশকে প্রধানমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রী দেশ গঠনে কী ভূমিকা নিয়েছিলেন?
6. বিত্তবান ভারতে প্রভুত্বশালী বিত্তবান শ্রেণিগুলির মধ্যে বিরোধ কীভাবে দানা বেঁধে উঠেছিল? এর ফলাফলই বা রাজনৈতিক অর্থনীতিতে কী ছিল?
7. তৃতীয় পরিকল্পনার উদ্দেশ্য কী ছিল? এই পরিকল্পনা কতদূর সার্থক হয়েছিল?
8. পঞ্চম পরিকল্পনায় দারিদ্র্য দূরীকরণ কর্মসূচি আলোচনা করো।

3.13 গ্রন্থপঞ্জী

- চট্টোপাধ্যায়, বিশ্বদেব (২০১৫) : *সমসাময়িক অর্থনীতি ও রাজনীতি : রাজ্য, দেশ ও বিশ্ব পরিস্থিতি,* এভেনেল প্রেস, মেমারী, বর্ধমান।
- Manor, James (2011): The Congress Party and the Great Transformation. Sanjoy Ruparaelia, Sanjoy Reddy et.al edited *Understanding India's New Political Economy* : *A Great Transformation*. London : Routledge pp. 86-203.
- মুখোপাধ্যায়, অপূর্ব (২০০৩) : *জওহরলাল নেহরু : রাষ্ট্র নির্মাণের তাত্ত্বিক,* সত্যব্রত চক্রবর্তী (সম্পাদিত) : *ভারতবর্ষ ও রাষ্ট্রভাবনা,* কলকাতা : একুশে প্রকাশন।
- রায়, সচ্চিদানন্দ (২০২২) : ভারতের গণতন্ত্রের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভিত্তি, কৃষ্ণগোপাল মোহন্ত সম্পাদিত *সমকালীন ভারত, সমাজ ও রাজনীতি,* আবাবিল বুকস্, কলকাতা।

একক 4 ◘ জরুরি অবস্থা জারি এবং এর বাইরের যা কিছু

গঠন

4.1 উদ্দেশ্য

4.2 প্রস্তাবনা

4.3 ১৯৭৫ সালে জরুরি অবস্থা জারি

4.4 ১৯৭৭ সালে ইন্দিরা গান্ধী এবং তাঁর কংগ্রেস পার্টির নির্বাচনী পরাজয়

4.5 ১৯৮০ সালে ইন্দিরা গান্ধীর ক্ষমতায় প্রত্যাবর্তন

4.6 ইন্দিরা সরকারের অধীনে পারমিট-লাইসেন্স-কোটা রাজ

4.7 রাজীব গান্ধীর সরকার (১৯৮৪-৮৯)—উদারীকরণের দিকে অগ্রসরতার নিদর্শন

4.8 সারসংক্ষেপ

4.9 অনুশীলনী

4.10 গ্রন্থপঞ্জী

4.1 উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে জানা যাবে—

- ভারতে ১৯৭৫ সালের যে জরুরি অবস্থা জারি হয়েছিল তার রূপরেখা কেমন ছিল;
- ১৯৭৭ সালে ইন্দিরা গান্ধী এবং তাঁর কংগ্রেস পার্টির নির্বাচনী পরাজয়ের কথা;
- ১৯৮০ সালে কীভাবে ইন্দিরা গান্ধী ক্ষমতায় প্রত্যাবর্তন করেছিল;
- ইন্দিরা সরকারের অধীনে পারমিট-লাইসেন্স-কোটা রাজ এবং
- রাজীব গান্ধীর সরকার (১৯৮৪-১৯৮৯), কীভাবে অর্থনৈতিক উদারীকরণের দিকে ধাপে ধাপে অগ্রসর হয়েছিল।

4.2 প্রস্তাবনা

১৯৫০-এর দশকটিকে আমরা সংকটের বছর বলে চিহ্নিত করতে পারি। তবে একথাও বলা যায় এই দশকেই উড্ডয়ন পর্বের পূর্ব-শতাবলির অস্তিত্বের এক পরিবেশ ভারতে সৃষ্টি হয়েছিল।

১৯৬০-এর দশকটি হতাশার কারণ হয়ে উঠল—১৯৬৫-৬৬ সালের অভূতপূর্ব খরা। ১৯৬৫ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ—এই দুই সংকটের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে ষাটের দশকের মাঝামাঝি থেকে শিল্পে মন্দাজনিত সংকট।

১৯৭০-এর দশকটি হল অর্থনৈতিক জগতে পরিবর্তনের যুগ, তৎসহ রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চেও অভূতপূর্ব পরিবর্তন। এই দশকের মাঝামাঝি সময় ঘোষিত হয় অভ্যন্তরীণ জরুরি অবস্থা (Emergency)। একে ঘিরে দিল্লির রাজনৈতিক

রঙ্গমঞ্চে পালা বদল ঘটে। মহাজোটের মাধ্যমে 'জনতা দল' ক্ষমতায় আসে। ১৯৭৯-৮০ সালে অর্থনৈতিক জগতে 'উদারীকরণের নীতি' অল্প-স্বল্প পরিমাণে গৃহীত হয়। এই দশকে দু-দুবার তেল সংকট দেখা দিলেও ভারত কোনো বড়সড় বিপদের মধ্যে পড়েনি। এই দশককে লেনদেন ব্যালেন্সের স্বর্ণযুগও বলে অভিহিত করা হয়।

4.3 ১৯৭৫ সালে জরুরি অবস্থা জারি

১৯৭০-এর দশকটি হল 'পরিবর্তনের দশক' (decade of change)। অর্থনৈতিক জগতে যেমন পরিবর্তন আসে তেমনি রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চেও পরিবর্তন ঘটে। ১৯৭০-এর প্রথম দশকে ইন্দিরা গান্ধীর সরকার আসে ও তিনি নিজে ছিলেন জনপ্রিয়তার তুঙ্গে। খারাপ মরসুম, তেলের মূল্যবৃদ্ধি এবং ১৯৭৪ সালে রেলকর্মচারীদের বড়সড় ধর্মঘট তাঁর জনপ্রিয়তার বিরুদ্ধে গেল। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংকট সামাল দিতে গিয়ে তিনি ১৯৭৫ সালে অভ্যন্তরীণ জরুরি অবস্থা ঘোষণা করলেন এবং এক বছরেরও বেশি সময় ধরে একনায়কত্বের সমান রাজনৈতিক শক্তি ভোগ করেন। তবে জরুরি অবস্থার সুফল অবশ্য অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে প্রতিফলিত হয়। কৃষি, শিল্প ও অন্যান্য ক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। বৈদেশিক মুদ্রা ভাণ্ডারে অভাবনীয় উন্নতি ঘটে।

জরুরি অবস্থা (যা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে সীমাহীন ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করেছিল) গ্রামীণ রাজনৈতিক অর্থনীতির মূল কাঠামোতে প্রবৃদ্ধি ও বণ্টন নীতির কার্যকর বাস্তবায়নে এগিয়ে এসেছিল। বিশ-দফা কর্মসূচি কংগ্রেস পার্টির নেতারা "দারিদ্র্যের ওপর সরকারি আক্রমণ" হিসাবে বর্ণনা করেছেন। এর প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল গ্রামীণ দরিদ্রদের অন্তর্ভুক্ত বিশাল জনসাধারণকে সাহায্য করা। এটি জমির সিলিং-এর দ্রুত বাস্তবায়নকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছে। ভূমিহীন শ্রমিকদের জন্য গৃহস্থালির ব্যবস্থা জোরদার করে, বণ্ডেড বা মুচলেকাবদ্ধ শ্রম বিলোপ, ভূমিহীন কৃষক, ক্ষুদ্র বা প্রান্তিক চাষি-এর পক্ষে রায় দিয়েছিল। তদুপরি, কৃষি শ্রমিকদের জন্য ন্যূনতম মজুরি প্রতিষ্ঠার জন্য আইন প্রণয়ন করেছিল।

১৯৭৫ সালের আগস্টে কংগ্রেস সভাপতি "২০ দফা অর্থনৈতিক কর্মসূচির দ্রুত বাস্তবায়ন এবং কংগ্রেস সংগঠনের অংশগ্রহণ"-এর জন্য রাজ্যগুলির কাছে এক নির্দেশিকা জারি করে। এটির বিস্তৃতি ছিল জেলা এবং ব্লক স্তর পর্যন্ত। গ্রামীণ সংস্কারের ক্ষেত্রে মহকুমা বা স্থানীয় পর্যায়ের কমিটিগুলোকে সবচেয়ে বড় দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল।

ভাবা হয়েছিল এই বিশ-দফা কর্মসূচি গ্রামীণ ভারতের চেহারা পরিবর্তনের অপার সম্ভাবনা উন্মুক্ত করবে এবং গ্রামীণ দরিদ্রদের শোষণের হাত থেকে মুক্ত করবে। কিন্তু তেমনটি ঘটেনি। মৌলিক কৃষি সংস্কারের বাস্তবায়ন নাগালের বাইরেই থেকে যায়, কারণ কেন্দ্রীয় সরকার তার অর্থনৈতিক সংস্কারের জন্য জেলা পর্যায়ে প্রশাসনিক যন্ত্রের ওপর প্রায় সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল ছিল। এমনকি জরুরি অবস্থায় সময়েও এটি যায়নি। বিপুল সংখ্যক লোক ছিল যাদের এই প্রোগ্রাম বা কর্মসূচির ওপর কোনো সহানুভূতি ছিল না। এছাড়া প্রাতিষ্ঠানিক পরিকাঠামোয় অন্যান্য ঘাটতি গ্রামীণ ঋণ পরিশোধের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সরকারের প্রচেষ্টার কার্যকারিতাকে সীমিত করে। রাজ্যগুলি ভূমিহীন শ্রমিক, প্রান্তিক এবং ক্ষুদ্র চাষিদের কাছ থেকে ঋণ পরিশোধের ওপর স্থগিতাদেশ আরোপ করেছিল এবং কিছুক্ষেত্রে সবচেয়ে দরিদ্র কৃষকদের কাছ থেকে ঋণের পরিমাণ কমাতে আইনি পদক্ষেপ নিয়েছে। কর ফাঁকি ও চোরাচালানের বিরুদ্ধে অভিযান আরও বেশি সফল হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, জরুরি অবস্থার প্রথম বছরে প্রত্যক্ষ করের সংগ্রহ আগের বছরের একই সময়ে অর্জিত করের ২৭ শতাংশের বেশি বৃদ্ধি পেয়েছিল। অতিরিক্ত সম্পদ একত্রিত করার ক্ষেত্রে

রাজ্যগুলির ক্ষমতা উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি দেখিয়েছে। কিছু ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারগুলি ভূমিরাজস্ব কর ও সেচের ওপর শুল্ক আরোপ করেছিল। আর একটি বড় অর্জন ছিল চোরাকারবারীদের বিরুদ্ধে অভিযান। ১৯৭৬ সালের জুলাইয়ের মধ্যে "ফরেন এক্সচেঞ্জ" সংরক্ষণ এবং চোরাচালান কার্যক্রম প্রতিরোধ আইন ১৯৭৬-এ জারি হয়েছিল। এর ফলে বোম্বে, দিল্লী ও মাদ্রাজে এই আইনটি বলবৎ হওয়ার জন্য ২১০০ জনের বেশি চোরাকারবারীদের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল এবং এক কোটি টাকা মূল্যের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল। সন্দেহভাজন চোরাকারবারী, মজুতদার এবং কালোবাজারির কার্যে জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে কোটি কোটি টাকার পণ্য জব্দ করা হয়েছিল।

উপরন্তু, বৈদেশিক মুদ্রার অবৈধ লেনদেনের সুযোগ কমে যাওয়ায় ও কাস্টমস্ সার্ভিসের উন্নতি ঘটায় এবং আন্তর্জাতিক মুদ্রা বাজারে টাকার শক্তির ওপর অনুকূল প্রভাব থাকার ফলে, অফিসিয়াল এবং কালো-বাজারের বিনিময় হারের মধ্যে মার্জিন সংকুচিত হতে শুরু করে। উপরন্তু, চোরাচালান এবং অন্যান্য অবৈধ বৈদেশিক মুদ্রার লেনদেন অনেক বেশি ঝুঁকিপূর্ণ হল। সরকার দেশে বৈদেশিক মুদ্রায় ব্যক্তিগত রেমিট্যান্সের প্রবাহ বৃদ্ধির জন্য ১৯৭৫ সালের নভেম্বরে, বিদেশে বসবাসরত ভারতীয় বা ভারতীয় বংশোদ্ভূত লোকজনের জন্য একটি নতুন স্কিম চালু করেছিল। ফলে উচ্চ বেতনের সন্ধানে পারস্য উপসাগরীয় দেশগুলিতে পাড়ি জমানো বিপুল সংখ্যক ভারতীয় নাগরিক এই প্রলোভনে সাড়া দিয়েছিলেন। তাই বৈদেশিক বাণিজ্যে যে ঘাটতি ছিল তার নিঃসন্দেহে এই রেমিট্যান্সের আগমনে উল্লেখযোগ্যভাগে কাজে লেগেছিল। একই সময়ে, ১৯৭৫-৭৬ সালে বিশ্ব ব্যাংক এবং IDA-সহ কনসোর্টিয়াম দেশগুলির সাহায্য ভারতের বাহ্যিক সম্পদের ওপর চাপকে আরও কমিয়েছে।

জরুরি অবস্থার সময় মূল্য পরিস্থিতির এক নাটকীয় উন্নতি এবং প্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্যের বৃদ্ধি ভারতীয় অর্থনীতিকে শক্তিশালী করেছিল—এই দাবি সরকারের ১৯৭৪ সালের নভেম্বর থেকে মূল্যবৃদ্ধি হ্রাসের হারে প্রতিফলিত হয়েছিল, যখন সরকার তার ব্যাপক মুদ্রাস্ফীতির বিরোধী পদক্ষেপগুলি ঘোষণা করেছিল। ১৯৭৬ সালের মার্চ মাসের শেষ নাগাদ পাইকারি মূল্যসূচক ১১.৬ শতাংশ হ্রাস পেয়েছিল, ১৯৭৪ সালের সেপ্টেম্বরের তুলনায়। অত্যন্ত ভালো আবহাওয়ার জন্য ১৯৭৫-৭৬ সালে কৃষি উৎপাদন প্রায় ১২১ মিলিয়ন টনের নতুন রেকর্ড করল, যা আগে বছরের তুলনায় ১৫.৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল।

তাছাড়া, শিল্পক্ষেত্রে, ধর্মঘট বা লকআউটে হারিয়ে যাওয়া শ্রম দিবসের সংখ্যা নাটকীয়ভাবে হ্রাস পেয়েছিল। শুধুমাত্র, ১৯৭৪ সালের জুলাই-সেপ্টেম্বর হারিয়ে যায় ৬ মিলিয়ন। মানব-দিবসের তুলনায়, ১৯৭৫ সালের জুলাই-সেপ্টেম্বর-এর অনুরূপ পরিসংখ্যান ছিল ১.৫৬ মিলিয়ন। শ্রমশান্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য বেশ কয়েকটি সরকারি ক্ষেত্রের শিল্পের উৎপাদন উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল, বিশেষ করে বিদ্যুৎ এবং কয়লা, ইস্পাত, অ্যালুমিনিয়াম, এবং নাইট্রোজেন সারের ক্ষেত্রে। সব মিলিয়ে, ১৯৭৫-৭৬ সালে, ভারতীয় অর্থনীতি তার সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক বৃদ্ধির হারে রেকর্ড করেছিল।

"জরুরি অবস্থার এইসব লাভ" সত্ত্বেও, টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য কাঠামোগত প্রতিবন্ধকতাগুলো অপসারণ করা যায়নি। শিল্প উৎপাদনে পুনরুদ্ধার অসম্পূর্ণ ছিল। বেশিরভাগ ভোগ্যপণ্য শিল্প, বিশেষ করে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ টেক্সটাইল গ্রুপ, স্থবির ছিল। কৃষি উৎপাদনে লাভ যেটুকু হয়েছিল তার সাথে সংযুক্ত ছিল সেচ, উচ্চফলনশীল বীজ এবং সারের অধিক ব্যবহার। ১৯৭৬-৭৭ সালে খাদ্যশস্যের উৎপাদন ৫ থেকে ৬ শতাংশের হ্রাস দেখিয়েছিল। জিএনপি-এর সার্বিক প্রবৃদ্ধির হার ২ শতাংশেরও নীচে নেমে এসেছিল। তাছাড়া, পুরোনো সমস্যার

সমাধান করা হয়নি। বেকারত্ব ক্রমবর্ধমান ছিল। সংগঠিত ক্ষেত্রে নতুন চাকুরি প্রতি বছর প্রায় ৫০০,০০০-এ স্থিতিশীল ছিল। ১৯৭৬-৭৭ সালে পাইকারি মূল্যসূচক আবার ঊর্ধ্বমুখী হতে শুরু করে, কতকটা খাদ্যদ্রব্যের এবং শিল্পের কাঁচামালের দাম বাড়ার কারণে। অন্যদিকে, রাজ্য সরকারগুলো বিক্রয় কর সংগ্রহের দিকে কোনো নজর দেয়নি এবং কৃষি আয়কর আরোপ করে করের ভিত্তি প্রসারিত করার কোনো প্রচেষ্টাই করেনি, সেইহেতু অর্থসংগ্রহের অবনতি রিজার্ভ ব্যাংকে বড়সড় ওভারড্রাফ্টের সমস্যার দিকে নিয়ে গেল।

অন্যান্য অসঙ্গতিগুলোও এই সময়ে উদ্ভূত হয়েছিল যা এক নতুন 'বিব্রতকর সমস্যা'র তৈরি করেছিল। বৈদেশিক মুদ্রার রেকর্ড বৃদ্ধি হয়েছিল, যা বেড়ে ১৯৭৬-৭৭ সালে হয়েছিল ২৮০০ কোটি টাকা। তবে আমদানির ক্ষেত্রে কার্যত নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার নীতি বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও, এই বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভকে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির উচ্চস্তরে উন্নীত করার জন্য ব্যবহার করা যায়নি।

যা হোক, ১৯৭৬ সালে ঘোষিত হল "চার-দফা কর্মসূচি"। চারটি দফা সামাজিক সংস্কারের ওপর মনোনিবেশ করেছিল যা ভারতের জাতীয় কংগ্রেস পার্টি দ্বারা অনুমোদিত সামাজিক ন্যায়বিচারের আদর্শ বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় বলে বিবেচিত হয়েছিল। এর মধ্যে রয়েছে যুব কংগ্রেসের প্রতিটি সদস্যের "অন্তত একজনকে পড়তে এবং লিখতে শেখানোর প্রতিশ্রুতি", "একটি গাছ লাগাও", "বিয়েতে যৌতুক এবং জাতিভেদ প্রথার বিলোপ সাধন কর", এবং "পরিবার পরিকল্পনায় সংক্রিয় অংশগ্রহণ কর।"

আসলে চার দফা কর্মসূচির বিশেষ রাজনৈতিক তাৎপর্য ছিল। মিসেস ইন্দিরা গান্ধীর কনিষ্ঠ পুত্র সঞ্জয় গান্ধীকে জাতীয় বিশিষ্টতা বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে কংগ্রেস পার্টি এটি গ্রহণ করেছিল—জরুরি অবস্থার পরে যুব কংগ্রেসের দ্রুত শক্তি বৃদ্ধির পিছনে। ১৯৭৫ সালের ডিসেম্বরে ভারতীয় যুব কংগ্রেসের কেন্দ্রনির্বাহী সদস্য পদে নির্বাচিত হবার পর, সঞ্জয় গান্ধী তার প্রভাব ব্যবহার করেছিলেন এবং নেতৃত্বের ভূমিকা থেকে অনেক উঠতি তরুণকে স্থানচ্যুত করেছিলেন। তখন কংগ্রেস পার্টির অভ্যন্তরে তিনিই একমাত্র কার্যালয়। সঞ্জয় যুব কংগ্রেসকে গড়ে তুলতে শুরু করলেন। জানুয়ারি ১৯৭৬ এবং ১৯৭৭ সালের জানুয়ারির মধ্যে সংগঠনটি পনেরো থেকে পঁয়ত্রিশ বছর বয়সের মধ্যে ৫ মিলিয়নেরও বেশি সদস্য নিয়োগ করেছে বলে দাবি করেছে। ব্লক যুব কংগ্রেস ৬,০০০ ব্লকে ওপর থেকে মনোনয়নের মাধ্যমে গঠন করা হয়েছিল। এই সংস্থায় বেশির ভাগই অবশ্য নিষ্ক্রিয় ছিল। এর বেশিরভাগ সক্রিয় সদস্য বৃহত্তর শহর ও শহরগুলোতে অসামঞ্জস্যভাবে কেন্দ্রীভূত ছিল এবং উত্তরের রাজ্যগুলোতে কেন্দ্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল। কিন্তু এটি বিপুল সংখ্যক অস্থির যুবকদের আকৃষ্ট করেছিল। ফলে এটি গুণ্ডাগিরির জন্যও খ্যাতি লাভ করেছিল।

সঞ্জয় নিজেও সরকার ও প্রশাসনের কাজে যথেচ্ছ হস্তক্ষেপ করতে শুরু করলেন—নিয়োগ থেকে শুরু করে মুখ্যমন্ত্রীপদ এবং বদলির বিষয়ে তার প্রভাব বিস্তার লাভ করে। তাছাড়া, শ্রীমতি গান্ধীর দিল্লিতে বস্তি উচ্ছেদ কর্মসূচিতে সঞ্জয় গান্ধী প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করেছিলেন। এই অপারেশন চলাকালীন ১৫০,০০০ টিরও বেশি বস্তি কাঠামো ভেঙে ফেলা হয়েছিল, যার ফলে ৭০০,০০০ লোক উচ্ছেদ হয়েছিল। বস্তিবাসীরা কার্যত তাদের সমস্ত জিনিসপত্র হারিয়ে ফেলেছিল। তাড়াহুড়ো করে শহরের উপকণ্ঠে তৈরি করা হয়েছিল বস্তিবাসীদের জন্য নতুন উপনিবেশ, যেখানে পানীয় জল বা অন্যান্য সুবিধা বিন্দুমাত্র ছিল না।

এর ফলস্বরূপ এই ধারণা তৈরি হয়েছিল যে সঞ্জয়ই হবে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর উত্তরসূরি। একটি নেহরু রাজবংশের কথা ছড়িয়ে পড়ল। ১৯৭৬-এর পরে কেন্দ্রীয় সরকার বার্ষিক জন্মহার কমানোর জন্য এক নতুন জাতীয়

জনসংখ্যা নীতি ঘোষণা করল। সঞ্জয় গান্ধী তৎক্ষণাৎ এই নীতিকে তাঁর চার দফা কর্মসূচির মধ্যে সংযুক্ত করলেন। তাঁর বাধ্যতামূলক বন্ধ্যাকরণের প্রক্রিয়া ভয়ানক আকার ধারণ করল। আদিবাসী, হরিজন, সংখ্যালঘু এবং অনগ্রসর জাতি ও শ্রেণিরা বাধ্যতামূলক বন্ধ্যাকরণের প্রথম শিকার হয়েছিল। পুলিশ স্থানে স্থানে গুলি চালিয়েছিল। জরুরি অবস্থার অন্য যে কোনো পরিনামের চেয়ে, এই নির্বীজন অভিযানটি সংখ্যালঘু, হরিজন এবং অনগ্রসর শ্রেণির মধ্যে বেশ জোর ধাক্কা দিয়েছিল। শ্রীমতি গান্ধীর বিশ্বাসযোগ্যতাও যথেষ্ট পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হল।

4.4 ১৯৭৭ সালে ইন্দিরাগান্ধী এবং তাঁর কংগ্রেস পার্টির নির্বাচনী পরাজয়

১৯৭৭ সালের ১৮-ই জানুয়ারি শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী হঠাৎ ঘোষণা করেন যে মার্চ মাসে লোকসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। একই সাথে তিনি একটি বিবৃতিতে রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তি দিলেন। প্রেস সেন্সরশিপ এবং জনসভা করার মতো রাজনৈতিক কার্যকলাপের ওপর অন্যান্য বিধিনিষেধও তুলে নিলেন। রাজনৈতিক দলগুলোকে অবাধে প্রচার চালানোর সুযোগ দেওয়া হল।

এদৎসত্ত্বেও বিরোধীরা স্পষ্টতই তীব্র প্রতিকূলতা নিয়ে নির্বাচনে নেমেছিল। একটি জাতীয় নির্বাচনী প্রচারণা সংগঠিত করার, প্রচারের জন্য তহবিল খুঁজে বের করার এবং ৩০০ মিলিয়নেরও বেশি ভোটারদের কাছে ঝুঁকিপূর্ণ বিষয়গুলি ব্যাখ্যা করার জন্য বিরোধীদের কাছে মাত্র ৫০ দিন সময় ছিল। এই ভোটারদের বেশিরভাগ ছিল নিরক্ষর। একই সময়ে, জয়প্রকাশ নারায়ণ, জনসংঘ, ভারতীয় লোকদল, এবং সমাজতান্ত্রিক পার্টি—একটি 'মহাজোট' সংগঠিত করল। প্রার্থীদের একটি একক তালিকা, একটি সাধারণ নির্বাচনী প্রতীক এবং একটি সাধারণ পতাকা রাখতে তাঁরা সম্মত হলেন। এই ঐক্যবদ্ধ বিরোধিতার প্রধান ছিলেন শ্রীমতি গান্ধীর অনবদ্য প্রতিপক্ষ মোরারজি দেশাই।

জনতা পার্টি নতুন নিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করেছিল, বিশেষ করে চন্দ্রশেখরের নেতৃত্বে সেই সমাজতন্ত্রীরা যাঁরা জয়প্রকাশ নারায়ণকে সমর্থন করেছিলেন। উপরন্তু জনতা সিপিআই (এম) এর সাথে নির্বাচনী জোটের ব্যবস্থা করতে পেরেছিল। পেল পাঞ্জাবের আকালি দলকে এবং তামিলনাড়ুর ডিএমকে-ও। বিপরীতে, কংগ্রেস তামিলনাড়ুতে সিপিআই এবং এআইডিএমকে-কে খুঁজে পেয়েছিল। স্বাধীনতার পর এই প্রতিযোগিতা প্রথম ছিল যেখানে বেশিরভাগ নির্বাচনী এলাকায় দলীয় প্রতিযোগিতা দুটি প্রতিপক্ষের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল : একটি কংগ্রেস ও তার সমর্থনকারীরা এবং অন্যটি জনতা ও তার সহযোগীরা।

এদিকে কংগ্রেস মন্ত্রীসভার সবচেয়ে বর্ষীয়ান সদস্য জগজীবন রাম, বহুগুণা এবং নন্দিনী সতপথী (যাঁরা কংগ্রেস ফর ডেমোক্রেসি (CFD) গঠন করেছিলেন),। তাঁদের দলত্যাগের ফলে কংগ্রেস একটি বড় ধাক্কা খেয়েছিল। জয়প্রকাশ নারায়ণ ভোটারদের সামনে একটি গুরুত্বপূর্ণ মতামত দিলেন : ভোটাররা কোন্‌টা চান : গণতন্ত্র, না একনায়কত্ব, দাসত্ব, না স্বাধীনতা। এও বললেন যে—সমস্ত ক্ষমতা ইন্দিরা গান্ধীর হাতে কেন্দ্রীভূত হওয়া সত্ত্বেও, শ্রীমতি অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করতে অক্ষম। জনতা দলের নেতারা জনগণের কাছে এক নতুন অঙ্গীকার হাজির করলেন যে, ভোটে তাদের জোট জিতলে "রুটি ও স্বাধীনতা"র ব্যবস্থা সুনিশ্চিত।

অন্যদিকে, 'আমি একজন সেবিকা', জনগণের 'সেবিকা' বলে শ্রীমতী গান্ধী এক মাসের মধ্যে দিনে ২০টি সভাতে ভাষণ দিয়েও ভোটারদের আশ্বস্ত করতে পারেননি।

আসলে প্রচারে ছিল স্পষ্ট "কংগ্রেস-বিরোধী তরঙ্গ"। একমাত্র প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে বাদ দিলে কংগ্রেসের কোনো নেতা—তা তিনি কেন্দ্রেরই হোক, বা রাজ্যের—কেউই জনগণের ভিড় ও উদ্দীপনা টানতে অক্ষম ছিলেন। অন্যদিকে, জয়প্রকাশ নারায়ণ, মোরারজি দেশাই, জগজীবন রাম এবং কম মাপের নেতাদের কথা শোনার জন্য জনতার ভিড় উপচে পড়েছিল। তাঁদের বক্তব্যে জোরপূর্বক নির্বীজকরণ করা, সেইসঙ্গে ভূমি পুনর্বণ্টন, কর্মসংস্থান এবং বৈষম্য হ্রাসের প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়নে কংগ্রেসের ব্যর্থতা তুলে ধরলেন।

এই বক্তব্যগুলি এতই জোরালো ছিল লক্ষ লক্ষ ছোট অনুদান আসতে শুরু করল জনতা পার্টির প্রচারকার্যের জন্য। সাংবাদিক কুলদীপ নায়ার এই সময়ের অবস্থা বর্ণনা করেছেন এইভাবে : এই সময়ে "লোকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করত, প্রায়ই মধ্যরাত পার হয়ে যেত, শুধু জনতা দলের নেতাদের কথা শোনার জন্য। নেতাদের আসতে দেরি হলে জনগণ কিছু মনে করতো না।"

১৯৭৭ সালের ১৬ই মার্চের নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। কংগ্রেস পার্টির ভরাডুবি হল। কংগ্রেস দল ১৯৭১ নির্বাচনে ৫১৮টি আসনের মধ্যে ৩৫২টি আপন পেয়েছিল। ১৯৭৭ সালে ৫৪০টি আসনের মধ্যে আসন পেল ১৫৩টি। অন্যদিকে জনতা দলটি ২৭০টি আসনে জিতেছিল। সব মিলিয়ে জনতা পার্টি ও তার মিত্ররা ৫৪০টি আসনের মধ্যে ৩৩০টিতে বিজয়ী হয়েছিল এবং নতুন সরকার গঠনের জন্য যথেষ্ট শক্তি অর্জন করেছিল। লক্ষণীয়, কংগ্রেস দল উত্তর ভারতে কার্যত নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। কংগ্রেস দল উত্তরপ্রদেশে, বিহার, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা, আসাম এবং গুজরাটসহ তার সমস্ত উত্তর ও কেন্দ্রীয় দুর্গে জনতা পার্টির কাছে পরাজিত হয়েছিল। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য মিসেস গান্ধী নিজেই তাঁর নিকটতম প্রতিপক্ষ রাজ নারায়ণের কাছে তাঁর নিজ নির্বাচনী এলাকা রায়বেরিলিতে পরাজিত হয়েছিলেন। তাঁর ছেলে সঞ্জয় গান্ধী কংগ্রেস মনোনীত আমেথির প্রতিবেশী কেন্দ্রে দাঁড়ালেও, ভোটাররা তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। কংগ্রেস রাজনীতির মূল কেন্দ্র উত্তরপ্রদেশে একটি আসনও জিততে ব্যর্থ হয়েছে কংগ্রেস দলটি। এই সামগ্রিক প্যাটার্নটি শুধুমাত্র ৪টি রাজ্যে উল্টে গেছে—তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ, মহীশূর ও কেরালা'। বেশ কিছু কারণও এর জন্য সম্ভাবত দায়ী ছিল। জরুরি অবস্থায় বাড়াবাড়ি দক্ষিণে ততটা হয়নি। আশঙ্কা জাগানো হয়েছিল যে জনসংঘের ওপর ভিত্তি করে এই জনতা পার্টি সরকার হিন্দিকে জাতীয় ভাষা হিসেবে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতে পারে।

শ্রীমতী গান্ধী জনগণের রায়কে সম্মানের সঙ্গে গ্রহণ করে একটি বিবৃতি জারি করেন এবং ৮১ বছর বয়েসি মোরারজি দেশাইকে দায়িত্ব নেওয়ার অনুমতি দিয়ে তাঁর পদ থেকে পদত্যাগ করলেন।

সব মিলিয়ে এই হল ১৯৭৭ সালে ইন্দিরা গান্ধী এবং তার কংগ্রেস পার্টির নির্বাচনী পরাজয়ের ইতিকথা।

4.5 ১৯৮০ সালে ইন্দিরা গান্ধীর ক্ষমতায় প্রত্যাবর্তন

জরুরি অবস্থার গণভোট হিসাবে বিবেচিত নির্বাচনে জনতা পার্টি ক্ষমতায় উঠে। কংগ্রেস দল হেরেছে, এমনকি সঞ্জয় ও ইন্দিরা গান্ধীও তাঁদের আসন হারিয়েছেন। জনতা পার্টি মতাদর্শ জুড়ে সরকার গঠন করেছিল—ডানপন্থী, সাম্প্রদায়িক, বামপন্থী। এভাবে শুরু থেকেই জোটে কোন্দল ছিল। দেশ পরিচালনায় জনতা সরকারের অক্ষমতা কংগ্রেস ও ইন্দিরার পুনরুত্থান ঘটায়।

জনতা পার্টি ক্ষমতায় এসেছিল এবং দলগুলির একটি আলগা জোট ছিল যার একমাত্র সাধারণ লক্ষ্য ছিল ইন্দিরাকে ক্ষমতাচ্যুত করা। তারা আরামদায়ক জনমত পেয়ে সরকার গঠন করে। শুরুতেই বিরোধ দেখা দেয় এবং প্রধানমন্ত্রী হওয়ার জন্য ত্রিমুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়। শেষ পর্যন্ত দলের সিনিয়র নেতাদের হস্তক্ষেপে মোরারজি দেশাইকে বেছে নেওয়া হয়। জনতা সরকার তখন ইন্দিরা গান্ধী দ্বারা সৃষ্ট সাংবিধানিক বাধাগুলি অপসারণ করতে যাত্রা শুরু করে এবং ৪৪ তম সংশোধনী বিল পাশ করে। এটি নাগরিক স্বাধীনতা এবং ক্ষমতা পুনরুদ্ধার করেছে।

তবে অর্থনীতির পরিচালনায় জনতা দল ততটা দক্ষ ছিল না। সরকার উচ্চ বর্ণের নিপীড়ন থেকে তফসিলি জাতিদের রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছে। জনতা পার্টি জরুরি অবস্থার সময় ইন্দিরা গান্ধী এবং তার সমর্থকদের অপরাধের জন্য বিচার করার জন্য যুদ্ধের পথে যাত্রা শুরু করেছিল। এ জন্য বিশেষ আদালত গঠন করা হয়। জনতা পার্টির প্রতিশোধমূলক প্রকৃতি জনগণের মধ্যে ইন্দিরার প্রতি সমর্থন ও সহানুভূতিও তৈরি করেছিল।

উত্তরে কংগ্রেসের প্রতি সমর্থন সম্পূর্ণ ক্ষয় হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু দক্ষিণ ভারতের পরিস্থিতি ভিন্ন ছিল কারণ ইন্দিরা এবং তার ২০ দফা কর্মসূচি এখানে সফল হয়েছিল এবং দরিদ্ররা তাকে মা ইন্দিরা বা ইন্দিরা আম্মা হিসাবে দেখেছিল।

এদিকে ওয়াই বি চৌহানের মতো প্রবীণ কংগ্রেস নেতারা ইন্দিরা গান্ধীকে শুধু পরাজয়ের কারণ হিসেবেই দেখেন না, দায় হিসেবে দেখেছিলেন। পার্টির মধ্যে আরেকটি বিভক্তি দেখা দেয় এবং ইন্দিরা কংগ্রেস (আই) গঠন করেন। কংগ্রেস (আই) দক্ষিণে রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল এবং জিতেছিল এবং ইন্দিরাও সংসদীয় আসনের উপনির্বাচনে জয়ী হয়েছিল। তবে জনতা পার্টি প্রশাসন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে মনোযোগ দিতে পারেনি। তারা শিল্পায়নের মাধ্যমে উন্নয়নের নেহরু মডেলকে প্রত্যাখ্যান করেছিল কিন্তু এর কার্যকর বিকল্প তৈরি করতে পারেনি। মুদ্রাস্ফীতি ২০% ছুঁয়েছে, ক্রমাগত দলাদলির দ্বন্দ্ব জনসাধারণকে ক্লান্ত করে তুলেছিল। মিত্ররা মধ্যবর্তী নির্বাচনের জন্য জোর করে বিবাদ করে এবং সমর্থন প্রত্যাহার করে। এখানে জনতা পার্টি কংগ্রেস (আই) থেকে ভিন্ন কোনো রাজনৈতিক কর্মসূচি ছাড়াই চলেছিল। পরবর্তীকালে, কংগ্রেস (আই) জয়ী হয় এবং ইন্দিরা ক্ষমতায় ফিরে আসেন।

৩৪ মাস ক্ষমতার বাইরে থাকার পর ইন্দিরা গান্ধী ক্ষমতায় ফিরে আসেন। এই দ্বিতীয় ইনিংসটি তার প্রথম ইনিংসের মতো দুর্দান্ত ছিল না। তিনি নিষ্পত্তিমূলক নেতৃত্ব প্রদান করতে পারেননি এবং তাঁকে বড্ড ক্লান্ত দেখায়। তিনি এখন আরও সতর্ক এবং দ্বিধাগ্রস্ত এবং তাঁর ছোট ছেলে সঞ্জয় গান্ধী ছাড়া কাউকে বিশ্বাস করেন না। একটি বিমান দুর্ঘটনায় সঞ্জয় গান্ধীর মৃত্যুর পর তিনি তার বড় ছেলে রাজীব গান্ধীকে প্রতিস্থাপন করার চেষ্টা করেছিলেন।

ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বের বড় দুর্বলতা ছিল যে তিনি তাঁর দলকে শক্তিশালী করতে অক্ষম ছিলেন।

4.6 ইন্দিরা সরকারের অধীনে লাইসেন্স-কোটা-পারমিট রাজ

কোনো ব্যক্তি যদি কোনো শিল্প স্থাপন করতে চায় বা কোনো কোম্পানি যদি তার উৎপাদন ক্ষমতা বাড়াতে চায়, তাহলে সরকারের কাছে অনুমতি নিতে হয়। সংক্ষেপে একেই বলে শিল্প-লাইসেন্স এবং পারমিট-কোটা রাজ। এই নীতির মাধ্যমে সরকার দেশের শিল্প ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

ভারতে এই ব্যবস্থা চালু হয়েছে ১৯৫১ সালের শিল্প (উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ) আইনের দ্বারা। এই আইনে বলা হয়েছে যে সব শিল্প এই আইনের প্রথম তালিকার অন্তর্ভুক্ত তাদের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নিবন্ধভুক্ত (Registered) হতে হবে। সরকারের লাইসেন্স-পারমিট ভিন্ন কোনো বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠা করা বা তার কোনোরূপ সম্প্রসারণ ঘটানো চলবে না। সরকারের লিখিত অনুমোদন (Permit) ছাড়া শিল্পের উৎপাদনের স্থান পরিবর্তনও করা চলবে না। শিল্পসংস্থা যদি সরকারের নিয়মের খেলাপে যায়, তাহলে সরকার তার লাইসেন্স বাতিল করতে পারে। যাই হোক, শিল্প লাইসেন্স-পারমিট কোটা রাজকে পরীক্ষা করার জন্য ১৯৬৭ সালে সরকার সুবিমল কমিটি নিয়োগ করে। ১৯৬৯ সালে এই কমিটির প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হয় এবং নানা ত্রুটির কথা সেখানে উল্লেখ করা হয়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে লাইসেন্স–পারমিট–কোটা দেওয়ায় চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা ছিল অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত ক্যাবিনেট কমিটির হাতে। এই সিদ্ধান্ত বহুলাংশেই রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত। রাজনৈতিক ভিত্তিতেই তখন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হতো, অর্থনৈতিক মাপকাঠি তখন গৌণ।

১৯৬৯-১৯৭৩ সালের সময় সীমায় ইন্দিরা গান্ধীর শাসনকালে এ তথ্য ইন্দিরা গান্ধীর অজানা ছিল না। তিনি এ বিষয়ে কোনো জোরালো পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি। 'যেমনটা চলছিল, তেমনটাই চলুক'—এই নীতি তিনি অনুসরণ করলেন। দ্বিতীয়বার নির্বাচনে জয়ী হয়ে ১৯৮০ থেকে ১৯৮৪ সাল অবধি ভারতের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। এই সময়সীমার মধ্যে লাইসেন্স পারমিট কোটা রাজকে শিথিল করতে পারলেন না, যদিও জানতেন যে এগুলো শিথিল করলে, দেশ অন্যান্য প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে শ্রীবৃদ্ধির পথে এগিয়ে যেতে পারবে। এ প্রসঙ্গে বিপান চন্দ্র, মৃদুলা মুখার্জী ও আদিত্য মুখার্জী তাঁদের পুস্তক 'ইন্ডিয়া সিন্স ইনডিপেনডেন্স'-এ লিখেছেন : লাইসেন্স-পারমিট-কোটা রাজকে শিথিল করতে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন ইন্দিরা গান্ধী। তিনি না মেনেছেন পিতা নেহরুর প্রকৌশল, না বুঝেছেন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিবর্তিত পরিস্থিতি অর্থাৎ ''She (Indira Gandhi) did not creatively develop Nehrus' strategy even in the field of economic policy to meet a changed national and world economic situation as is evident from her hesitant efforts to relax the licence-quota-regulation scheme.''

4.7 রাজীব গান্ধীর সরকার (১৯৮৪-৮৯)—উদারীকরণের দিকে অগ্রসরতার নিদর্শন

১৯৮৫-৮৬ সালের বাজেট ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এক নতুন পর্বের সূচনা করেছিল। যেদিন রাজীব গান্ধীর মাকে ৩১ অক্টোবর ১৯৮৪ সালে হত্যা করা হয়েছিল, সেদিনই তিনি প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন। ১৯৮৪ সালের ডিসেম্বরের সংসদীয় নির্বাচনে বিপুল জয়লাভের মাধ্যমে দ্রুত তাঁর গণতান্ত্রিক বৈধতা প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। প্রযুক্তিগত অগ্রগতির ওপর একটা বড় জোর দিয়ে, তিনি ভারতকে একবিংশ শতাব্দীতে উন্নীত করার চেষ্টা করলেন। আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার পরীক্ষায় দাঁড়াতে গেলে যে, উদারীকরণই একমাত্র পথ, এটি রাজীব গান্ধী বুঝেছিলেন এবং সেইভাবেই পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। এটি অবশ্যই বলতে সহজ কিন্তু করতে কঠিন। ভারতীয় শিল্প তখন লাইসেন্সের ফাঁদে বদ্ধ। রিসার্চ এবং উন্নতি থেকে বিশেষ কিছু আসেনি। কাঠামোগত পরিবর্তনের ব্যতিরেকে, আমদানিকৃত প্রযুক্তিগত নতুন পরের দিশা দেবে না। একটা নতুন পন্থা অবলম্বন করতে হবে; লাইসেন্সের জায়গায় অর্থনীতিতে নিয়ে আসতে হবে : আর্থিক এবং রাজস্ব ব্যবস্থাপনা, যাতে প্রবৃদ্ধি, উদ্ভাবন এবং বিনিয়োগের একটি পরিমণ্ডল তৈরি হয়। রাজীব গান্ধীর দক্ষ ও সৎ অর্থমন্ত্রী বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং-এর ১৯৮৫-৮৬ সালের বাজেটে এমনই

একটা কাঠামোর তৈরি করার কথা ছিল। সমালোচকরা ভেবেছিলেন যে ভি.পি. সিং সত্যিই এইভাবে কর সংগ্রহ করবেন কেননা ভি. পি. দাবিও করেছিলেন যে তিনি যথেষ্ট কর সংগ্রহ করবেন। তাঁরা তাঁর বাজেটকে ধনীদের জন্য এবং গরিবদের বিরুদ্ধে বাজেট বলে নিন্দা করেছেন। ভারতের কিছু প্রধান কর ফাঁকি দেওয়া শিল্পপতিদের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে, ভি. পি. সিং উল্লেখযোগ্যভাবে কর সংগ্রহ বাড়িয়েছিলেন এবং সেই সমালোচকদেরও মুখ বন্ধ করে দিয়েছিলেন যারা বলেছিলেন যে তিনি গরিবদের কথা ভাবেননি।

নতুন ব্যবস্থার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল একটি দীর্ঘমেয়াদি রাজস্ব নীতির খসড়া প্রকাশ, যা বেসরকারি উদ্যোক্তাদের বাজেটের ভবিষ্যৎ-এর গতিপথ যুক্তিসংগতভাবে আন্দাজ করতে পারবে। এই বাজেটটি সপ্তম পরিকল্পনার ক্ষেত্রে সরকারি ক্ষেত্রে উদ্বৃত্ত সৃষ্টির ওপর জোর দিয়েছিল। জোর দিয়েছিল আমদানি উদারীকরণের দিকে। এর ফলে ১৯৮৫ সালে আমদানি আশ্চর্যজনক ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং ১৯৮৬ সালের মার্চ মাসের অর্থবছরের শেষে ১৯৬ বিলিয়ন টাকার মোট রেকর্ড আমদানি করা হয়েছিল, যেখানে রপ্তানি মাত্র টাকার অঙ্কে ১১০ বিলিয়ন ছিল। বাণিজ্য ব্যালেন্সে ঘাটতির পরিমাণ ছিল ৮৭ বিলিয়ন টাকা। ভারতের উদার আমদানি নীতির প্রধান সুবিধাভোগী ছিল জাপান।

রাজীব গান্ধী সরকারের প্রথম বাজেটের বৈশিষ্ট্যের গতিশীলতা পরবর্তী বাজেটে পাওয়া যায়নি। দ্বিতীয় বাজেটটি (১৯৮৬-৮৭) তাদের হতাশ করেছিল যারা উদারীকরণের দিকে আরও পদক্ষেপের জন্য আশা করেছিল। আর তৃতীয়টি (১৯৮৭-৮৮)! এটির সবচেয়ে বিশিষ্ট বৈশিষ্ট্যটি ছিল প্রতিরক্ষা ব্যয়ের তীব্র বৃদ্ধি এবং ঘাটতি ব্যয়ের আরেকটি বিশাল অঙ্ক। এই তৃতীয় বাজেটটি রাজীব গান্ধী নিজেই উপস্থাপিত করেছিলেন। কারণ তিনি ১৯৮৭ সালের জানুয়ারিতে অর্থ পোর্টফোলিও গ্রহণ করেছিলেন, যখন তিনি তাঁর অর্থমন্ত্রী ভি. পি. সিংকে প্রতিরক্ষা মন্ত্রকে স্থানান্তরিত করেছিলেন।

বলাবাহুল্য, ১৯৮৫ সালের শিল্পনীতিও ছিল এক উদারীকরণের দিকে পদক্ষেপ। এই শিল্পনীতিতে বিদেশি বিনিয়োগের ভারতে প্রবেশের নিয়মকানুন সরল করা হয়েছে। বিদেশি প্রযুক্তি যাতে দেশে আসে তার ব্যবস্থা করা হয়। শিল্প লাইসেন্স নীতিও সরল করা হয়। ইলেকট্রনিক্স ও অন্যান্য সূর্যোদয় শিল্পের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ আইন কিছুটা শিথিল করা হয়। একচেটিয়া এবং নিষেধমূলক বাণিজ্যিক কাজকর্ম (MRTP) সংক্রান্ত আইনের সংশোধন করে বড় শিল্পের সম্পদের ঊর্ধ্বসীমা বাড়ানো হয়।

সব মিলিয়ে, রাজীব সরকার উদারীকরণের দিকে অগ্রসরতার এক নিদর্শন।

4.8 সারসংক্ষেপ

এই এককে ইন্দিরা গান্ধী যে ১৯৭৫ সালে জরুরি অবস্থা জারি করেছিলেন তার কারণ বর্ণিত হল এবং এই জরুরি অবস্থার ফলে অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক যে পটপরিবর্তন হল, সে কথাও বলা হল। ১৯৭৭ সালে ইন্দিরা গান্ধী এবং তাঁর কংগ্রেস পার্টি কীজন্য নির্বাচনে হারল, তারও বিশদ বর্ণনা করা হল। ১৯৮০ সালে ইন্দিরা গান্ধী যে ক্ষমতায় প্রত্যাবর্তন করেন, তাও বিশদভাবে জানা গেল। এক উদারীকরণের দিকে যে রাজীব গান্ধীর সরকার (১৯৮৪-৮৯) পদক্ষেপ করল তাও বর্ণনা করা হল।

4.9 অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলি :

1. জরুরি অবস্থা কী?
2. ১৯৭৫ সালের জরুরি অবস্থা কার হাত শক্ত করেছিল?
3. ১৯৭৭ সালের সাধারণ নির্বাচনের সময় ইন্দিরা সরকারের প্রতিপক্ষ কে ছিল?
4. জরুরি অবস্থার অবসানের পর কে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথ গ্রহণ করেছিলেন?
5. রাজীব গান্ধী সরকার কত বছর দেশ শাসনে ছিলেন?

মাঝারি উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলি :

1. জরুরি অবস্থা কেন জারি হল?
2. জরুরি অবস্থার কিছু ইতিবাচক দিক বর্ণনা করো।
3. জরুরি অবস্থার সময় জনগণের উৎসাহ উদ্দীপনার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

দীর্ঘ উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলি :

1. ১৯৭৭ সালে জরুরি অবস্থার সময় ভারতীয় রাজনীতি ও অর্থনীতিতে কী পরিবর্তন হয়েছিল?
2. ১৯৭৭ সালে ইন্দিরা গান্ধী এবং তাঁর কংগ্রেস পার্টির নির্বাচনী পরাজয় কীভাবে হয়েছিল?
3. ১৯৮০ সালে ইন্দিরা গান্ধী কীভাবে শাসন ক্ষমতায় ফিরে এলেন?
4. 'রাজীব গান্ধীর' সরকার এক উদারীকরণের প্রতিমূর্তি'—আলোচনা কর।

4.10 গ্রন্থপঞ্জী

- টাইমস্ অব ইন্ডিয়া (১৯৭৭), অক্টোবর ২৩ এবং ডিসেম্বর, ১৮
- Palamer, Norman D. (১৯৭৭). The Politics of Depolitizations. *Asian Survey*, February, p. 174.
- Weiner, Myror (১৯৭৭). The Parliamentary Election in India. *Asian Survery*, July.
- Chandra, B., Mukherjee M. & Mukherjee, A (2008). *India Since Independence*. Penguin Paper Box.
- Frank, Katherine (2001). *Indira* : *The Life of Indira Nehru Gandhi.* Harper Collins Publishers.

———

একক 5 ◘ সামষ্টিক অর্থনৈতিক সংস্কার, বেসরকারিকরণ এবং উদারীকরণ

গঠন

5.1 উদ্দেশ্য

5.2 প্রস্তাবনা

5.3 ১৯৯১ সালের পর অর্থনৈতিক সংস্কার

5.4 সংস্কারের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক দিক

5.5 ভারতে বেসরকারিকরণের উদ্যোগ

5.6 সংক্ষিপ্তসার

5.7 অনুশীলনী

5.8 গ্রন্থপঞ্জী

5.1 উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে জানা যাবে—

- ভারতে ১৯৯১ সালের পর কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে কী ধরনের অর্থনৈতিক সংস্কার নেওয়া হয়েছে
- অর্থনৈতিক সংস্কারের রাজনৈতিক যুক্তিই-বা কী ছিল এবং
- ভারতে বেসরকারিকরণের উদ্যোগ কতটা প্রসারিত হয়েছিল।

5.2 প্রস্তাবনা

১৯৮০-র দশকে ভারতীয় অর্থনীতিতে অভূতপূর্ব সাফল্য দেখা দিলেও ওই দশকের শেষের দিকে ভারতীয় অর্থনীতি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সংকটে নিমজ্জিত হয়। সমস্যাগুলি তীব্র হয়ে ওঠে ১৯৯০ সালের গোড়ার দিক থেকেই। কেন্দ্রে রাজনৈতিক অস্থিরতার দরুন অর্থনৈতিক জগতে নিশ্চিতভাবে অনিশ্চয়তা নেমে আসে। রাজনৈতিক অস্থিরতার দরুন অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারণ করাও কঠিন হয়ে পড়ে। ভি. পি. সিং সরকারের (১৯৮৯-১৯৯০) পতনের পর চন্দ্রশেখর সরকার (নভেম্বর ১০, ১৯৯০—জুন, ২১, ১৯৯১) ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়, যাকে সমালোচকরা 'Lame-Duck Government'-ও বলে থাকে। এই সরকারের কোনো অর্থনৈতিক কার্যক্রম না থাকায় ১৯৯১-৯২ সালে পূর্ণাঙ্গ বাজেটই পেশ করা সম্ভব হয়নি। ফলে সংকটগুলি তীব্র থেকে তীব্রতর আকার ধারণ করে। এরপর হল মধ্যবর্তী নির্বাচন। এই নির্বাচনে সংখ্যালঘিষ্ঠ কংগ্রেস (ই) সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। নতুন সরকার আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই অভূতপূর্ব সংকটের কথা জনসমক্ষে তুলে ধরা হল। কার্যত, এর আগে কোনো স্থায়ী সরকার না থাকায় ভারতীয় অর্থনীতি যে চরমতম সংকটে আবদ্ধ হয়েছিল, তা বিশেষ শোনা যায়নি; যদিও সংকট বহু পূর্বেই আবির্ভূত হয়েছিল। যাই হোক, ভারতের নবম প্রধানমন্ত্রী পি.ভি. নরসিমা রাওয়ের নেতৃত্বে নতুন সরকার (১৯৯১-১৯৯৬) ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমস্যার মোকাবিলায় অবতীর্ণ হল। মূল সমস্যাগুলি ছিল লেনদেন ব্যালেন্সের সমস্যা

ও তজ্জনিত বৈদেশিক মুদ্রা ভাণ্ডারের স্বল্পতা (মাত্র দুই সপ্তাহের বৈদেশিক মুদ্রা আমদানির ব্যয় মেটানোর মতো অর্থভাণ্ডারে থাকা), চরমতম বাজেটীয় ঘাটতি এবং ভয়াবহ মুদ্রাস্ফীতির দৌরাত্ম্য। পরিস্থিতি এমন ভয়াবহ হয়ে পড়ে যে সমাধানের জন্য সরকারকে ১৯৯১ সালের ১ জুলাই বিশ্বের পাঁচটি উল্লেখযোগ্য মুদ্রা (যথা আমেরিকার ডলার, ব্রিটেনের পাউণ্ড-স্টার্লিং, ফরাসি দেশের ফ্রাঁ, জার্মানির ডি-মার্ক (Deutsche Mark), জাপানের ইয়েন-এর পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় মুদ্রার (৭-৯ শতাংশ) অবমূল্যায়ন করতে হয়েছিল। চক্রবর্তী রঙ্গরাজন তখন ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংকের গভর্নর। তিন দিনের ব্যবধানে অর্থাৎ জুলাই, ৩, ১৯৯১-এর সকালে দ্বিতীয় পদক্ষেপেও মুদ্রার অবমূল্যায়ন ঘটানো হল, ওই পাঁচটি কারেন্সির পরিপ্রেক্ষিতে ১১ শতাংশ, যার পোশাকি নাম "Two haircuts in three days". দু-ধাপের অবমূল্যায়ন। সেই সময় রিজার্ভের ব্যাংকের Top Management ('উচ্চতম ব্যবস্থাপক') জুলাই ৩, ১৯৯১ সালে চেন্নাই এসে পৌঁছালেন।

চেন্নাই পৌঁছেই রঙ্গরাজন হাতে-লেখা একটা আদেশনামা জারি করলেন, যাতে লেখা ছিল : (১) ব্যাংক রেটকে ১০ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ১১ শতাংশ করা হল। (২) সর্বোত্তম আমানত রেট বেড়ে ১২ শতাংশ থেকে ১৩ শতাংশ করা হল এবং ধার দেওয়া রেটও বাড়ানো হল মুদ্রানীতিকে কঠোরতর করে।

❑ কেন এই অবমূল্যায়ন? এর পিছনে কোন্ রাজনীতি?

প্রথম পদক্ষেপে ৭-৯ শতাংশ অবমূল্যায়ন করা হয়েছিল, তাতে সরকার বুঝেছিল যে, এই পরিমাণ অবমূল্যায়নে বৈদেশিক মুদ্রাভাণ্ডারের শোচনীয় অবস্থার বিশেষ কোনো সুরাহা হবে না। ফলে তিনদিন পরে আবার রিজার্ভ ব্যাংক টাকার অবমূল্যায়ন ঘোষণা করে। রাজনৈতিক কারণও এর পশ্চাতে কাজ করেছে। বিশ্বব্যাংক ওই সময়ে তার ভারতের বাণিজ্য সংস্কারে গোপন রিপোর্টে ভারত সরকারকে ২২ শতাংশের মতো ভারতীয় টাকার অবমূল্যায়নের পরামর্শ দিয়েছিল। ভারতের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রয়োজনের তাগিদেই "স্বেচ্ছায়" অবমূল্যায়ন করা হয় বলে অবশ্য রাও সরকার দাবি করেছে। (এর আগেও ৬ জুন, ১৯৬৬ সালে পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য গভর্নর থাকাকালীন ভারতীয় টাকার যে ৩৬.৮৫ শতাংশ অবমূল্যায়ন ঘটানো হয়েছিল, তাও ছিল বিশ্বব্যাংকের চাপের কাছে ভারতের নতিস্বীকারের ঘটনা। কার্যত এখানে রাজনৈতিকভাবে বিশ্বব্যাংকের অবমূল্যায়নের গোপন পরামর্শটিকে 'সম্মান' জানানো হল। এর অর্থ হল আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডার থেকে যত শীঘ্র শর্তাধীন ঋণ (Conditional loan) গ্রহণ করে ভারতীয় অর্থনীতিকে চাঙ্গা করা।

বলা হচ্ছে যে আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডার থেকে ঋণ গ্রহণের অন্যতম প্রাথমিক শর্তই ছিল ভারতীয় টাকার অবমূল্যায়ন, যদিও রাও সরকার দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছিল যে অবমূল্যায়নের সিদ্ধান্তটি হল একান্তভাবে দেশীয় সিদ্ধান্ত—তা কোনোভাবেই বিশ্বব্যাংক বা আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডারের কছে নতজানু হওয়ার সিদ্ধান্ত নয়। সিদ্ধান্তটি যাই হোক না কেন, প্রায় ২০ শতাংশ ভারতীয় টাকার অবমূল্যয়ন করা হযেছে বিশ্বের আর পাঁচটি উল্লেখযোগ্য কারেন্সির সাপেক্ষে, যা পূর্বে বলা হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, সরকার বিপুল পরিমাণে নেওয়া বৈদেশিক ঋণের মধ্যে ১২ বিলিয়ন ডলারের মতো ঋণের সদ্ব্যবহার করতে পারেনি এবং ওই ঋণের জন্য বছরে ৩০ মিলিয়ন ডলারের মতো সুদ প্রদান করতে হয়েছিল। অর্থাৎ, সরকারের লাগামহীন পরিকল্পনা-বহির্ভূত ব্যয়, বিপুল বাজেটীয় ঘাটতি এবং সরকারি ক্ষেত্রের চরম ব্যর্থতা ভারতের রাজনৈতিক অর্থনীতির আকাশে এমন এক সংকটময় পরিস্থিতি বা ফিসক্যাল ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি করেছিল যে সরকার ভারতীয় মুদ্রার

অবমূল্যায়ন করতে বাধ্য হয়েছিল, এই যুক্তিতে যে, অবমূল্যায়ন একদিকে রপ্তানি বৃদ্ধিতে উৎসাহ দেবে এবং আমদানি নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করবে; কেননা ১৯৮৯ সালে উপসাগরীয় যুদ্ধের ফলে আমদানি ব্যয় বিপুল পরিমাণে বেড়ে গিয়েছিল; অন্যদিকে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলি থেকে রপ্তানি আয়ের সুযোগ ভীষণভাবে হ্রাস পেয়েছিল।

5.3 ১৯৯১ সালে পর অর্থনৈতিক সংস্কার

স্বাধীনতা-পরবর্তী ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসে ১৯৯১ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বছর (a watershed year)। এই বছরই দেশের অর্থনীতি তীব্রতর লেনদেন ব্যালেন্সের সংকটের সম্মুখীন হল। এর পালটা হিসাবে বেশ বড়সড় আর্থিক কর্মসূচি নেওয়া হল। তা শুধুমাত্র লেনদেন ব্যালেন্সের সংকট কাটিয়ে ওঠা নয়, তা ছিল অর্থনীতিকে সংস্কার করা,পুনর্গঠন করা এবং অত্যাধুনিক করা। ফলে, ১৯৯০-এর সংস্কার সবদিক থেকেই আগের কর্মপদ্ধতি (paradigm) থেকে সরে গিয়ে নতুন দিক্‌দর্শন হল।

❑ অর্থনৈতিক সংস্কার কীভাবে অতীত থেকে সরে এল

অতীতকে ভেঙে তিন রকমভাবে এ সংস্কার এগিয়ে চলল। প্রথমত, লাইসেন্স-পারমিট-কোটা রাজ (যা উৎপাদন ও বণ্টনের একমাত্র অধীশ্বর ছিল—যেমন, কী উৎপাদন করতে হবে, কোথায় উৎপাদন করতে হবে, কীভাবে উৎপাদন করতে হবে এবং কতটা উৎপাদন করতে হবে, তার একমাত্র একনায়ক ছিল) ও তার জটিল পদ্ধতি ভেঙে দেওয়া হল, উদ্যোক্তরা এখন অধিকতর স্বাধীন তাদের বিনিয়োগ চয়নের ক্ষেত্রে। দ্বিতীয় পরিবর্তন এল সরকারি ক্ষেত্রে একচ্ছত্র অধিকারকে খর্ব করে। তৃতীয় পরিবর্তন এল বাণিজ্য নীতির অন্তর্মুখী আবেশকে পরিত্যাগ করে। এখন আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকে কাজে লাগিয়ে ভারত 'রপ্তানি-নৈরাশ্য' বা 'অন্তর্মুখী উন্নয়ন কৌশল'-টি পরিত্যাগ করে 'উন্নয়নের বাহ্যিক কৌশল'-টি গ্রহণ করল এবং নিজেকে বিশ্ব অর্থনীতির সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে জুড়ে দিয়ে বিশ্ববাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার চ্যালেঞ্জ এবং সুবিধা-সুযোগকে কাজে লাগানোর অঙ্গীকার করল।

❑ অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতাকরণ এবং কাঠামোগত সামঞ্জস্যকরণ

ধারণাগতভাবে, আর্থিক সংস্কার কর্মসূচিকে দুটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে—(১) স্থিতিশীলতাকরণ, যার লক্ষ্য হল অভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক যে অসংগতি আছে তার পূর্ণ বিবেচনা (redress) করা। আর অন্যটি (২) কাঠামোগত সামঞ্জস্যকরণ, যার লক্ষ্য হল আর্থ-ব্যবস্থায় যে ঋজুতা এবং অদক্ষতা পরিলক্ষিত হয়, তা দূর করা। বিষয়বিবেচনায় (in content) সামঞ্জস্যকরণ পদ্ধতি হল সমষ্টিগত অর্থনীতির আওতাভুক্ত, অন্যদিকে কাঠামোগত আওতায় ব্যষ্টিগত এবং সমষ্টিগত অর্থনীতির দুটি দিকই ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

১৯৯১ সালে বৈদেশিক সংকটের হাত ধরে ভারতে সংস্কারের সূচনা। আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার (আইএমএফ), বিশ্বব্যাংক আর উত্তরের উন্নত দেশগুলির দাওয়াই এই সংস্কার। যার চরিত্র একান্তভাবে নয়া-উদারনৈতিক। আর যে-কোনো নয়া-উদারনৈতিক আর্থিক সংস্কারের মতো এই অর্থনৈতিক সংস্কারের মূল কথা হল অর্থনীতিকে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণমুক্ত করে বাজারকেন্দ্রিক করে তোলা। যে বাজার হবে মুক্ত। রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ, নিয়ন্ত্রণ সেখানে থাকবে না। এরই অন্য নাম উদারীকরণের নীতি। অর্থাৎ বাজারকে উদার, প্রশস্ত করতে হবে। সেখানে থাকবে না কোনো বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া প্রতিবন্ধকতা, বিধিনিষেধ। অর্থাৎ রাষ্ট্রের 'খবরদারি', কেন-না, রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ, বিধিনিষেধ

বাজারে মুক্ত প্রতিযোগিতার অন্তরায়। আর মুক্ত, অবাধ প্রতিযোগিতা না থাকলে বাজার কখনো 'দক্ষ' হয়ে উঠবে না। আর 'দক্ষ' না হলে বাজারে উৎপাদকেরা যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হবে, তেমনই নাকি স্বার্থহানি ঘটবে উপভোক্তাদের। মূল স্রোতের অর্থনীতি এই কথাই বলে। কাজেই বাজারী 'দক্ষতা' নিয়ে আসার জন্য, বাজারকে তার স্বকীয় ভঙ্গিমায় চলতে দিতে হবে। বাজারের চাই এই স্বাধীনতা রাষ্ট্রের থেকে।

বাজারী 'দক্ষতা'-র মানদণ্ড কী? এই মানদণ্ডটি একান্তভাবে উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের নিরিখে তৈরি। বলা হয়ে থাকে যে-কোনো উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের একান্ত লক্ষ্য তার মুনাফার সর্বাধিককরণ। সুতরাং, সেই বাজারই 'দক্ষ' যেখানে উৎপাদক তার সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনে নির্বিবাদে সক্ষম। রাষ্ট্রীয় বিধিনিষেধ দাম অথবা উৎপাদনকে স্বাভাবিকভাবে ওঠনামা না করতে গিয়ে বাজারে চাহিদা আর জোগানের মধ্যে বৈষম্য ঘটায় আর তার ফলে উৎপাদকের পক্ষে তার স্বাভাবিক মুনাফা লাভ হয়ে ওঠে না। কাজেই, বাজারী 'দক্ষতা'-র দাবি বাজারকে রাষ্ট্রের কবল থেকে মুক্ত করা। আর বাজার যখন 'দক্ষ' তখন চাহিদা আর জোগানের মধ্যে কোনো ফারাক থাকে না। অতএব একদিকে যেমন উৎপাদক সর্বাধিক মুনাফা অর্জনে সক্ষম হয়, অন্যদিকে উপভোক্তাও লাভবান তার চাহিদার সম্পূর্ণ পরিতৃপ্তিতে।

নয়া উদারনৈতিক এই প্রেক্ষাপটের নিগড়েই ভারতের অর্থনৈতিক সংস্কারের প্রকৃতি নির্ধারিত। বাজারে অদৃশ্য শক্তি দেশের সমস্ত অর্থনৈতিক কিংবা আর্থ-সামাজিক সমস্যার সমাধানে সক্ষম। অতএব, বাজারে ভরসা রাখো। বাজারই একমাত্র মহৌষধি যার সেবনে উজ্জীবিত হবে এ দেশের আপামর অর্থনৈতিক জীবন ও পরিসর।

১৯৯১ সাল থেকে চালু হওয়া আর্থিক সংস্কারের তাই মূল লক্ষ্যগুলি ছিল :

(ক) রাষ্ট্রের পরিবর্তে বাজারকে গুরুত্ব প্রদান, বাজারকে অর্থনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে স্থাপন, রাষ্ট্র চালিত হবে বাজার দ্বারা, বাজারের জন্য। বাজার রাষ্ট্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে না।

(খ) বাজারের মুক্ত প্রসারে রাষ্ট্রীয় পুঁজি নয়, বেসরকারি পুঁজি, বেসরকারি বিনিয়োগকে স্বাগত জানানো। কেননা, রাষ্ট্রীয় পুঁজি মানেই বাজারে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ, আর বেসরকারি পুঁজি মানে মুনাফামুখিতা, যা কিনা বাজারী 'দক্ষতা'-র প্রাথমিক শর্ত। অতএব, রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে সংকোচন। রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলিকে হয় সরাসরি বিক্রি বেসরকারি সংস্থাকে কিংবা তাদের বিলগ্নিকরণ। আর যারা টিকে থাকবে তাদের বাজারী নিয়মে 'দক্ষ' হতে হবে। সামাজিক লক্ষ্যপূরণের তাগিদে নয়।

(গ) বিদেশি পুঁজি, বিদেশি পণ্যকে দেশীয় পুঁজি, দেশীয় পণ্যের তুলনায় অধিক গুরুত্ব প্রদান। কেন? কেননা, বিদেশি পুঁজি, বিদেশি পণ্য আর বিদেশি উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের সাথে টক্কর দিলে দেশীয় শিল্প-প্রতিষ্ঠান, দেশীয় উৎপাদন দক্ষ হয়ে উঠবে। দেশীয় পণ্যের গুণগত উৎকর্ষ বৃদ্ধি পাবে। আর তাই প্রয়োজন বিশ্বায়নের। অর্থাৎ দেশীয় বাজারকে বিশ্বের বাজারের কাছে খুলে দেওয়া। সে পণ্যের বাজারই হোক কিংবা পুঁজির বাজার হোক। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হবে মুক্ত। সেখানে থাকবে না কোনো বিধিনিষেধ। আর তাই বাণিজ্যিক উদারীকরণ। বিদেশি পুঁজির যাতায়াত হবে অবাধ। সেখানে থাকবে না কোনো বাধা। বরং রাষ্ট্র বিশেষ বিশেষ নীতি ঘোষণা করবে বিদেশি পুঁজিকে আকর্ষণ করার জন্য আর যাতে সে অন্য দেশে চলে না গিয়ে আমার দেশে আসে তার জন্য পুঁজিকে, বিশেষ করে বিদেশি পুঁজিকে বিশেষ বিশেষ সরকারি সুবিধা প্রদান করতে হবে। কারণ নাকি বিদেশি পুঁজি না এলে আজকের যুগে আর্থিক প্রবৃদ্ধি সম্ভব নয় আর আর্থিক প্রবৃদ্ধিই নাকি নির্ধারণ করবে কতখানি আর্থিক প্রগতি হবে!

অর্থাৎ এককথায় বলতে গেলে ঘোষিত অর্থনৈতিক সংস্কারের ধারণাটি একান্তভাবে উদারীকরণ-বেসরকারিকরণ-বিশ্বায়নের ধারণা। আর এসবের কেন্দ্রবিন্দুতে বাজার। বাজারকে অবাধ, মুক্ত, প্রতিযোগিতামুখী, দক্ষ করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে এদের আয়োজন। তা সে পণ্যের বাজারই হোক, কিংবা পুঁজির বাজার বা অর্থের বাজার। অর্থাৎ যেখানে বাজার দক্ষতার সঙ্গে কাজ করবে, সরকার সেখান থেকে পশ্চাদাপসরণ করবে। অন্যদিকে, যেখানে বাজারের অস্তিত্ব নেই, বা দক্ষতার সঙ্গে কাজ করতে পারবে না, সেখানে সরকার তার প্রচেষ্টা এবং resource-কে কাজে লাগানোর আত্মনিয়োগ করবে। উদাহরণস্বরূপ, সমষ্টিগত আর্থিক স্থায়িত্ব আনা, ঐক্যের প্রসার ঘটানো, সম্পত্তির অধিকার সংরক্ষণ—সবই সরকারের কার্যাবলির আওতাভুক্ত। তাছাড়া বাজারী ব্যর্থতা দেখা দিলে, সরকারের ভূমিকাও সেখানে অনস্বীকার্য। বাজারী ব্যর্থতা তখনই হয় যখন বাজারে যোগদানকারী কুশীলবরা ঠিকমতো কাজ করতে পারে না এবং বাজার তখন সম্পদের বণ্টন সুচারুভাবে ও দক্ষতার সঙ্গে করতে পারে না। প্রতিরক্ষা বা অভ্যন্তরীণ সুরক্ষা সরকারি দ্রব্য। তার ভার বাজারের ওপর ছেড়ে দেওয়ার কোনো অর্থ হয় না। এ প্রসঙ্গে Reinventing Government গ্রন্থে ডেভিড ওস্‌বোর্ন যে মন্তব্য করেছিলেন তা প্রণিধানযোগ্য— The role of the Government is to "steer, but not row".

যা-হোক, বাজারকেন্দ্রিকতা মুখ্য করে ভারতে যে সংস্কারের শুরু তার বিভিন্ন ধারা বা রকম কীরূপ তা নিম্নে বর্ণনা করা হল—

(১) শিল্পের সংস্কার,

(২) সরকারি রাজকোষ নীতির সংস্কার,

(৩) আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সংস্কার,

(৪) আর্থিক ক্ষেত্রের সংস্কার,

(৫) শ্রমের বাজারের সংস্কার, এবং

(৬) রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের সংস্কার।

এই প্রতিটি সংস্কার যে একযোগে শুরু তেমনটা নয়। পর্যায়ক্রমে এদের সূচনা নব্বইয়ের দশকে এবং যার ধারা এখনও অব্যাহত। তিন দশক অতিক্রান্ত। ভারতীয় অর্থব্যবস্থায় সংস্কারের কার্যক্রম জারি তিন-দশক ধরে। কী এর প্রভাব দেশের সাধারণ নাগরিক, আপামর জনসাধারণ, গরিবগুর্বোর ওপর? আমরা এই আলোচনায় সচেষ্ট হব বিভিন্ন ক্ষেত্রীয় সংস্কারের পটভূমিতে একে একে। কিন্তু তার আগে একটু দেখে নেওয়া যাক দেশের রাজনৈতিক কাঠামোটিকে। সেই কাঠামোর পরিপ্রেক্ষিতে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠের ন্যায্য দাবি কী? আর সংস্কারের তিন দশকে সেই ন্যায্যতা কতখানি স্বীকৃত?

ঔপনিবেশিক দাসত্ব থেকে মুক্ত হবার পর স্বাধীন দেশের সংবিধান ভারতকে একটি সাধারণতন্ত্র বলে ঘোষণা করেছে। যে সার্বভৌম সাধারণতন্ত্রের প্রাণ হল গণতন্ত্র। এই মুহূর্তে গণতান্ত্রিকভাবে জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত সরকার। যদিও গণতান্ত্রিকতার পরিধি তাত্ত্বিক বিচারে আরও বিস্তৃত। তার অর্থ স্বাধীন মতপ্রকাশের ক্ষমতা, সরকারি নীতি এবং সামাজিক ও আর্থিক বিকাশে সকলের সমান যোগদান এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ। আর এসবই জনগণের স্বার্থে, তাদের আর্থ-সামাজিক জীবনের পরিমাণগত এবং গুণগত মান উন্নয়নের জন্য। এখন দেখে নেওয়া যাক বিগত তিন দশক

কাল বাবদ যে সংস্কার চলছে তার কতখানি এই গণতান্ত্রিকতাকে অক্ষুণ্ণ রেখেছে বা কী তার প্রভাব দেশের সাধারণ নাগরিকের উপর, যাদের দ্বারা যাদের জন্য, যাদের সরকার এই সংস্কার কর্মসূচি রূপায়ণ করে চলেছে। আমারা প্রথম বুঝে নিতে চাইব বিভিন্ন ক্ষেত্রীয় সংস্কারের প্রভাব দেশের জনসাধারণের উপরে এবং পরিশেষে সচেষ্ট হব সামগ্রিকভাবে সংস্কার কর্মসূচির গণতান্ত্রিক রূপ নিরূপণে।

১। শিল্প সংস্কার

স্বাধীনতার পর দেশের শিল্পায়নের ভিত রচিত হয় দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে। এ প্রসঙ্গে দ্বিতীয় শিল্পনীতি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। শিল্পের ভিত্তি স্থাপনের দায়িত্ব সে যুগে ন্যস্ত ছিল রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের ওপর। মূল ও ভারী শিল্প রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানের আধিপত্যে স্থাপিত হবে এমনটাই ছিল সেই নীতি। ১৯৯১ সালে ঘোষিত শিল্পনীতি রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের এই আধিপত্যকে খর্ব করে দেশে শিল্প প্রসারের দায়িত্ব তুলে দেয় বেসরকারি ক্ষেত্রের উপর। এর সাথে সাথে তুলে দেওয়া হয় শিল্প স্থাপনের জন্য প্রাক্-সরকারি অনুমতি বা লাইসেন্সিং প্রথাকে। একরকম বিদায় জানানোর হয় ষাটের দশকের শেষের দিকে লাগু-হওয়া শিল্পের একচেটিয়া কেন্দ্রিকরণ-রোধী নিয়ম। ফলে সেই অর্থে বৃহৎ পুঁজির বাধা রইল না বাজারে অবাধ বিচরণে। তদুপরি পরিকল্পনার যুগে যেসব শিল্প ছিল শুধুমাত্র ক্ষুদ্রশিল্পের জন্য সংরক্ষিত তাদেরকে উন্মুক্ত করে দেওয়া হল বৃহৎ শিল্পের বিনিয়োগের জন্য। এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ্য দেশের আর্থিক বিকাশে এবং ভারসাম্যে ক্ষুদ্রশিল্পের ভূমিকা। আমাদের মতো দেশে বেশির ভাগ ক্ষুদ্রশিল্প মূলধন অপেক্ষা শ্রম-নিবিড় বলে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃহৎ শিল্পের সাপেক্ষে বেশি। তদুপরি, দেখা গেছে দেশের রপ্তানি বাণিজ্যে ক্ষুদ্রশিল্প যতখানি অগ্রণী, বৃহৎ শিল্প ততখানি নয়।

ফলত বিগত তিন দশকে বাজারে প্রতিযোগিতায় বৃহৎ পুঁজির দাপটে খড়কুটোর মতো উড়ে গেছে বা মুখ থুবড়ে পড়েছে ছোটো ছোটো শিল্প-প্রতিষ্ঠান। এই মুহূর্তে দেশের শিল্পে বিনিয়োজিত পুঁজির সংখ্যাগরিষ্ঠ ভাগ কতিপয় শিল্প-প্রতিষ্ঠানের যারা সংখ্যায় মুষ্টিমেয়। কিন্তু দেশের শিল্পে তাদেরই একচ্ছত্র সাম্রাজ্য। এরা একদিকে যেমন মুনাফায়, পুঁজিতে স্ফীত, অন্যদিকে সরকারের উপর প্রভাব বিস্তার করে নিজেদের স্বার্থে শিল্পের পরিসরটিকে কায়েম করে রেখেছে। একদিকে শিল্পে কর্মসংস্থান যেমন থমকে গেছে, অন্যদিকে শিল্পজাত পণ্যের বাজারে এরাই একচ্ছত্র পসরা নিয়ে হাজির, সরে যেতে বাধ্য হয়েছে ছোটো শিল্পের পণ্য।

সংস্কারের যুগে শিল্প ক্ষেত্রে গুরুত্ব পেয়েছে বিদেশি পুঁজির সমাবেশ। অনেকে ভাবলেন, বিদেশি পুঁজি এলে নতুন শিল্প হবে,বাজারে প্রতিযোগিতা আসবে, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু সরকারি পরিসংখ্যান মতে এদেশে যে বিদেশি পুঁজি বিনিয়োগ শিল্পক্ষেত্রে সংঘটিত তার পঞ্চাশ শতাংশের বেশি নতুন শিল্প স্থাপনের জন্য নয়। বরং এদেশের প্রতিষ্ঠানের দেশীয় মালিকানার হস্তান্তর ঘটেছে বেশি। বিদেশি বহুজাতিক সংস্থা দেশীয় প্রতিষ্ঠানকে কিনে নিয়েছে। ফলে বাজারে প্রতিযোগিতার বদলে দেখা দিয়েছে একচেটিয়া ঝোঁক। বিদেশি পুঁজি ও দেশীয় বৃহৎ পুঁজির সাথে অসম প্রতিদ্বন্দ্বিতা অসংখ্য ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানের জন্য যেন এ যুগে অনিবার্য। কাজেই তথাকথিত প্রতিযোগিতার বদলে অসম প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জর্জরিত বর্তমানের বাজার। আর তার ফল একদিকে ক্রমাগত বন্ধ হয়ে যাওয়া ক্ষুদ্রশিল্পের পসরা, অন্যদিকে ক্রমহ্রাসপ্রাপ্ত সংগঠিত শিল্পে কর্মসংস্থান। হয়তো বা 'দক্ষ' বাজারের এটাই অমোঘতা। এখন বাজারের এই চিত্রটি কি গণতান্ত্রিক? উত্তর : মোটেই নয়।

২। সরকারি রাজকোষ নীতির সংস্কার

দেশের সরকারের আয়-ব্যয় ও ঋণসংক্রান্ত নীতিকে অর্থনীতির পরিভাষায় বলা চলে সরকারি রাজকোষ নীতি। আগেই বলেছি, নয়া উদারনৈতিকতাবাদ বাজারী দক্ষতার স্বার্থে চায় রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ, রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ এবং রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক উৎপাদনে প্রত্যক্ষ যোগদানের বিলোপসাধন। এবং অর্থনৈতিক পরিসরে তার দাবি রাষ্ট্রীয় উপস্থিতির, রাষ্ট্রীয় আয়তনের সংকোচন। এর মানে রাষ্ট্রের বিলোপসাধন নয়। রাষ্ট্র থাকবে তার অর্থনৈতিক সার্বভৌমত্ব খর্ব করে, বাজার (এমনকি বিশ্ববাজার) দ্বারা চালিত হয়ে। তার ভূমিকা হবে শুধু বাজার সহায়ক হিসাবে। সেটুকুই হবে তার (ন্যূনতম) ভূমিকা অর্থনৈতিক পরিসরে। তার অধিক কিছু নয়।

একদিকে প্রত্যক্ষভাবে অর্থনৈতিক কাজকর্মে (বিশেষত উৎপাদনে) সরকারি উপস্থিতিকে বাতিল যেমন করা হল তেমনি জোর দেওয়া হল সরকারের আয়তন সংকোচনের উপর। এর অর্থ রাজকোষ ঘাটতি কমানো। রাজকোষ ঘাটতির হ্রাস দুটি মাধ্যমে হতে পারে—সরকারের আয় বাড়িয়ে, অথবা ব্যয় কমিয়ে। নয়া উদারনৈতিক দর্শনে সরকারকে বাজারকে সুবিধা প্রদানের জন্য (অর্থাৎ বিদেশি পুঁজি এবং দেশি বৃহৎ পুঁজিকে সুবিধাদানের জন্য) বিদেশি ও দেশি (বৃহৎ) পুঁজিকে নানাবিধ ছাড় ঘোষণা করতে হল। এর অন্যতম কর্পোরেট করের হার কমানো। সুতরাং আপেক্ষিকভাবে সরকারের আয় বাড়ানোর রাস্তা হল বন্ধ। ফলত রাজকোষ ঘাটতির হ্রাসকল্পে ব্যয় সংকোচন ছাড়া অন্য কোনো পথ আর খোলা রইল না। সরকারি ব্যয় হ্রাস করতে গিয়ে কোপ পড়ল যে-সমস্ত সরকারি ব্যয়ে তার অন্যতম হল ভর্তুকি ব্যয় আর সামাজিক ক্ষেত্রের জন্য উন্নয়নমূলক ব্যয়। এ দেশে মূলত তিন ধরনের ভর্তুকি কেন্দ্রীয় সরকার দিয়ে থাকে—সারে, পেট্রোলে এবং খাদ্যে। পেট্রোলে ভর্তুকি কমিয়ে পেট্রোলের দামকে বাজার দ্বারা নির্ধারিত হবার সুযোগ দেবার ফলে পেট্রোলের ক্রয়মূল্য বাজার আজ বহুগুন বর্ধিত এবং এই বৃদ্ধি অন্তহীন। তার কুফল পণ্যসামগ্রীর দামের উপর পড়ে মুদ্রাস্ফীতির হারে নিরবচ্ছিন্ন বৃদ্ধি ঘটিয়ে চলেছে। আর মুদ্রাস্ফীতির দুর্ভোগ যে আর্থিক দিক থেকে পশ্চাদ্‌পদ মানুষজনকেই পোহাতে হয় তা অতি সুবিদিত। সারে ভর্তুকি হ্রাসের ফলে বাজারে সারের দাম ঊর্ধ্বমুখী। ফলস্বরূপ, কৃষির উৎপাদন ব্যয় ক্রমশ বর্ধিত। আর এই পরিস্থিতি এমন একটা সময় হাজির হয় যখন গোটা দেশ এক ভয়াবহ কৃষি সংকটে (agrarian distress) পতিত, যার প্রমাণ মেলে বিগত কুড়ি বছরে লক্ষাধিক কৃষকের আত্মহননে। কৃষির সংকটে শুধু কৃষকই যে ক্ষতিগ্রস্ত তা নয়, তার সাথে ক্ষতিগ্রস্ত সাধারণ উপভোক্তারা। কারণ খাদ্যপণ্যের মূল্যে ক্রমাগত অস্বাভাবিক বৃদ্ধি। খাদ্যে ভর্তুকি হ্রাসের ফলে দেশের খাদ্যপণ্যের সরকারি বণ্টন ব্যবস্থা একপ্রকার অর্থহীন হয়ে পড়ছে দিনের পর দিন। আর তার মাশুল গুনতে আজ বাধ্য কোটি কোটি নিম্ন আয়ের পরিবারকুল। সরকারি পরিসংখ্যান মতে, বিগত দুই দশকে মাথাপিছু দানাশস্য ভোগের পরিমাণ ক্রমশ হ্রাসপ্রাপ্ত। অতএব ভর্তুকি হ্রাসের ফলে এই সমস্ত পণ্যের বাজারী উৎপাদককুল উপকৃত নিঃসন্দেহে, কিন্তু তার থেকেও দুঃখজনক সাধারণ আমজনতার বর্ধিত আর্থিক দুর্দশা। কেননা, এই সমস্ত নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের বাজারে তাদের প্রকৃত ক্রয়ক্ষমতা সংকুচিত। বাজার তার, যার কিনা আছে অপর্যাপ্ত ক্রয় করার ক্ষমতা। কাজেই সরকারি ব্যয় হ্রাস বাজারে তৈরি করে চলেছে এক বিশাল অসাম্য। আর এই অসাম্য এমন সময়ে তৈরি যখন ধনী-দরিদ্রের মধ্যে আয় ও ধনবৈষম্য নয়া উদারনৈতিক আর্থিক বৃদ্ধি ক্রমশ সম্প্রসারিত করে চলেছে।

ভর্তুকি ব্যয় ছাড়া সরকারি ব্যয় সংকোচনের ধাক্কা এসে লেগেছে দারিদ্র্য দূরীকরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, নারী-শিশু ও সামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়া বর্গের মানুষের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প। এর সাথে যুক্ত করা চলে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে ব্যয়। এগুলোকে একসাথে আমরা সামাজিক ক্ষেত্রের জন্য ব্যয় বলে চিহ্নিত করতে পারি। এই ব্যয় হ্রাসের জন্য

এক অভিনব পন্থা অবলম্বন করা হচ্ছে। বলা হল, এতদিন নাকি দারিদ্র্য দূরীকরণ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি কর্মসূচিতে যে ব্যয় সরকার করে এসেছ তার সঠিকভাবে সঠিক জায়গায় বা সঠিক ব্যক্তিবর্গের কাছে পৌঁছায়নি। কাজেই ঠিকঠাকভাবে প্রকৃত যারা অভাবী তাদের কাছে এইসব ব্যয়ের সুবিধা পৌঁছাতে নির্দিষ্ট লক্ষ্যের ভিত্তিতে প্রকল্পগুলোকে চালাতে হবে। কিন্তু এখানে যা হয়, তা হল 'অন্তর্ভুক্তি'-র তলে বহিস্কৃত থাকে অনেক মানুষ।

সুতরাং, সরকারি রাজস্ব ঘাটতির প্রকৃত কোপ গিয়ে পড়ল দেশের গরিবগুর্বো এবং সামাজিক দিক থেকে পিছিয়ে-পড়া মানুষজনের ওপর। আমাদের মতো দেশে (বিশেষ সংকটকালে) সরকারি ব্যয় দেশের আর্থিক বিকাশে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। আর ব্যয় বৃদ্ধির ফলে যদি জাতীয় উৎপাদন এবং তার সাথে সাথে জাতীয় আয় বাড়ে তাহলে সরকারের রাজস্ব আদায়ও বৃদ্ধি পেতে পারে করের পরিমাণ বাড়ার জন্য। কিন্তু ব্যয় সংকোচন দ্বারা চালিত রাজস্ব ঘাটতির হ্রাস সেই সম্ভাবনাকে এ যুগে জলাঞ্জলি দিয়েছে। কেননা, নয়া উদারনৈতিকতাবাদের কাছে সরকারের কৃচ্ছ্রসাধন বাজারের স্বার্থে কাম্য। বাজারের মূল চালিকাশক্তি দেশি ও বিদেশি বৃহৎ পুঁজি এমনটাই যে চায়। কাজেই সার্বভৌম দেশের গণতান্ত্রিক সরকারকে নজর দিতে হয় কৃচ্ছ্রসাধনে—একান্তভাবেই মুক্ত বাজারের স্বার্থে, দেশের আপামরের স্বার্থ তাতে কতটা রক্ষিত হল সেই ভাবনা সরকারের ভাবার দায় নেই। কেননা বাজারচালিত আর্থিক বৃদ্ধি নাকি কোনো এক অদৃশ্য স্বয়ংক্রিয় প্রক্রিয়ায় আমজনতার জীবনযাত্রার মানকে সদর্থে ছুঁয়ে যাবে।

৩। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সংস্কার

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উদারীকরণ সংস্কারের আরেকটি মুখ। এর মূল কথা হল আমদানি বাণিজ্যের উপর থেকে সমস্ত রকম প্রতিবন্ধকতার (যেমন বাণিজ্য শুল্ক, পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি) অপসারণ। আর রপ্তানিকে প্রসারিত করা এমনভাবে যেখানে সরকারি কোনো প্রত্যক্ষ সুবিধা হবে অনুপস্থিত। যেমন রপ্তানিতে প্রদেয় ভর্তুকির প্রত্যাহার। এই উদার বাণিজ্যের নীতি বিভিন্ন প্রকার বৈদেশিক পণ্য (যা কিনা এতদিন এদেশের বাজারে সুলভ ছিল না) দেশীয় বাজারে অবাধে প্রবেশ করতে শুরু করল। এইসব পণ্যের অসম প্রতিযোগিতায় বহু দেশি পণ্য তাদের স্থান খোয়ালো বাজারে। আর টিকে যারা রইল তাদের যুক্ত হতে হল বিদেশি উৎপাদকের সাথে। যে-সব উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের পণ্য বাজারে প্রায় অস্তিত্বহীন হয়ে পড়ল তাদের অধিকাংশই ক্ষুদ্র পুঁজির প্রতিষ্ঠান। ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হল সংগঠিত শিল্পের উৎপাদন আর কর্মসংস্থান। এর জায়গা দখল করে নিতে শুরু করল অসংগঠিত ক্ষেত্র, যেখানে বেশিরভাগ শ্রমজীবী মানুষ স্বনিযুক্ত হল বিভিন্ন পেশায় কোনোরকমে দিন গুজরানের জন্য। অসংগঠিত ক্ষেত্রে শ্রম হল আরও সুলভ। বাণিজ্যিক উদারীকরণের ফলে রপ্তানি বাণিজ্যের তুলনায় আমদানি বাণিজ্য অনেকখানি স্ফীত। তার ফল বর্তমানের ক্রমবর্ধমান বাণিজ্য ঘাটতি। যার রাশ টানতে গিয়ে সরকারি ব্যয় সংকোচনকে দাওয়াই বলে তুলে ধরা হচ্ছে এবং দেশের আমজনতার উপর সামগ্রিকভাবে তার প্রতিকূল প্রভাব পড়েছে।

৪। আর্থিক ক্ষেত্রের সংস্কার

আর্থিক ক্ষেত্রের সংস্কারের মূল উদ্দেশ্য দুটি—এক, ব্যাংক প্রভৃতি আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে বাজারের নিগড়ে চালিত করা অর্থাৎ মুনাফাভিত্তিক করে 'দক্ষতা' আনা; এবং দুই, সামগ্রিকভাবে গোটা আর্থিক কাঠামোর এবং অর্থব্যবস্থার পরিকেন্দ্রে শেয়ারবাজারকে স্থাপিত করা, যাতে করে শেয়ারবাজার হয়ে উঠবে গোটা দেশে অর্থনীতির একমাত্র মাপকাঠি—যার ওঠানামা নির্দেশিত করবে অর্থনীতির হালহকিকৎ।

প্রথমত, মনে রাখা দরকার, ব্যাংক প্রভৃতি মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য দেশের মোট সঞ্চয়কে বণ্টন করা। ষাটের দশকের শেষের দিকে ব্যাংক জাতীয়করণের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ব্যাংকগুলিকে তার সামাজিক দায়িত্ব পালনে চালিত করা। যেমন কৃষি, ক্ষুদ্রশিল্পের মতো অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সুলভে ঋণের ব্যবস্থা করা। মুনাফা অর্জন যেখানে ছিল গৌণ। নব্বইয়ের আর্থিক সংস্কার ঠিক এর উল্টো পথ চলা। কেননা, ব্যাংকে বলা হত দক্ষ হতে। আর দক্ষ হবার অর্থ মুনাফা অর্জনের ক্ষমতা বৃদ্ধি, মুনাফাকেন্দ্রিক হয়ে ওঠা। স্বভাবতই কৃষি ক্ষুদ্রশিল্পের জন্য সুলভ ঋণকে দেখা হল এই দক্ষ হয়ে ওঠার অন্তরায়। ফলত, ব্যাংকের সংস্কারে আদপে স্বার্থহানি ঘটল এ দেশের কোটি কোটি ক্ষুদ্র ও মাঝারি কৃষকের আর ক্ষুদ্রশিল্পের উৎপাদকের।

দ্বিতীয়ত, শেয়ারবাজারকেন্দ্রিক আর্থিক ব্যবস্থায় উৎপাদনশীল ক্রিয়াকর্মের তুলনায় শেয়ারবাজারভিত্তিক ফাটকা কারবারের ঝোঁক অনেক বৃদ্ধি পেল। যার সাথে যুক্ত ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তা। গোটা অর্থনীতি এই অনিশ্চিত শেয়ারবাজারের ফাটকা স্বার্থের দ্বারা চালিত হল, যার থেকে লাভবান একমাত্র কতিপয় ফাটকা কারবারী, দেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের স্বার্থের বিনিময়ে।

৫। শ্রম সংস্কার

শ্রম সংস্কারের অর্থ এদেশের প্রচলিত শ্রম আইনের সংস্কার। এই সংস্কারের মূল উদ্দেশ্য : (১) যেমন খুশি নিয়োগ, যেমন খুশি ছাঁটাই; (২) মজুরিকে দমিয়ে রাখা যাতে করে শ্রম বেশি বেশি করে সস্তা হয়ে ওঠে; (৩) শ্রমিকের সংগঠিত হবার অধিকার অর্থাৎ ট্রেড ইউনিয়নের অধিকার হনন করা; (৪) শ্রমিককে তার অন্যান্য সুবিধা যেমন প্রভিডেন্ট ফাণ্ড, সবেতন ছুটি ইত্যাদি থেকে বঞ্চিত করা। এসবের মূল্য লক্ষ্য দুটি : এক, শ্রমকে সুলভ থেকে সুলভতর করে তোলা আর তাকে পুঁজির দাসত্বে বেঁধে ফেলা এবং দুই, তাকে আরও বেশি করে উৎপাদনশীল করে তোলা। একদিকে অসংগঠিত ক্ষেত্রের ব্যাপাক প্রসার শ্রম আইনকে অসাড় করে তুলেছে, কেননা অসংগঠিত ক্ষেত্রে দেশের শ্রম আইন লাগু নয়; অন্যদিকে সংগঠিত ক্ষেত্রে অস্থায়ী এবং চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকের সংখ্যা স্থায়ী শ্রমিকের সাপেক্ষে বিপুল হারে ক্রমশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত যাদের জন্য প্রচলিত শ্রম আইন একরকমে উহ্য। অতএব, শ্রম আজ সস্তা।

কৌশিক বসু ভারতের 'Industrial Dispute Act, 1947' সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন যে এই বিধিটি যাদের উদ্দেশ্যে রচিত, অর্থাৎ শ্রমিক, তাদেরই ক্ষতি করছে। শ্রমিকদের সমস্যায় অনেক সময় রাজনৈতিক ও মন্ত্রীস্তরেরও হস্তক্ষেপ থাকে। কখনও-কখনও বিচারালয়ও শ্রমিকের প্রতি বৈষম্যমূলক অভিভাবক সুলভ আচরণ করে। উদাহরণ ১৯৯২ সালের হাজারির রায়। অনেকে মনে করেন নিরাপত্তামূলক 'শ্রমবিধি' দেশের বিকাশ ও দক্ষতার হানি করেছে।

কর্মসংস্থানের বাজার ভালোভাবে চলতে পারে এবং কর্মীরা ভালোভাবে নিজেদের কাজ করতে পারে—এই রকম সদুদ্দেশ্য নিয়ে শ্রম আইন (Labour Law) রচনা করা হয়েছে। কিন্তু ভারতবর্ষে দারিদ্র্যের যে স্তরে মানুষেরা আছে ও যেরকম অত্যন্ত কম মজুরিতে অধিকাংশ মানুষ কাজ করতে বাধ্য হচ্ছে (তা কোভিড-১৯-এর আগে ও পরের কথা ধরলেও) বা বর্তমান বিজেপি সরকারের প্রবর্তিত ৪টি শ্রম কোড ধরলেও, সেদিকে তাকিয়ে বলা যেতেই পারে যে শ্রমনীতি বিশেষ সার্থক হয়নি। তার কারণ পদ্ধতি নির্ধারণের সময় উৎকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ও পরিসংখ্যানগত তত্ত্বের ওপরে নির্ভর না-করে রাজনৈতিক মতৈক্যের ওপরে বেশি গুরুত্ব দেওয়ার ফলেই পরিণাম এত শোচনীয় হয়েছে। এর সঙ্গে কায়েমি স্বার্থ তো আছেই। শ্রম আইন, সংগঠিত ও অসংগঠিত উভয় ক্ষেত্রেই শ্রমিকদের স্বার্থহানি করেছে।

৬। রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের সংস্কার

এদেশের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য চারটি—আর্থিক বৃদ্ধি, আধুনিকীকরণ, স্বনির্ভরতা আর সামাজিক ন্যায় বা সাম্য। দ্বিতীয় পরিকল্পনার কাল থেকে বলা যেতে পারে রাষ্ট্রায়ত্ত উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের উপর দায়িত্ব বর্তালো এই সবকটি লক্ষ্য পূরণের। ১৯৫৬ সালের দ্বিতীয় শিল্পনীতি রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের প্রসারে জাতীয় অভিমুখ করল প্রসারিত। রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানের ব্যাপক প্রতিষ্ঠা আর সম্প্রসারণ শুরু হল। মূল ও ভারী শিল্প স্থাপনের পাশাপাশি রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানগুলির উপর ন্যস্ত হল নানাবিধ সামাজিক দায়িত্ব—দেশে শিল্পের ভিত্তি স্থাপন, পরিকাঠামো গঠন, আঞ্চলিক বৈষম্য দূরীকরণ, কর্মসংস্থানের সৃষ্টি, বৃহৎ পুঁজির এককেন্দ্রীকরণ এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতার কুক্ষিগতকরণ রোধ এবং অত্যাবশ্যকীয় পরিষেবা প্রদান (যেমন জল সরবরাহ, বিদ্যুৎ ইত্যাদি)। এই প্রতিষ্ঠানগুলির তথাকথিত দক্ষতা মুনাফার নিরিখে ধার্য হল না, ধার্য হল একপ্রকার তাদের সামাজিক লক্ষ্যগুলি পূরণের সাফল্যের সাপেক্ষে। উদারনৈতিক আর্থিক সংস্কার স্বভাবতই এই জাতীয় রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রকে বাজারকেন্দ্রিক অর্থব্যবস্থার পরাকাষ্ঠা বলে ধরে নেয়। কাজেই, আর্থিক সংস্কারের যুগে দেখা দিল রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলির মালিকানায় পরিবর্তন—রাষ্ট্রীয় মালিকানা থেকে বেসরকারি মালিকানা অথবা বিলগ্নিকরণ অর্থাৎ এই সংস্থাগুলির খোলা শেয়ারবাজারে বিক্রয়, যার ফলে এরা চালিত হতে শুরু করল শেয়ার হোল্ডারদের স্বার্থে আর পাঁচটা কর্পোরেট সংস্থার মতো। এই পরিবর্তিত ব্যবস্থায় বাজারী দক্ষতা অর্থাৎ মুনাফা অর্জনই হল একমাত্র উদ্দেশ্য। সমস্ত রকম সামাজিক দায় হল নির্বাসিত। ফলে মুখ থুবড়ে পড়ল রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের কর্মসংস্থান; বহু প্রতিষ্ঠান অদক্ষ, অলাভজনক বলে চিরতরে বন্ধ হল। যারা টিকে রইল তাদের বাঁচতে হল বাজারের নিয়ম মেনে, শেয়ারবাজারের নির্দেশিকাকে পাথেয় করে। মনে রাখা দরকার, রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানের বিনিয়োগ সরকারি বিনিয়োগ, যে বিনিয়োগে দেশের করদাতার অবদান অনেকখানি। আর আজ একদা সরকারি অর্থে গড়ে ওঠা প্রতিষ্ঠানের বিনিয়োগ সরকারি বিনিয়োগ, যে বিনিয়োগে দেশের করদাতাদের অবদান অনেকখানি। আর আজ একদা সরকারি অর্থে গড়ে ওঠা প্রতিষ্ঠানগুলি হল বেসরকারি মুনাফা অর্জনের জায়গা। অনেক বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান বা শিল্পপতির বর্তমানের মুনাফার দৌড় এই একদা সরকারি বিনিয়োগ তৈরি হওয়া রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানের সম্পদ ও পরিকাঠামো ব্যবহার করে। কাজেই এর মধ্যে গণতান্ত্রিক স্বার্থ কতটা রক্ষিত হল তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ থেকেই যায়। বিশেষ করে যখন দেখি এই ব্যবস্থার সূত্রপাত এমন সময়ে যখন দেশের আর্থিক বৃদ্ধি আর আর্থ-সামাজিক অসাম্য একই সাথে ত্বরান্বিত।

বিভিন্ন ক্ষেত্রীয় সংস্কারের পটভূমিকায় একথা নিশ্চিতকরে বলার উপায় নেই যে এ-দেশের আপামর নাগরিক, সাধারণ নিম্ন আয়ভুক্ত বর্গ, গরিবগুর্বো, ছোটো ও মাঝারি চাষি, ক্ষুদ্র শিল্পোদ্যোগী কিংবা সমাজের পিছিয়ে-পড়া বর্গ যাদের অন্তর্ভুক্ত তপশীল জাতি-আদিবাসী, মহিলা ও শিশু এবং এদেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ভালো আছেন সংস্কারের তিন দশকে। তাদের প্রত্যেকের জীবনযাত্রার মান ও গুণগত উৎকর্ষ বর্ধিত হয়েছে সংস্কারোত্তর সময়ে—এমনটা একদমই বলা চলে না। এদেশে একদিকে যেমন কোটিপতি বা কোটি-কোটিপতির সংখ্যা বাড়ছে, তখন অন্যদিকে দেনার দায়ে আত্মঘাতী লক্ষ লক্ষ চাষি। 'অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন' (Inclusive growth) যখন সরকারি নীতির নতুন গণতান্ত্রিক মোড়, তখন দেখি অসংখ্য দরিদ্র, পরিবারকুল এবং প্রকৃত অভাবীবর্গ বঞ্চিত সরকারি সুযোগ-সুবিধা থেকে। একদিকে সরকার যখন দাবি জানাচ্ছে কী শহরে, কী গ্রামে দেশে দরিদ্রের সংখ্যা ক্রমহ্রাসপ্রাপ্ত সংস্কারের কারণে, তখন সরকারি পরিসংখ্যানই জানান দিচ্ছে, দেশে ধনী ও দরিদ্র্যের মধ্যে ফারাক—আয় ও ধন বণ্টন বৈষম্য ক্রমবর্ধমান। উন্নয়নের নামান্তর আধুনিক শিল্পায়ন।

আর সেই শিল্পায়নের একমাত্র উপায় নাকি বিদেশি পুঁজি অথবা দেশি বৃহৎ পুঁজির সন্নিবেশ। নতুন বিনিয়োগ চাইছে এদেশের জমি,প্রাকৃতিক সম্পদ আর সস্তা শ্রম। এর ফলে চতুর্দিকে উঠেছে উচ্ছেদের হিড়িক। মানুষ বিতাড়িত তার জমি থেকে, প্রাকৃতিক সম্পদ থেকে। গণতান্ত্রিক দেশে চালু এক অবাধ লুণ্ঠন। আর এই লুণ্ঠনে তাল জোগাতে ব্যস্ত প্রায় সমস্ত প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দল—কী ডান, কী বাম! কারণ নাকি, এ আসলে উন্নয়ন,যার ফলে সৃষ্টি হবে ব্যাপক কর্মসংস্থান, বাড়বে আয়, জীবনযাত্রার মান! বাস্তব কি তাই বলে? তিন দশকের আর্থিক বৃদ্ধি একপ্রকার কর্মহীন বৃদ্ধি (Jobless growth)। নতুন কর্ম সৃষ্টির সম্ভাবনা দিনের পর দিন সংকুচিত। এর সাথে যুক্ত রাজনৈতিক নেতা আর শিল্পপতিদের লাগামছাড়া দুর্নীতি আর ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করে তার অপব্যবহার। এ ব্যাপরে ডান, বাম প্রতিষ্ঠিত কোনো রাজনৈতিক দলই পিছপা নয়। নয়া উদারনৈতিক যুগে এ-এক অমোঘতা, যার নিয়ন্ত্রণ বাজারের হাতে নেই। বরং দেশের গণতান্ত্রিক কাঠামো আর প্রতিষ্ঠানের প্রতি এতে আছে চূড়ান্ত অবমাননা, যার অর্থ গণতন্ত্রের ভিত্তি যে জনগণ তার অবমাননা। অতএব, সুবিধাভোগী শ্রেণিকে ফুলে-ফেঁপে উঠতে দিয়ে, আপামর সাধারণকে একপ্রকার বঞ্চনার শিকার করে। এই বঞ্চনাই জমতে জমতে যখন একদিন ১৯১৭ সালের রাশিয়ার বলশেভিক বিপ্লবের আকার ভারতে নেবে না, তা কে বলতে পারে?

5.4 সংস্কারের রাজনৈতিক অর্থনীতির দিক

ভারতের অর্থনৈতিক সংস্কারগুলি বিভিন্ন বৃত্তে ভিন্নভাবে আলোচনা করা হয়, যদিও এটি ফান্ড-ব্যাংক প্রবর্তিত প্যাকেজ যা সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং কাঠামোগত সামঞ্জস্য আনার লক্ষ্যে এক পদক্ষেপ এবং এই দুইয়ের সংমিশ্রণ। যে অর্থনীতিবিদরা এই সংস্কারের সমালোচনায় উচ্চকিত ছিল, তারা একে নব্য-উদারনীতিবাদের অর্থনীতি বলে চিহ্নিত করলেন—এটি আসলে উদারীকরণ, বেসরকারীকরণ এবং বিশ্বায়নের (এলপিজি) একটি ত্রিমুখী কৌশল। সরকারি ভাষায় এটি সাধারণ অর্থনৈতিক সংস্কার।

রাজনৈতিক অর্থনীতির পটভূমিতে যে সংস্কারের প্যাকেজটি ১৯৯১ সালে চালু করা হয়েছিল তার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দিয়ে শুরু করা যাক। যখন আমরা ১৯৯১-কে অফিসিয়াল কাট-অফ বছর (বা ওয়াটার-শেড বছর) হিসাবে ব্যবহার করি, তখন দিক্ নির্দেশ অনেক কিছু থেকেই নির্ধারিত হয়েছিল। এর আগে, ১৯৭৩ সালে ইন্দিরা গান্ধী সরকার অল্প-স্বল্প উদারীকরণের পদক্ষেপ নিয়েছিল। তারপর ১৯৮১ সালে ভারতে প্রথম আইএমএফ ঋণের ৫.৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের কথা আলোচিত হয়েছিল, যা এক নতুন গতি দিয়েছিল। ১৯৮০-এর দশকের শেষার্ধে রাজীব গান্ধী সরকার অর্থনৈতিক উদারীকরণের দিকে পা বাড়ালেন। ১৯৮৫ সালে প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী বাজারভিত্তিক সংস্কারের পক্ষে জোর প্রচার ও সওয়াল শুরু করলেন। তখন আমদানি শুল্ক কমানো হয়েছিল শুধু এই ভিত্তিতে যে উচ্চতর প্রযুক্তি ২১ শতকে ভারতের দ্রুত বৃদ্ধির সহায়ক হবে। রাজীব গান্ধীকে স্বাগত জানানো হল। তাকে ভারতে প্রধানমন্ত্রীদের মধ্যে অর্থনৈতিক সংস্কারের প্রধান প্রবক্তা এবং প্রথম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে গণ্য করা হল, যিনি প্রকাশ্যে উদারীকরণের সমর্থন করলেন। তিনি তাঁর রাজত্বের প্রায় শুরুতেই উদারীকরণকে সমর্থন করেছিলেন। তিনি সরকার-ব্যবসায়িক জোট গঠন করার দিকে উদ্যোগী হলেন। তাঁর কাছে তাঁর পিতামহ নেহরুর মতো সমাজতন্ত্র ও সরকারি ক্ষেত্র আর পবিত্র গাভী (Sacred Cow) ছিল না। উত্তর শ্রীলঙ্কায় ভারতীয় হস্তক্ষেপের প্রতিশোধ হিসেবে রাজীব গান্ধীকে হত্যা করা হয়। পি ভি নরসিমা রাও কংগ্রেস পার্টি এবং নতুন কংগ্রেস সরকারের নিয়ন্ত্রণ নেন।

জুলাই ১৯৯১ সালে, ক্ষমতা গ্রহণের একমাস পরে এবং ভারতে তীব্র লেনদেন ব্যালেন্সের সমস্যার সময়, প্রধানমন্ত্রী পি ভি নরসীমা রাও-এর সরকার অর্থনৈতিক নীতির একটা বড়সড় পুনর্বিন্যাস ঘোষণা করেন কারণ রাজকোষ ঘাটতি গগনচুম্বী ছিল, মুদ্রাস্ফীতি দুই অঙ্কে পৌঁছেছিল। লেনদেন ব্যালেন্সের পরিস্থিতিও গুরুতর। বৈদেশিক মুদ্রার ভাণ্ডার দুই সপ্তাহের আমদানির জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ হ্রাস পেয়েছিল, যা ভারতের প্রথম বিদেশি ঋণ খেলাপি হওয়ার হুমকির সম্মুখীন হয়েছিল। রাও-এর অর্থমন্ত্রী, ড. মনমোহন সিং, ১৯৯১ সালের জুলাই মাসে সংসদের নিম্নকক্ষে লোকসভায় অধিকাংশ শিল্প লাইসেন্স-এর প্রয়োজনীয়তা অপসারণের কথা ঘোষণা করলেন। নতুন শিল্পনীতি সরকারি খাতের বিনিয়োগের জন্য সংরক্ষিত শিল্পখাতের সংখ্যা ১৭ থেকে কমিয়ে ৪ করল। ৩৪টি সেক্টরে ইক্যুইটির ৫১ শতাংশ পর্যন্ত বিদেশি বিনিয়োগ মঞ্জুর করা হল। যেমনটি বিদেশি চুক্তির স্বয়ংক্রিয় অনুমোদন ছিল, ঠিক তেমনটি। এছাড়াও, মনমোহন সিং দ্রুত বাণিজ্য প্রতিবন্ধকতা কমাতে শুরু করেন। উপরন্তু, বিদেশি বিনিয়োগকারীদের আমন্ত্রণ জানালেন। সরকার ১৯১১ সালের জুলাইয়ের প্রথম দিকে দুটি বড় অবমূল্যায়ন ঘোষণা করে, যার হার ২০ শতাংশের মতো। ১৯৯১ সালের অক্টোবরে, সরকার ২.১ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের স্ট্যান্ডবাই ঋণের জন্য আইএমএফের সঙ্গে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে। সংক্ষেপে, সরকারের ক্রিয়াকলাপের সাংঘাতিক হ্রাস, শিল্পের বিশাল বিস্তৃতির লাইসেন্স, পারমিট, কোটা রাজ-এর অবসান, শুল্ক হ্রাস এবং বিদেশি বিনিয়োগের জন্য দরজা উন্মুক্ত করা—নেহরু মডেল থেকে এটি একটি নিঃসন্দেহে এক ঐতিহাসিক পশ্চাদপসরণ। এই ১৯৯১ সালটি অভ্যন্তরীণ-মুখী অভিযোজন থেকে বর্হিমুখী অভিযোজন এবং রাষ্ট্র থেকে বাজারনীতিতে ধাবমানের এক ঐতিহাসিক বার্তা।

বিরোধী দলগুলি, ন্যাশনাল ফ্রন্টের বাম দলগুলি এবং বিজেপি অর্থনৈতিক উদারীকরণের বিপক্ষে আক্রমণ করার মতো কোনো অবস্থানে ছিল না। বিকল্প সরকার দিতেও তখন তারা অক্ষম ছিল।

অর্থনৈতিক সংস্কারে রাজনৈতিক চর্চার দিকটি এখানে চিহ্নিত করা যেতে পারে। অনেকে সমালোচনা করে থাকেন যে, ভারত কেন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের কাছে বাজার-ভিত্তিক সংস্কারের জন্য মাথা নোয়ালো—শর্তাধীন ঋন গ্রহণ করে। যখন অন্য অনেক দেশ এই সংস্কার গ্রহণ করে সংকটে পড়েছে। স্বল্পকালীন লেনদেন ব্যালেন্সের মোকাবিলা, করতে গিয়ে কেন ভারত এত বড় সুদূরপ্রসারী নীতির আশ্রয় গ্রহণ করল।

5.5 ভারতে বেসরকারিকরণের উদ্যোগ

সাধারণ অর্থে বেসরকারিকরণ বলতে বোঝায় সরকারি ক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠানগুলির কিছু শেয়ার বা সকল শেয়ার ব্যক্তিগত মালিকানায় স্থানান্তরিত করা। এইভাবে ব্যক্তিগত মালিকানায় আংশিক অথবা সম্পূর্ণ রূপান্তরকে সংকীর্ণ অর্থে বেসরকাকিরণ বলা যেতে পারে। অপরদিকে, ব্যাপক অর্থে বেসরকারিকরণ বলতে সরকারি মালিকানা বজায় রেখে অপর কিছু ব্যবস্থা গ্রহণের কথা উল্লেখ করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, যদি কোনো প্রতিষ্ঠানের সরকারি মালিকানা বজায় রেখেই এই প্রতিষ্ঠানটি কোনো ব্যক্তিগত মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান সরকারকে চুক্তি অনুযায়ী একটি নির্দিষ্ট মুনাফা প্রদান করবে তাহলে এটিও এক ধরনের বেসরকারিকরণ। এক্ষেত্রে সরকারি ক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠানের পরিচালনভার সরকারের হাতে না থেকে বেসরকারি ক্ষেত্রের হাতে চলে যাচ্ছে। বেসরকারি মালিকানার অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মত এই প্রতিষ্ঠানও মুনাফার দিকে দৃষ্টি রেখে পরিচালিত হবে। আবার, সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলির উপর সরকারি মালিকানা বজায় রেখেই তাদের অতিরিক্ত স্বাধীনতা দেওয়া যেতে পারে। সরকারের নিয়ন্ত্রণ থেকে তাদের মুক্ত করে শুধুমাত্র বাণিজ্যিক নীতির

ভিত্তিতেই তাদের পরিচালনা করা হতে পারে। বেসরকারি প্রতিষ্ঠান যেমন শুধুমাত্র লাভ লোকসানের দিকে দৃষ্টি রেখেই তার উৎপাদনের পরিমাণ, বিক্রয়ের পরিমাণ, দামনীতি প্রভৃতি স্থির করে সেরূপ সরকারি ক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠানগুলিও যদি বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পরিচালিত হয় তাহলে তাকেও ব্যাপক অর্থে বেসরকারিকরণ বলা যেতে পারে।

১৯১১ সালের ঘোষিত শিল্পনীতিতে সরকারি ক্ষেত্রের বেসরকারিকরণের দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে। নতুন শিল্পনীতিতে ওই সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রথমত, সরকারি ক্ষেত্রের পরিধি সীমিত করা হয়েছে। শুধুমাত্র আটটি শিল্পকেই সরকারি ক্ষেত্রের জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়েছে। তবে এই শিল্পনীতিতে আরও বলা হয়েছে যে প্রয়োজনে এই আটটি শিল্পের ক্ষেত্রেও ব্যক্তিগত উদ্যোগীদের শিল্পস্থাপনের জন্য অনুমতি দেওয়া হতে পারে।

দ্বিতীয়ত, যে সব সরকারি উদ্যোগ দীর্ঘকাল ধরে রুগ্ন এবং যেগুলিকে লাভজনক ইউনিটে রূপান্তরিত করার কোনো আশা নেই সেগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য Board for Industrial and Financial Reconstruction-এর কাছে মতামতের জন্য পাঠানো হবে। এই বোর্ড ওই সমস্ত রুগ্ন শিল্প নিযুক্ত শ্রমিকদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থাদি গ্রহণ করবে এবং প্রয়োজনে এই উদ্যোগগুলিকে অন্য উদ্যোগের সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়ার ব্যবস্থা করবে। দীর্ঘকালব্যাপী রুগ্ন এইরূপ শিল্পকে বন্ধ করে দেওয়ার প্রস্তাবও করা হয়েছে।

তৃতীয়ত, সরকারি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানগুলিতে জনসাধারণের ব্যাপক অংশগ্রহণের জন্য নির্বাচিত কয়েকটি সরকারি উদ্যোগের শেয়ার ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান, মিউচুয়াল ফাণ্ড, সাধারণ নাগরিক এবং শ্রমিকদের কাছে বিক্রি করা হবে।

চতুর্থত, সরকারি উদ্যোগগুলি যাতে স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে সেজন্য সরকারি উদ্যোগের পরিচালন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সরকারের একটি চুক্তি (Memorandum of Understanding) সম্পাদিত হবে। এই চুক্তির মাধ্যমে সরকারি উদ্যোগগুলির পরিচালন কর্তৃপক্ষের অধিকতর স্বাধীনতা দেওয়া হবে এবং সরকারি উদ্যোগগুলির লাভলোকসানের জন্য পরিচলন কর্তৃপক্ষকেই দায়ি করা হবে।

পঞ্চমত, সরকারি উদ্যোগগুলির পরিচালন বোর্ড পুনর্গঠন করা হবে এবং পেশাদার পরিচালকবৃন্দকে অধিক সংখ্যায় এইসব বোর্ডের সদস্য হিসাবে নিয়োগ করা হবে। ১৯৫৬ সালের শিল্পনীতিতে সরকারি ক্ষেত্রের যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা স্বীকার করা হয়েছিল সেটি এখন নতুন শিল্পনীতিতে পরিত্যাগ করা হয়েছে।

১৯৫৬ সালের শিল্পনীতিতে ১৭টি শিল্পের ভবিষ্যত উন্নয়নের দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে সরকারের হাতে ন্যস্ত ছিল। এছাড়া, আরও ১২টি শিল্পে নতুন উদ্যোগ স্থাপনের দায়িত্বও শুধুমাত্র সরকারের হাতেই ছিল। কিন্তু ১৯৯১ সালের শিল্পনীতিতে সরকারি ক্ষেত্রের এই ভূমিকাকে স্বীকার করা হয়নি। শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো এবং প্রতিরক্ষা দ্রব্যের উৎপাদনের ক্ষেত্রেই সরকারি ক্ষেত্রকে সীমিত রাখা হয়েছে। বেসরকারি ক্ষেত্রের কর্মপরিধি বিস্তৃততর করা হয়েছে। সেই সঙ্গে বিদেশি মূলধন যাতে অবাধে ভারতে প্রবেশ করতে পারে এবং বিদেশি প্রতিষ্ঠানগুলির কাজকর্মের উপর যেন কোনো বিধিনিষেধ না থাকে সেদিকেও দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে। এভাবে দেখা যাচ্ছে ১৯৯১ সালের নতুন শিল্পনীতিতে ব্যাপক অর্থে বেসরকারিকরণ করার নীতিগত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

কিন্তু এই নীতিকে বাস্তবে প্রয়োগ করার কিছু অসুবিধা লক্ষ করা যাচ্ছে।

প্রথমত, ভারতে শক্তিশালী শ্রমিক সংঘ থাকার জন্য অনেক ক্ষেত্রে সরকারকে বেসরকারিকরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেও তা থেকে সরে আসতে হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলা যেতে পারে। স্কুটারস্ ইন্ডিয়া নামে একটি অলাভজনক শিল্প সংস্থাকে বাজাজ অটো লিমিটেডের হাতে তুলে দেওয়ার সরকারি সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয়। কিন্তু INTUC নেতাদের হস্তক্ষেপের ফলে এই প্রস্তাব বাতিল করা হয়। এই ঘটনা থেকে এই শিক্ষা লাভ করা যায় যে, ভারতের মতো গণতান্ত্রিক দেশে শ্রমিকদের স্বার্থ অগ্রাহ্য করে বেসরকারিকরণ করা যাবে না। উন্নত দেশগুলিতে যেমন শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষার জন্য সামাজিক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা চালু আছে ভারতের শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষার জন্য সেইরূপ সামাজিক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা খুবই কম। স্বভাবতই শ্রমিকদের আশঙ্কা বেসরকারিকরণের ফলে শ্রমিক ছাঁটাই হবে।

ফলে, বেসরকারিকরণের ফলেই যে পরিচালন ব্যবস্থার উন্নতি ঘটবে সেটি মনে করার কোনো কারণ নেই। বেসরকারি ক্ষেত্রেও আমরা অনেক রুগ্ন শিল্প দেখতে পাচ্ছি। অনেক ক্ষেত্রে সরকারি সুযোগসুবিধা অর্জনের জন্য বেসরকারি উদ্যোগীরা নিজেদের শিল্প সংস্থাগুলিকে রুগ্ন করে রাখতে আগ্রহী হয়। কাজেই সরকারি সংস্থাগুলির বেসরকারিকরণের ফলে তাদের পরিচালন ব্যবস্থা উন্নত হবে এটি মনে করার কোনো কারণ নেই। কৃষি অর্থমন্ত্রী হনুমন্ত রাও মনে করেন যে, ভারতের অর্থনীতির ক্ষেত্রে যেটি প্রয়োজন সেটি হল বেসরকারিকরণের পরিবর্তে আমলাতন্ত্রীকরণের হ্রাস। ভারতের সরকারি সংস্থাগুলির ব্যর্থতার অন্যতম প্রধান কারণ এগুলির উপর অত্যধিক আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ। আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ যদি হ্রাস করা যায় এবং সরকারি সংস্থাগুলিকে যদি লাভজনক ভিত্তিতে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার দেওয়া হয় তাহলে সরকারি সংস্থাগুলি নিশ্চয়ই লাভজনক সংস্থায় পরিণত হতে পারবে।

5.6 সারসংক্ষেপ

১৯৯১ সালের পর থেকে ভারত সরকার ভারতীয় অর্থনীতিকে অবাধ খোলামেলা এবং অবাধ প্রতিযোগিতামূলক করে তোলার জন্য বাণিজ্য নীতি, শিল্পনীতি, বৈদেশিক মুদ্রা সংক্রান্ত নীতি এবং বিদেশি মূলধন সংক্রান্ত নীতিতে যে সংযোজন, পরিবর্তন ও পরিমার্জন করেছে, তাকেই নয়া আর্থিক সংস্কার বলা হয়। এই নীতির মূল কার্যক্রম তিনটি—উদারীকরণ, বেসরকারিকরণ ও বিশ্বায়ন। উদারীকরণ হল উৎপাদন, বণ্টন, বিনিয়োগ প্রভৃতি ক্ষেত্রে সরকারি নিয়ন্ত্রণ হ্রাস। বেসরকারিকরণ হল রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে সরকারি হস্তক্ষেপ কমিয়ে বেসরকারি মূলধনের প্রবেশ ঘটানো। আর বিশ্বায়ন বলতে বোঝায় কোনো অর্থনীতির সঙ্গে বিশ্ব অর্থনীতির সংযুক্তিকরণ। নয়া অর্থনৈতিক নীতির মৌল উপাদানগুলো হল—(i) উদার বাণিজ্য নীতি, (ii) উদার শিল্পনীতি, (iii) বিদেশি মূলধন সংক্রান্ত উদার নীতি এবং (iv) একচেটিয়া ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণকারী আইনের বিলোপ অথবা সরলীকরণ।

ভারতীয় অর্থনীতিতে সংস্কারের রাজনৈতিক দিকও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যার সম্পর্কে বহু অর্থনীতিবিদরা, এর রাজনৈতিক দিক নিয়েই আলোচনা করেছেন, যেমন প্রণব বর্ধন, মিতু সেনগুপ্ত, রব জেনকিন্স ও আরও অনেকে।

অন্যদিক, ভারতে বেসরকারিকরণ দ্রুত মাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছে। যে সাধারণ পদ্ধতির দ্বারা সরকারি মালিকানা বা পরিচালনাধীন কোনো সংস্থায় বেসরকারি শরিক করা হয়, তাকে বেসরকারিকরণ বলে। বেসরকারীকরণের বিভিন্ন

রূপ হল—বিজাতীয়করণ, যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ, সরকারি সংস্থার অবলুপ্তি ঘটানো। তবে বেসরকারিকরণের ফলে যা উৎপত্তি হয় তা হল : সমাজতন্ত্রের আদর্শ থেকে বিচ্যুতি, শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী ক্রিয়াকর্ম, অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন, ব্যক্তিগত বিত্তশালী শ্রেণির উদ্ভব, জনকল্যাণের প্রতি উপেক্ষা, পরিকাঠামো ক্ষেত্রের অবহেলিত হবার সম্ভাবনা প্রভৃতি।

5.7 অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলি :

1. নয়া আর্থিক সংস্কার বলতে কী বোঝ?
2. নয়া আর্থিক সংস্কার নীতির তিনটি কার্যক্রম উল্লেখ করো।
3. উদারীকরণ কী?
4. বেসরকারিকরণ কী?
5. বিশ্বায়ন কী?
6. নয়া অর্থনৈতিক নীতির মৌল উপাদান কী কী?
7. বিশ্বব্যাঙ্কের কাজ কী?
8. যে পাঁচটি মুদ্রার সাপেক্ষে ভারতীয় মুদ্রার অবমূল্যায়ন ১৯৯১ সালে হয়েছিল, সেই মুদ্রাগুলির নাম কি?
9. লাইসেন্স-পারমিট-কোটা রাজ কী?

মাঝারি উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলি :

1. ১৯৮০-র দশকের শেষের দিকে ভারত কী কী গুরুত্বপূর্ণ সংকটে নিমজ্জিত হয়েছিল?
2. ভারতের অর্থনৈতিক সংস্কারের রাজনীতি সম্পর্কে একটি টীকা লেখ।
3. বেসরকারিকরণ কী? এর বিপক্ষের যুক্তিগুলি লেখো।
4. "অর্থনৈতিক সংস্কারের ধারণাটি একান্তভাবে উদারীকরণ-বেসরকারিকরণ-বিশ্বায়নের ধারণা"—আলোচনা কর।
5. বাজারি দক্ষতা কেন বাজারকে রাষ্ট্রীয় কবল থেকে মুক্ত করে?
6. শ্রম-সংস্কারের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য আলোচনা কর।
7. ১৯৯১-এর সংস্কার কী নেহরুর সমাজতন্ত্রনীতি থেকে সরে এসেছে? তোমার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দেখাও।

দীর্ঘ উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলি :

1. ১৯৯১ সালে চালু হওয়া আর্থিক সংস্কারের মূল লক্ষ্যগুলি কী কী?
2. ভারতের আর্থিক সংস্কার কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে কী কী হয়েছে?
3. ভারতে সংস্কারের পিছনে কী ধরনের রাজনীতির প্রয়োগ হয়েছে?

4. ভারতে আর্থিক সংস্কারের ফলাফল কী হয়েছে?

5.8 গ্রন্থপঞ্জী

- Bardhan, Pranab (1984), *The Political Economy of Development in India*, Oxford and New York : OUP
- Harriss, John (1987), The State in Retreat : Why Has India Experienced Such Half-Hearted Liberalization in the 1980s? *IDS Bulletin 18, no. 4.31-38*
- Jenkins, Rob (1999). *Democratic Politics and Economic Reform in India.* Cambridge, U.K. : Cambridge University Press
- Kumar, Devesh (2004). Ideas and Economic Reforms in India : The Role of International Migration and the Indian Diaspora. In Rob Jenkins and Sunil Khilani edited : *The Politics of India's Next Generation of Economics Reforms.*
- Rodrik, Dani, and Arvind Subramaniam. (2017) From 'Hindu Growth' to Productivity Surge : The Mystry of the Indian Growth Transition. KSG *Wroking Paper* No. RWP64-19 Cambridge Mass : Harvard University.
- Sengupta, Mitu (2004), *The Politics of Market Reform in India : The Fragile Basis of Paradigm Shift*. Ph.D. (Unpublised). University of Toronto.
- Varshney, Ashutosh (1999). Mass Politics or Elite Politics? India's Economic Reforms in Comparative Perspective. Jeffery D Sachs, A Varshney & N. Bajpai (eds). *India in the Era of Economic Reform*, New Delhi : Oxford University Press.

একক 6 ◘ দ্বিতীয় প্রজন্মের সংস্কার এবং এর বাইরে

গঠন

6.1 উদ্দেশ্য

6.2 প্রস্তাবনা

6.3 বিভিন্ন সরকার এবং তাদের রাজনৈতিক ভূমিকা

6.4 পরিকল্পনা যুগের ভাঙ্গন এবং 'নীতি আয়োগ'-এর উত্থান

6.5 এনডিএ সরকারের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক নীতি

6.6 ১৯৯১ সাল থেকে অর্থনৈতিক সংস্কার : কী অর্জিত হয়েছে

6.7 সংক্ষিপ্তসার

6.8 অনুশীলনী

6.9 গ্রন্থপঞ্জী

6.1 উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে জানা যাবে—

- বিভিন্ন সরকার ও তাদের রাজনৈতিক ভূমিকার কথা;
- পরিকল্পনা যুগের ভাঙন এবং 'নীতি আয়োগ'-এর উত্থান;
- এনডিএ সরকারের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক নীতি; এবং
- ১৯৯১ সাল থেকে যে সংস্কার কর্মপদ্ধতি নেওয়া হয়েছে তার থেকে কী অর্জিত হয়েছে।

6.2 প্রস্তাবনা

শুধু রাজনীতির লক্ষ্যের কথা ভাবলে অর্থনৈতিক উন্নতি বাধাপ্রাপ্ত হয়। ভারত স্বাধীন হবার পর থেকেই অর্থনীতি-রাজনীতির ঠোকাঠোকি ভারতে স্বাভাবিক ঘটনা। সরকারের পরিবর্তনে পরিকল্পনা বাতিল হয়েছে, পরিকল্পনা গ্রহণ পিছিয়ে গিয়েছে। আবার যখন-তখন আইনসভা ভেঙে দিয়ে কেন্দ্রে-রাজ্যে স্বাভাবিক সময়ে বাজেট পেশে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয়েছে। দেশের অর্থনীতি এখন এক সন্ধিক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছে। BRICS রিপোর্টে ভারতে অর্থনীতির প্রভূত সম্ভাবনার পাশাপাশি যেসব সমস্যার কথা তুলে ধরা হয়েছে, সেগুলির সুষ্ঠু সমাধান ছাড়া স্থিতিশীল উন্নয়ন (sustainable development) সম্ভব নয়।

অর্থনৈতিক সংস্কার-পরবর্তী যুগে ভারত অর্থনৈতিক সংস্কারের সুফল ও কুফল দুই-ই ভোগ করেছে। স্বাধীনতা পরবর্তী চার দশকের নিম্ন আয়বৃদ্ধির হার বা 'হিন্দু প্রবৃদ্ধি'র হার (যা ১৯৫১ সাল থেকে ১৯৮১ সাল অবধি ৪ হতে ৫ শতাংশের প্রবৃদ্ধি)। অধ্যাপক রাজকৃষ্ণ একে 'হিন্দু প্রবৃদ্ধির হার' নাম দিয়েছিলেন। কেননা, বন্যা, দুর্ভিক্ষ, খরা যাই

হোক না কেন, এই প্রবৃদ্ধির হারের কোনো পরিবর্তন হয়নি। এইসব অতিক্রম করে ভারত যেমন বর্তমানে ৬-৭ শতাংশ উন্নয়ন হারে পৌঁছেছে, তেমনই সরকারি নিয়ন্ত্রণমুক্ত হয়ে শিল্পক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা বাড়িয়েছে। উদার বাণিজ্য নীতির দরুন অর্থনীতির নানা ক্ষেত্রে বিদেশি সহায়তা ও পুঁজিলগ্নি বেড়েছে। রপ্তানি বাণিজ্যের প্রসার বিদেশি মুদ্রার ভাণ্ডার স্ফীত করার পাশাপাশি অর্থনীতিতে নতুন গতির সঞ্চার করেছে; এবং এসবের নীট ফল হিসাবে অর্থনীতিতে উন্নয়ন আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি হয়েছে, যা ক্রমশ উচ্চতর উন্নয়ন হার অর্জনে সাহসী করে তুলেছে।

কিন্তু সংস্কার কিছু খারাপ ফলও এনেছে। WTO চুক্তিজনিত কৃষির অনিশ্চয়তা, নিয়োগহীনতা, শিল্প মন্থরতা, কর্মহীনতা বেড়েছে। ফলে গ্রামীণ দারিদ্র্য ভয়াবহ আকার নিয়েছে। কার্যত আমরা যেন এক নিয়োগহীন প্রবৃদ্ধি (Jobless growth)-এর দিকে ধাবিত হয়ে চলেছি।

এর জন্যই তখনকার সময়ে অর্থনীতিতে সংস্কারেরও সংস্কার প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। এর পোশাকি নাম দ্বিতীয় প্রজন্মের সংস্কার (Second Generation Reform)। এর অঙ্গীভূত হল শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান, পানীয় জল, বনসৃজন, সড়ক সংযোগ এবং পল্লী বৈদ্যুতিকীরণ। বিজলি, সড়ক, পানীয় জল-এর রাজনৈতিক স্লোগানকে অর্থনৈতিক বাস্তবতায় প্রয়োগ করা।

যাই হোক, ১৯৯৮ সালে এনডিএ সরকার প্রথমবার ক্ষমতায় আসে। এরা ক্ষমতায় ২০০৪ সালে অবধি বলবৎ ছিল। তখন ভারতের প্রধানমন্ত্রী ছিল অটল বিহারী বাজপেয়ী। দ্বিতীয়বার ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসকে হারিয়ে ২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদী সরকার ক্ষমতা আসে এবং এখন পর্যন্ত রাজনৈতিক ক্ষমতায় আছে।

এই এককে আমরা বিভিন্ন সরকার এবং তাদের রাজনৈতিক ভূমিকার উল্লেখ করব। তৎসহ আলোচনা করব একবিংশ শতাব্দীতে পরিকল্পনা যুগের ভাঙনের কথা এবং নীতি আয়োগ উত্থান। তাছাড়া এই এককে জানা যাবে ১৯৯১ সাল থেকে যে অর্থনৈতিক সংস্কার নেওয়া হয়েছে, তার ফলাফলইবা ভারতের ক্ষেত্রে কী হয়েছে।

6.3 বিভিন্ন সরকার এবং তাদের রাজনৈতিক ভূমিকা

ভারত তার গণতান্ত্রিক মডেলটি সঠিক অর্জন করেছে, সন্দেহ নেই। তবে সমাজের উন্নতির ক্ষেত্রে সে অনেক পিছিয়ে আছে। সমাজের পরিকাঠামোতেই কিছু নীতিগত ভুল রয়েছে, কারণ এখানে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত জোরালোরূপে কার্যরত। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে, কে নীতি তৈরি করে? পেশাদার সংস্থা, থিঙ্ক ট্যাঙ্ক, রাজনীতিবিদ্, নির্বাচন কমিটি এবং বেসামরিক কর্মচারিরা ভারতে নীতি-নির্ধারণ প্রক্রিয়ায় বেশ প্রভাবশালী গোষ্ঠী। যাই হোক, সবচেয়ে প্রভাবশালী দল এখানে যারা সরকার গঠন করে। ক্ষমতায় কে আছে, তার ব্যাপক প্রভাব থাকে। প্রভাবশালী রাজনৈতিক দলের আদর্শ জাতীয় নীতিতে প্রতিফলিত হয়। এখানে উল্লেখ্য ভারতে যে সমস্ত নেতারা নীতি নির্ধারণ করে তাদের অর্থনীতি সম্পর্কে ধারণা ততটা বলশালী নয়, দু-একজন ব্যতিক্রমী ছাড়া।

আমরা এখানে ভারতীয় রাজনৈতিক আকাশে আবির্ভূত বিভিন্ন সরকার দেশের উন্নতিতে কী করেছে, তারই সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেব :

❑ জওহরলাল নেহরু সরকার

স্বাধীনতার আগে বেশ কিছু বিশৃঙ্খল ও অকাম্য ঘটনা ঘটেছিল—যেমন দেশভাগ, উদ্বাস্তু সমস্যা, নৃশংস হত্যাকাণ্ড

ইত্যাদি। স্বাধীনতার পর পরিস্থিতিকে স্থিতিশীল ও সুসংহত করার জন্য একটি উচ্চ শৃঙ্খলার প্রয়োজন ছিল এবং জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বাধীন মন্ত্রিসভায় উপ-প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল এবং মৌলানা আবুল কালাম আজাদ-এর মতো দৃঢ়নেতারা এটি করতে সক্ষম হয়েছিল। কাজটি সহজ ছিল না। স্বাধীনতার পর নেহরুর প্রথম কৃতিত্ব, তাই, বিভাজন প্রক্রিয়ার উত্তাল জলের মধ্যে রাষ্ট্রের জাহাজকে দৃঢ়ভাবে ধরে রাখা। উইনস্টন চার্চিল এবং অন্যদের ভবিষ্যদ্বাণী সত্ত্বেও যে ব্রিটিশরা চলে যাওয়ার পরে, ভারত বলকানাইজড হবে এবং এক ডজন টুকরো হয়ে যাবে। কিন্তু ভারত জয়ের পথে এগিয়ে যায়। ভারত একটি প্রাণবন্ত সংবিধান, মুক্ত প্রেস, স্বাধীন বিচার ব্যবস্থার পাশাপাশি মৌলিক অধিকার এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের উপর ভিত্তি করে গণতান্ত্রিক রাজনীতিকে অন্তর্ভুক্ত করে একটি প্রাণবন্ত গণতন্ত্র পরিচালনা করতে সক্ষম হয়েছিল এবং স্বাধীনতার পর ভারত যা অর্জন করেছিল তেমন আর কোনো প্রাক্তন ঔপনিবেশিক দেশ পারেনি।

নেহরু যথার্থভাবে ১৪-১৫ আগস্ট, ১৯৪৭ সালে তার বিখ্যাত 'ট্রিস্ট উইথ ডেসটিনি', বক্তৃতায় বলেছিলেন : ''স্বাধীনতা এবং ক্ষমতা দায়িত্ব নিয়ে আসে। দায়িত্ব এই সভার ওপর বর্তায়। স্বাধীনতার জন্মের আগে আমরা যন্ত্রণা সহ্য করেছি এবং এই দুঃখের স্মৃতিতে আমাদের হৃদয় ভারাক্রান্ত। এই যন্ত্রণার কিছু এখনও অব্যাহত আছে। তবুও, অতীত শেষ হয়ে গেছে এবং আলোকিত ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যেতে হবে।''

নেহরুর দ্বিতীয় মহান কাজটি ছিল, বহু শতাব্দীর বিদেশী শাসনের পর, ভারত নিজের জন্য একটি নতুন সংবিধান পেতে, নেহরু গভীর আগ্রহ নিয়েছিলেন। সভাপতিত্ব করেন প্রথম রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ। ডঃ বি. আর. আম্বেদকর খসড়া কমিটির নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। যার মধ্যে ছিলেন বি. এন. রাও এবং আল্লাদি কৃষ্ণস্বামী আইয়ার। সংবিধান ধীরে ধীরে নেহরুর দৃষ্টিভঙ্গির একটি স্পষ্ট ছাপ নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিল, বিশেষত রাষ্ট্রীয় নীতির সামাজিক দিকনির্দেশক নীতিতে। নিজেকে একজন ভালো সাংসদ সদস্য হিসেবে, নেহরু শুধু সংবিধান প্রণয়নেই গভীর আগ্রহ দেখাননি বরং দীর্ঘ সময় ধরে সংসদে উপস্থিত থাকতেন। প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন এবং বিশেষ করে বৈদেশিক সম্পর্ক নিয়ে কথা বলেছেন। সংবিধান অবশেষে ১৯৫০ সালে গৃহীত হয়েছিল এবং একটি উন্নয়নশীল সমাজের প্রয়োজনীয় চ্যালেঞ্জগুলি মোকাবিলায় অসংখ্য সংশোধনীসহ ৭৫ বছর ধরে সময়ের পরীক্ষায় দাঁড়িয়ে রয়েছে।

আরেকটি কৃতিত্ব ছিল, তাঁর নেতৃত্বে ১৯৫৬ সালে রাষ্ট্র পুনর্গঠন কমিশন গঠন যার ফলে সমগ্র জাতির বিপ্লবী পুনর্গঠন হয়। রাজনৈতিক নেতৃত্ব প্রদান করেছিলেন নেহরু। পুনর্গঠনের প্রক্রিয়া আজ অবধি অব্যাহত রয়েছে যেমন তিনটি নতুন রাজ্য— ঝাড়খণ্ড, ছত্তিশগড় এবং উত্তরাখণ্ড-মাত্র কয়েক বছর আগে তৈরি হয়েছিল। ভারতকে অর্থনৈতিকভাবে উন্নতি করতে হলে আমূল পুনর্বিন্যাস করার আহ্বান জানানো হয়েছিল। তৎকালীন সোভিয়েত মডেল বিশেষ করে আমদানি-প্রতিস্থাপন শিল্পায়ন মডেলের জন্য ফেল্ডম্যান মডেল দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়ে তিনি পরিকল্পনা কমিশন গঠন করেন। রাষ্ট্র যে অর্থনীতির 'কমান্ডিং হাইট' ধরে রেখেছে তা নিশ্চিত করার জন্য তার সিদ্ধান্তটি দেরিতে আক্রমণের মুখে পড়েছে, তবে বুঝতে হবে যে এটি ইস্পাত, জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের মতো মৌলিক শিল্পগুলিতে বিশাল সরকারী খাতের ইনপুট না থাকলে রেলপথ, কয়লা এবং ভারতীয় শিল্পের ভবিষ্যৎ বৃদ্ধির জন্য মৌলিক পরিকাঠামো পাওয়া যেত না। এটা সত্য যে পরিস্থিতি পরিবর্তিত হওয়ার সাথে সাথে সমগ্র ব্যবস্থাকে উদারীকরণ করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। প্রকৃতপক্ষে, ২০০৭-০৮ সালের বিশ্বব্যাপী আর্থিক সুনামি এবং কোভিড-১৯ সময়কালের বিরাট হতাশা আবারও প্রমাণ করেছে যে একটি গতিশীল পাবলিক সেক্টর থাকা দরকার।

❑ শাস্ত্রী সরকার (১৯৬৪-৬৬) :

এই কম সময়ের মধ্যেও শাস্ত্রী সরকার কৃষির উন্নতিতে যথেষ্ট কার্যকারী ভূমিকা নিয়েছিল। সবুজ বিপ্লবের প্রবর্তন করে কৃষিতে আমূল সংস্কার করতে সক্ষম হল। ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের এবং স্টোরেজ সিস্টেম-এর প্রবর্তন করে ভারতকে খাদ্যর ক্ষেত্রে আত্মনির্ভর করতে এই সরকার সমর্থ হয়েছিল।

❑ ইন্দিরা গান্ধীর সরকার

তবে এই সত্যকে অস্বীকার করার উপায় নেই যে নেহরুর আমল এবং এর নীতিগুলি ত্রুটিবিহীন ছিল না। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার ৩.৫ শতাংশের মধ্যে আবদ্ধ ছিল এবং ভারত বাকি বিশ্বের থেকে তুলনামূলক ভাবে পিছিয়ে ছিল। তবে ইন্দিরার অর্থনৈতিক নীতি জওহরলাল নেহরুর চেয়ে খারাপ প্রমাণিত হয়েছিল। অর্থনৈতিক নীতির ক্ষেত্রে তিনি নেহরুর কৌশল গড়ে তোলেননি যা লাইসেন্স-কোটা-পারমিট রাজ শিথিল করার দ্বিধাগ্রস্ত প্রচেষ্টা থেকে স্পষ্ট। তিনি ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ করে ব্যক্তিগত আর্থিক শিল্পকে হত্যা করেছিলেন। লাইসেন্স-পারমিট রাজকে সবচেয়ে কঠোর করে বেসরকারী শিল্পকে বশীভূত করেন। তিনি প্রান্তিক আয়কর হার ৯৭ শতাংশে উন্নীত করেছেন যা নিশ্চিত করে যে লাভজনক উদ্রোগ প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করার জন্য কোনো আগ্রহ এবং উৎসাহ অবশিষ্ট নেই। তিনি বেশ কয়েকটি আইন আনেন। তিনি পাইকারি শস্য ব্যবসাকে জাতীয়করণ করেছিলেন, যদিও এটি একটি স্বল্পস্থায়ী দুঃসাহসিক কাজ ছিল। ফলস্বরূপ, ভারত একটি বদ্ধ অর্থনীতিতে পরিণত হয়েছিল। 'গরিবি হটাও' স্লোগান শূন্য প্রমাণিত হলো। তার রাজনৈতিক শাসনে জাতি আরও দরিদ্র হয়ে গিয়েছিল। তবে জনসাধারণের কাছে ব্যাঙ্কিং নিয়ে আসার প্রথম চেষ্টা করেছিলেন ইন্দিরা গান্ধী ৫৩ বছর আগে। যাইহোক, তাঁর শাসন কালে অর্থনৈতিক কর্মক্ষমতা বিশ্বাসযোগ্য ছিল না কারণ অর্থনৈতিক নীতিগুলি বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থে ছিল না, যদিও দরিদ্ররা তাঁকে তাদের ত্রাণকর্তা হিসাবে দেখেছিল এবং ১৯৭১, ১৯৭২ সালে এবং এমনকি জরুরি অবস্থার পরেও তাঁকে এবং কংগ্রেস পার্টিকে ব্যাপক নির্বাচনী সমর্থন দিয়েছিল। তিনি প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন এবং আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ব্যর্থ ছিলেন। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক নীতিগুলি একই স্ট্রিংকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়ে যেখানে দীর্ঘমেয়াদী বাস্তব লক্ষ্য গঠনের অভাব ছিল। লাইসেন্স-পারমিট-কোটা রাজকে তিনি কার্যকরভাবে মোকাবিলা করেননি, যেন তিনি পরিবর্তিত বিশ্ব অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত নন। তার দীর্ঘ মেয়াদ সত্ত্বেও ১৯৬৯-১৯৭৩ এবং ১৯৭৭-১৯৮৪, প্রধানমন্ত্রী হিসাবে এমনকি তার বাবার থেকেও দীর্ঘ, ইন্দিরা গান্ধী বৃহত্তর সমতাবাদী সমাজের অভিমুখে আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন আনার বা সামাজিক ন্যায়বিচারের সাথে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সমন্বয়ের প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে ব্যর্থ হন। অর্থনীতি ও সমাজ বৃহত্তর সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমতার দিকে খুব বেশি অগ্রসর হয়নি।

❑ রাজীব গান্ধী সরকার

১৯৮০ এর দশকের মাঝামাঝি যখন ইন্দিরা গান্ধীর পুত্র এবং নেহরুর নাতি রাজীব গান্ধী (১৯৪৪-১৯৯১), ৩১ অক্টোবর ১৯৮৫-এর রাতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী হন, সেই সময়ে উদারীকরণের বীজ বপন করা হয়েছিল এবং রাজীব গান্ধী ছয়টি 'প্রযুক্তি মিশন' স্থাপনের সুপরিচিত উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন—যেমন, পানীয় জলের মিশন, সাক্ষরতা মিশন, তৃতীয়টি গর্ভবতী মহিলা এবং শিশুদের টিকাদান, চতুর্থটি ছিল দুধ বিপ্লব প্রচার করা এবং সর্বশেষটি শতাব্দীর শেষ নাগাদ দেশের প্রতিটি গ্রামে একটি করে টেলিফোন পৌঁছে দেওয়া। রাজীব গান্ধী মুক্ত উদ্যোগের সমসাময়িক অর্থনৈতিক নীতিগুলি চালু করেন এবং এমনকি প্রয়োজনে সাংবিধানিক সংশোধনী করার পক্ষপাতী ছিলেন। ১৯৮০-এর

দশকে তাঁর শাসনকালে যা পরিবর্তন হয়েছিল তার প্রথমটি ছিল বিশ্ব অর্থনীতির সাথে একীকরণের দিকে একটি পরিবর্তন এবং দ্বিতীয়টি হল প্রযুক্তির উন্নতি। উভয়ই রপ্তানির উৎসাহ এবং স্বীকৃতি যে বিদেশী বিনিয়োগ এবং বিদেশী তৈরি মূলধনী পণ্যের নতুন এবং উন্নত প্রযুক্তির বাহক হিসাবে প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। স্যাম পিত্রোদা, একজন তরুণ মার্কিন প্রশিক্ষিত ভারতীয় টেলিকমিউনিকেশন বিশেষজ্ঞ, প্রযুক্তি মিশনে রাজীবের পার্শ্বচর হন।

তৃতীয়টি বিশ্বাস ছিল যে পুরানো নেহরু সাম্রাজ্যের অবসান ঘটাতে হবে।

❑ পি.ভি. নরসীমা রাও সরকার

১৯৯১-এ পি.ভি. নরসীমা রাওয়ের নেতৃত্বে একটি সংখ্যালঘু সরকার গঠিত হয়েছিল। নরসীমা রাও (১৯২১-২০০৪), ১৯৯১ সালের নির্বাচনী প্রচারে তার দলের নেতাও ছিলেন না। আসলে লোকসভা নির্বাচনে লড়ার টিকিট থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন তিনি! তিনি ড. মনমোহন সিংয়ের মতো অর্থনীতিবিদকে অর্থমন্ত্রী হিসেবে পেয়েছেন। তিনি সিংকে মূল্যবান রাজনৈতিক সমর্থন এবং সুরক্ষা প্রদান করেছিলেন যার খুব প্রয়োজন ছিল। ১৯৯১ সালে অর্থনৈতিক সংস্কারগুলি তাদের যৌথ প্রচেষ্টায় ভারতীয় অর্থনীতিকে চাঙ্গা করে দেয়, বেসরকারী খাতকে পুনরুজ্জীবিত করে। এটি অবশ্যই উল্লেখ করা উচিত যে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে, রাও শিল্পের পোর্টফোলিওতে অধিষ্ঠিত ছিলেন যা শিল্প খাতের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন ধরনের নিয়ন্ত্রণ এবং লাইসেন্সগুলিকে ভেঙে দেওয়ার জন্য পরিবর্তনগুলি শুরু করার জন্য সরাসরি দায়ী ছিল। এটি প্রকৃতপক্ষে সংস্কার কর্মসূচির একটি মূল উপাদান ছিল। পরিকল্পনা কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে রাও সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তাঁর দলের 'পুরাতন' লোকজনকে বোঝান। তার দৃঢ় সমর্থন ও প্রত্যয় ছাড়া সংস্কার অগ্রসর হতে পারত না তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কৃতিত্ব সম্পূর্ণভাবে যায় সেই সময়ের রাওয়ের নেতৃত্বের। শিল্প, বাণিজ্য, বৈদেশিক বিনিয়োগ, বিনিময় হার ব্যবস্থা, ব্যাংকিং, পুঁজিবাজার এবং আর্থিক ও মুদ্রানীতির ক্ষেত্রে সংস্কারের পর প্রবৃদ্ধি বাড়তে শুরু করে। লেনদেন ব্যালেন্সের পরিস্থিতির উন্নতি হয় এবং অর্থনীতিতে আস্থা স্থাপিত হয়।

❑ অটল বিহারী বাজপেয়ী সরকার

১৯৯৬-৯৮ সময়কালে রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়ে যাওয়ার পর, ভারত দুটি ভিন্ন, কিন্তু স্থিতিশীল শাসন দ্বারা শাসিত হয়েছে—ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বাধীন ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্স (১৯৯৮-২০০৪) এবং ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন ইউনাইটেড প্রগ্রেসিভ অ্যালায়েন্স (২০০৪-১৪)।

প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকার ১৯৯৮ সালের মার্চ মাসে বরং কঠিন অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে ক্ষমতায় আসে। বাজপেয়ী অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা এবং অর্থনৈতিক সংস্কারে সরাসরি হাত দিয়েছিলেন। বাণিজ্যমন্ত্রী রামকৃষ্ণ হেগড়ে এপ্রিল ১৯৯৮ সালে তথাকথিত দ্বিতীয় প্রজন্মের অর্থনৈতিক সংস্কারের উদ্বোধন করেন। সরকার বেসরকারি শিল্প প্রতিষ্ঠার দিকে এবং বিদ্যুৎ ও টেলিযোগাযোগে প্রতিযোগিতার দিকে একটি পদক্ষেপ নিয়েছে। এবং কর ব্যবস্থাকে যৌক্তিক করার চেষ্টা করার জন্য আরও পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও তার প্রধান প্রকল্পগুলি ছিল জাতীয় সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প এবং প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা।

তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল অফিসে তার মেয়াদের শেষের দিকে ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের পুরো ইতিহাসে অর্থনীতির বেশ উন্নতি হয়েছিল। ২০০৩-০৪ অর্থবছরের মাঝামাঝি সময়ে, ভারতীয় অর্থনীতির শক্তিশালী প্রবৃদ্ধি হয়েছিল। তা ছাড়া,

এসময় ভারতের কোনো বৈদেশিক মুদ্রার সীমাবদ্ধতা ছিল না। জিএনপি প্রবৃদ্ধি ও রপ্তানির ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী সরকারের তুলনায় অর্থনৈতিক কর্মক্ষমতা ভালো ছিল।

❑ মনমোহন সিং সরকার

ডঃ মনমোহন সিং (১৯৩২-) অর্থমন্ত্রী হিসাবে নতুন অর্থনৈতিক নীতির নেতৃত্ব দেন। তিনি ভারতীয় অর্থনীতিতে পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন এবং সংস্কারের বিশদ বিবরণ প্রদান করেন। তিনি যখন প্রধানমন্ত্রী হন, তখন ভারত তার ইতিহাসে সর্বোচ্চ বৃদ্ধির হার দেখেছিল, গড় ৭.৭ শতাংশ ছিল যা ভারতকে প্রায় দুই ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতিতে পরিণত করে।

ভারত সম্পর্কে ডঃ সিংয়ের ধারণার মূলে ছিল শুধু উচ্চ প্রবৃদ্ধি নয়, অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধির বিশ্বাস এবং একটি জোয়ার যা সমস্ত নৌকাকে উন্নীত করবে। এই বিশ্বাসটি বিল পাসের মধ্যে নিহিত ছিল যা নাগরিকদের আইনগত খাদ্যের অধিকার, শিক্ষার অধিকার, কাজের অধিকার এবং তথ্যের অধিকার এবং NREGA নিশ্চিত করেছে। ডঃ সিংয়ের অধিকার-ভিত্তিক বিপ্লব ভারতীয় রাজনীতিতে একটি নতুন যুগের সৃষ্টি করেছিল।

❑ নরেন্দ্র মোদী সরকার

নরেন্দ্র মোদী ৩০ মে ২০১৯ তারিখে ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন, অফিসে তাঁর দ্বিতীয় মেয়াদের সূচনা হয়। শ্রী মোদী এর আগে ২০১৪-২০১৯ পর্যন্ত ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

নরেন্দ্র মোদীর জন ধন অ্যাকাউন্ট, ২০১৬ সালে বিপর্যয়কর বিমুদ্রাকরণ নীতি, ডিজিটাল পেমেন্ট উদ্যোগ, ইউনিফায়েড পেমেন্ট ইন্টারফেস (ইউপিআই), ব্যাঙ্কিং সেক্টরের সংস্কার, দেউলিয়া এবং দেউলিয়াত্ব কোড, স্ট্রেসড অ্যাসেটের ঘোষণা, ক্রমবর্ধমান এনপিএ, রেজোলিডশন মেকানিজম, সরাসরি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে ভর্তুকি প্রদান, মাইক্রো ইউনিট ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড রিফাইনান্স এজেন্সি লিমিটেড (মুদ্রা ঋণ), কৃষি ঋণ মকুব—সবই এই সত্যটি নির্দেশ করে যে ব্যাঙ্কগুলি হল মূল ক্ষেত্র যার চারপাশে মোদি সরকার তার অর্থনৈতিক নীতিগুলি পরিচালনা করতে চায়। তার অর্থনৈতিক নীতিগুলি সমগ্র দেশকে সমস্যায় ফেলেছে এবং ডিমোনিটাইজেশন এবং কোভিড-১৯-এর আনাড়ি অব্যবস্থাপনার ফলে, ভারত তার অগ্রগতির যাত্রায় এক দশক এবং দুই বছর হারিয়েছে, যেমনটি ১৯৯২-২০০২ সময়কালে জাপানের অভিজ্ঞতায় ঘটেছিল। মোদী দ্বারা ভারতীয় অর্থনীতি এবং দরিদ্রদের উপর অভূতপূর্ব ক্ষতি অপূরণীয় বলে মনে করা হচ্ছে। ২৪শে মার্চ, ২০২০-এ লক ডাউনের আদেশের পর অবিলম্বে অভিবাসী শ্রমিক সহ ১২০ মিলিয়নেরও বেশি লোক তাদের চাকরি এবং আয় হারিয়েছে। এবং দেশের ১.৩৮ বিলিয়ন জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক দরিদ্র হয়েছে, অনেকে অনাহারের স্তরের কাছাকাছি পৌঁছেছে। পরিস্থিতি মোকাবিলায় সরকারি স্বাস্থ্য খাতের অক্ষমতার কারণে অনেকের মৃত্যু হয়েছে। মোদী সরকারের স্বাস্থ্য ব্যয়, জিডিপির শতাংশে ভারতের জন্য সর্বনিম্ন একটি, এবং জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থা দীর্ঘস্থায়ীভাবে বিপর্যস্ত। বরং, গণতন্ত্র নিয়ে কাজ করা অন্যদের তুলনায় ভারতে গণতন্ত্রের সংকট বড় আকার ধারণ করছে। সুইডিশ ডেমোক্রেসি রিপোর্ট ভারতের জন্য গণতন্ত্র সূচকে একটি বড় পতন দেখায়। তাই প্রশ্ন জাগে, অদূর ভবিষ্যতে গণতান্ত্রিক পুনর্জাগরণের জন্য ভারতের কাছে কি কোনো আশা আছে? উত্তরটি ইতিবাচক হবে যদি একটি কার্যকর এবং সু-সমন্বিত দৃঢ় এজেন্ডা নিয়ে অর্থনীতি, রাজনীতি এবং সমাজের প্রতিটি ফ্রন্টে কিছু অভাবনীয় পুনর্নির্মাণ আসে।

কৃষি হল আরেকটি ক্ষেত্র যেখানে মোদী সরকার অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছে, যদিও সবই সঠিক পথে নয়। জলের অভাব, বন্যা, জলবায়ু পরিবর্তন ইত্যাদি সহ কৃষির অনেক সমস্যা রয়েছে। কৃষকদের সাহায্য করার জন্য প্রত্যেককে আলাদাভাবে উপস্থিত থাকতে হবে। কৃষি ঋণ মুকুব খুবই সামান্য এবং কৃষি ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট খাতে দুর্দশা দূর করার জন্য যথেষ্ট নয়। এমনকি মেক ইন ইন্ডিয়াও পুরোপুরি টেক অফ করেনি। শিল্পের অবস্থাও আশানুরূপ নয়।

মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান গ্যারান্টি আইন (MGNREGA) এবং স্বচ্ছ ভারত মিশন (SBM) এর দিকে নজর দেয় মোদী সরকার। উভয় স্কিমই বিপুল পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছে এবং সন্দেহজনক ফলাফল দেখা গেছে। তা সত্ত্বেও দুই রাজনৈতিক নেতার শীর্ষ অগ্রাধিকার, কংগ্রেস সভাপতি সোনিয়া গান্ধী ব্যক্তিগতভাবে MGNREGA-এর প্রতি তার সময় এবং মনোযোগ নিয়োগ করেছেন। এবং পিএম মোদি ব্যক্তিগতভাবে SBM-কে পর্যবেক্ষণ করেছেন। তারপরও উভয় ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্পের ফলাফল সন্তোষজনক থেকে অনেক দূরে।

কর্মসংস্থান সেক্টরে মিশ্র ফলাফল দেখা গেছে। যেখানে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে, সেখানে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বেড়েছে। এটি একটি উদীয়মান অর্থনীতির জন্য স্বাভাবিক যেখানে লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রতি বছর শিক্ষিত হচ্ছে এবং স্নাতক হচ্ছে। কিন্তু, এক দশকেরও বেশি সময় ধরে কোনো চাকরির তথ্য তৈরি না হওয়ায়, বেকারত্ব নিয়ে রাজনৈতিক চাপাচাপি অব্যাহত রয়েছে।

❑ উপসংহার

আজকের ভারতে রাজনীতি সত্যিই দুঃখজনক জায়গায় এসেছে। স্থূল বাস্তবতা হলো, এখানে প্রতারণামূলক সুবিধাবাদ ও প্রতারণা ছাড়া আর কিছুর অবকাশ নেই। তিলক, শ্রী অরবিন্দ, গান্ধী এবং নেহরুর মতো উচ্চাভিলাষী ব্যক্তিত্বদের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে যে রাজনৈতিক উত্তরাধিকার আমরা পেয়েছি তা সম্পূর্ণরূপে বাষ্প হয়ে গেছে। যদি তাই হয়, তবে সর্বনাশ। তাহলে আদর্শ ও অখণ্ডতার প্রতি একটি নির্দিষ্ট অঙ্গীকার ছাড়া আমাদের পক্ষে কীভাবে একটি মহান আত্মনির্ভর ভারত গড়ে তোলা সম্ভব?

ভারতের স্বাধীনতার ৭৫ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে এবং ভারত তার আজাদি কা অমৃত মহোৎসব উদযাপনের মর্যাদা অর্জন করেছে। ইতিমধ্যে ভারত অর্থনীতি, সমাজ এবং পরিবেশের ক্ষেত্রে দীর্ঘ বছর ধরে অনেকগুলি বাস্তব সাফল্যের সাক্ষী হয়েছে, সন্দেহ নেই। বৃদ্ধির হার ত্বরান্বিত হয়েছে, যদিও সাম্প্রতিক বছরগুলিতে মহামারী কোভিড-১৯ এর কারণে প্রবৃদ্ধির হার খুব ধীর ছিল; উদারীকরণ এবং ডি-লাইসেন্সিং প্রতিযোগিতা বাড়িয়েছে, দক্ষতা উন্নত করেছে এবং খরচ কমিয়েছে; বিনিয়োগ এবং সঞ্চয় ভালো অগ্রগতি দেখিয়েছে; রপ্তানি বৃদ্ধি পেয়েছে; এবং বৈদেশিক দক্ষতা উন্নত করেছে এবং খরচ কমিয়েছে; এবং বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ এপ্রিল-জুন ২০২১-এর মধ্যে ৩৪.১ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে। এর সাথে, সামাজিক বিজ্ঞানের অন্যান্য সমস্ত ক্ষেত্রে গবেষণা এবং ফলাফলের ক্ষেত্রে দুর্দান্ত পরিবর্তন হয়েছে। অস্বীকার করার উপায় নেই যে ভারতের সাহসী পদচিহ্ন বিশ্বকে মন্ত্রমুগ্ধ করেছে। কিন্তু সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জগুলি এখনও বিকাশমান ভারতে বড় আকার ধারণ করেছে।

একটি স্বাধীন জাতি হিসেবে অর্থনৈতিক নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে দেশটি প্রধানত দরিদ্র, কৃষি ও গ্রামীণ, প্রায় সম্পূর্ণ অশিক্ষিত এবং করুণভাবে অপুষ্টির শিকার যাকে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী 'জাতীয় লজ্জা' হিসেবে বিবেচনা করেছিলেন।

কিন্তু অন্ধকার অবস্থার বাইরে যেতে এখনও অনেক মাইল বাকি। ভারত বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম গরীব দেশ। কৃষিতে নির্ভরশীল জনসংখ্যার প্রায় ৫০ শতাংশ। ম্যানুফ্যাকচারিং সত্যিই টেক-অফ করেনি। অর্থনীতিতে এখনও বেশ অন্তর্মুখী চেহারা। আমাদের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ শিশু অপুষ্টিতে ভুগছে। অর্থনীতি এখনও মাত্র ৩ ট্রিলিয়ন ডলার শক্তিশালী, যেখানে চিনা অর্থনীতি ১৫ ট্রিলিয়ন ডলারে পাঁচ গুণ বড়। আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে ১৯৭০-এর দশকে ভারত ও চিন প্রায় একই স্তরে ছিল।

স্পষ্টতই আমরা আরও ভাল করতে পারতাম। আমরা সম্ভবত আমাদের শাসনের গণতান্ত্রিক মডেলটি সঠিক পেয়েছি কিন্তু সমাজের সমাজতান্ত্রিক প্যাটার্নের অর্থনৈতিক মডেল সুবিধা করতে পারেনি। আর বেশ কিছু পলিসি আছে যা ভুল বা সাবঅপ্টিমাল বলে প্রমাণিত হয়েছে। আমরা আমাদের অর্থনৈতিক নীতিনির্ধারণী থেকে মূল্যবান শিক্ষা নিতে পারিনি।

6.4 পরিকল্পনা যুগের ভাঙন এবং 'নীতি আয়োগ'-এর উত্থান

সেই ১৯৫১ থেকে চলে আসা ভারতের পরিকল্পনাগুলি তার সঠিক রূপায়নে ব্যর্থ হয়েছে এই যুক্তিতে একটা বিকল্প উপায় খুঁজে বার করার চেষ্টা হল একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক কেটে যাওয়ার পর। যে সমস্ত মৌলিক কারণে পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়েছে তার কারণ অনুসন্ধান করলে বলা যাবে (১) অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ অনেক দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করেছে; (২) পরিকল্পনা করতে হলে সঠিক তথ্যের দরকার, যার সম্পর্কে পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ দক্ষতার পরিচয় দিতে পারেনি; এবং (৩) যে সমস্ত এজেন্সির মাধ্যমে তারা পরিকল্পনা রূপায়ণ করে, তাদের এই সমস্ত কাজে দক্ষতার অভাব ছিল। ফলে ভারতে পরিকল্পনা সম্পর্কে যথেষ্ট মোহভঙ্গ হয়েছে। অনেক অর্থনীতিবিদ ভারতের পরিকল্পনা ভেঙে দেওয়ার জন্য সুপারিশও করেছিলেন। এই চিন্তার সঙ্গে সহমত হয়ে বর্তমানে বিজেপি সরকার ২০১৫ সালের ১ জানুয়ারি ভারতের পরিকল্পনা কমিশনের পরিবর্ত বা বিকল্প হিসেবে NITI (National Institute for Transforming India) Aayog স্থাপন করে। পরিকল্পনা কমিশনের ন্যায় এরও সভাপতি হলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্রমোদী। অর্থনীতিবিদ অরবিন্দ পানাগাড়িয়া ছিলেন এর প্রথম সহসভাপতি। তিনি এই পদে কাজ করেছিলেন জানুয়ারি ২০১৫ থেকে আগস্ট ২০১৭ অবধি। ২০২১ সালে এর সহ-সভাপতি নিযুক্ত হন রাজীব কুমার। দ্বাদশ পরিকল্পনা (২০১২-১৭) ছিল ভারতের পরিকল্পনা কমিশন দ্বারা রচিত শেষ পঞ্চবর্ষ পরিকল্পনা। এখন এই নীতি আয়োগের প্রবর্তনের কারণ হিসেবে অনেকে বলে থাকেন যে ৬৫ বছর ধরে চলে আসা আগের পরিকল্পনাসমূহ বিশ্বায়িত অর্থনীতিতে একেবারেই কাজ করে না। নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতির ক্ষেত্রেই এটি চলে—বর্তমান ভারতের পরিপ্রেক্ষিতে নয়।

নীতি আয়োগ যে সব ব্যবস্থার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছে তা হল : সহযোগিতামূলক যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা গড়ে তোলা; শক্তিশালী অঙ্গরাজ্যগুলি মিলে শক্তিশালী জাতি গঠন করা; গ্রামস্তরভিত্তিক পরিকল্পনার সমষ্টিগত রূপ নির্ণয় করা; সরকারের নীতি নির্ধারণে অঙ্গরাজ্যগুলিকে সামিল করা; নীচের স্তর থেকে ওপরের স্তর পর্যন্ত এক পদ্ধতি গ্রহণ করা; রাজ্যগুলির হাতে বেশি নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা থাকা এবং অনেক নীতি তৃণমূল স্তরেও নির্ধারিত করা।

6.5 এনডিএ সরকারের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক নীতি

এখানে আমরা প্রথম এনডিএ (National Democratic Alliance) সরকারের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক নীতি

আলোচনা করব।

ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮ সালে নতুনভাবে নির্বাচন হল, যাতে বিজেপি-পরিচালিত NDA সরকারের উত্থান হল। অটল বিহারী বাজপেয়ী মার্চ ১৯৯৮ সালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন। বিজেপি তখন দল হিসেবে নিজেদের সংগঠিত, নিয়মশৃঙ্খলায় আস্থাবান, সৎ এবং দেশের উন্নতির জন্য উৎসর্গীত প্রাণ বলে দাবি করল। (পরবর্তী সময়ে ইন্ডিয়া সাইনিং (India Shinning) তাদেরই স্লোগান ছিল।

কঠোর অর্থনৈতিক পরিস্থিতি তখন। বাজপেয়ী অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা এবং অর্থনৈতিক সংস্কারে সরাসরি হাত দিলেন। তাঁর বাণিজ্যমন্ত্রী রামকৃষ্ণ হেগড়ে এপ্রিল ১৯৯৮ সালে তথাকথিত দ্বিতীয় প্রজন্মের অর্থনৈতিক সংস্কারের উদ্বোধন করলেন। সরকার বেসরকারি শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য এবং বিদ্যুৎ ও টেলিযোগাযোগ প্রতিযোগিতার জন্য এক দৃঢ় পদক্ষেপ নিল এবং কর ব্যবস্থাকে সরলীকরণের দিকে ধাবিত হল। এ ছাড়াও বিভিন্ন প্রকল্প নেওয়া হল যেমন : জাতীয় সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প ও প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা। তবে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল : অফিসে বাজপেয়ীর মেয়াদ শেষের দিকে ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের পুরো ইতিহাসে অর্থনীতির বেশ উন্নতি হয়েছিল। ২০০৩-০৪ এর মাঝামাঝি সময় ভারতীয় অর্থনীতির প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধি হয়েছিল। বৈদেশিক মুদ্রা পর্যাপ্ত ছিল। জিএনপি-এর প্রবৃদ্ধি ও রপ্তানির ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী সরকারকে ছাপিয়ে গিয়েছিল। অর্থমন্ত্রী যশবন্ত সিনহা অর্থমন্ত্রী হওয়ার পরে ঘোষণা করলেন যে ১৯৯০-৯১ এর সংস্কার ঠিক পথেই আছে। উপরন্তু তিনি বহুজাতিক সংস্থাগুলিকে বিজেপি-এর অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদ (economic nationalism) নিয়ে ভয় পেতে বারণ করলেন।

এই NDA দল রাজনৈতিক ভাবে ক্ষমতায় আসার ফলে কিছু কট্টর দল, যেমন বিশ্ব হিন্দু পরিষদ (VHP), বজরং দল এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (RSS) ভেবেছিল যে এই রাষ্ট্রীয় শক্তি কাজে লাগিয়ে তাদের দীর্ঘদিনের ইচ্ছা ভারত হিন্দু রাষ্ট্র হোক, এই ইচ্ছা তাদের পূরণ হবে। এর পরের ইতিহাস আমাদের জানা।

6.6 ১৯৯১ সাল থেকে অর্থনৈতিক সংস্কার : কী অর্জিত হয়েছে?

আইএমএফ ও বিশ্বব্যাঙ্কের শর্তে ভারতে শুরু হয়েছিল ব্যাপক অর্থনৈতিক সংস্কার। ভারতবর্ষে সেই সংস্কার প্রক্রিয়ার জোর কদমের সূচনা হল ১৯৯১ সালে। তারপর প্রায় তিন দশক-এর বেশি সময় পার হয়ে ভারত ৩২ বছরে পদার্পণ করল।

জনতা দল এবং বাম দলগুলির সমলোচকরা আইএমএফএর ঋণ নেওয়ার জন্য ১৯৮১ সালে কংগ্রেস (ইন্দিরা) সরকারকে গালমন্দ করেছিল এই যুক্তিতে যে এটি ভারতকে তার অর্থনৈতিক স্বাধীনতা থেকে দূরে রাখবে এবং জনগণকে বেকারত্ব এবং ক্রমবর্ধমান মূল্যবৃদ্ধির দিকে ঠেলে দেবে। ভারতের বয়োজ্যেষ্ঠ কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী), বা সিপিএম নেতা ই.এম.এস নাম্বুদিরিপাদ তখন মন্তব্য করেছিলেন,—একজন তৃষ্ণার্ত মানুষ যেমন বিষের পেয়ালা পান করে, কংগ্রেস সরকার (ইন্দিরা) তাই করেছে। এমন কোনো বিকল্প নেই, যা দিয়ে তিনি তার তৃষ্ণা মেটাতে পারেন।

যা হোক, দীর্ঘকাল যে ভারত ৩ শতাংশের প্রবৃদ্ধির হারে আটকে গিয়েছিল, তার অবসান সংস্কারের ফলেই এসেছে এবং ২০০৮-০৯-এর বিশ্ব অর্থব্যবস্থায় বিপর্যয়ের ধাক্কা সামলে নিয়েছিল মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই।

আমাদের দারিদ্র্য কী কমেছে? সরকারি হিসাবে যথেষ্টই কমেছে, বেসরকারি সমীক্ষা ও গবেষণা বলে যে, কমলেও যথেষ্ট কমেনি। একটি উদাহরণ দিই। সরকারি পরিসংখ্যানই বলছে যে ১৩টি রাজ্যে (অরুণাচল প্রদেশ, আসাম, বিহার,

মধ্যপ্রদেশ, মণিপুর, মেঘালয়, মিজোরাম, উড়িষ্যা, সিকিম, ত্রিপুরা, উত্তরপ্রদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গ) গ্রামীণ জনসংখ্যার ২৫ শতাংশ থেকে ৪৭ শতাংশের মধ্যে দারিদ্র্য সীমার নীচে বাস করে। শহরাঞ্চলে দারিদ্র্য যতটা কমেছে, গ্রামাঞ্চলে উন্নতি তার চেয়ে অনেকটাই কম। এই অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির মূল কারণ হল, সংস্কার প্রক্রিয়া। প্রক্রিয়া শিল্প, বাণিজ্য ও বিশেষত পরিষেবার ক্ষেত্রে যতটা সফল হয়েছে, কৃষিতে তার ভগ্নাংশও নয়, আর ভারতের গ্রামবাসী মানুষের অধিকাংশ জীবিকার জন্য এখনও মূলত কৃষির উপরই নির্ভরশীল। চিনের শিল্পনীতি যেহেতু ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পকে গ্রামাঞ্চলেও প্রসারিত করে দিতে পেরেছে তাই সেখানে দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সাফল্য এসেছে। প্রধান প্রধান খাদ্যশস্যের ক্ষেত্রে চৈনিক কৃষিতে একর প্রতি উৎপাদনও ভারতের প্রায় ২$^{১}/_{২}$ গুণ। তাতে দারিদ্র্যের প্রকোপ চিনে যে কম হবে, এটা বলাই বাহুল্য।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রকাশিত তথ্য থেকেও দেখা যাচ্ছে যে, ১৯৬০-৬১ থেকে ২০১৬-১৭ সময়কালে ভারতের প্রধান ১৫টি রাজ্যের মধ্যে বিহার দরিদ্রতম রাজ্য, আর হরিয়ানা, পাঞ্জাব, মহারাষ্ট্র হল ধনী রাজ্য। ২০০৫-০৬ থেকে ২০১৬-১৭ সালের সময়কালে বিহারের মাথাপিছু আর ধনীতম রাজ্যের মাথাপিছু আয়ের তুলনায় অধিকাংশ বছরে এক পঞ্চমাংশেরও কম। এছাড়া, ভারতের প্রধান ১৫টি রাজ্যের মধ্যে তিনটি পিছিয়ে পড়া রাজ্য হল বিহার, উত্তরপ্রদেশ এবং মধ্যপ্রদেশ। এই তিনটি রাজ্যের বৃদ্ধির হার থেকে দেখা যাবে যে, সর্বভারতীয় বৃদ্ধির হারের চেয়ে এদের বৃদ্ধির হার অন্তত দশম পরিকল্পনা পর্যন্ত উল্লেখযোগ্যভাবে কম (সারণি ৬.১ দ্রষ্টব্য)। শুধুমাত্র একাদশ পরিকল্পনায় বিহার ও উত্তরপ্রদেশের বৃদ্ধির হারে উন্নতি ঘটেছে। কিন্তু এটি উল্লিখিত রাজ্য দুটির বিভাজনের দরুন তথ্যগত ত্রুটির ফল বলে অনেকে মনে করেন। যদি রাজ্যগুলির জীবনযাত্রার মান সম্পর্কে ধারণা পাবার জন্য তাদের মানব উন্নয়ন সূচক (Human Development Index বা HDI) বিবেচনা করা হয়, তাহলেও দেখা যাচ্ছে যে তাদের সার্বিক উন্নয়নের হারে বিপুল পার্থক্য রয়েছে। (পরবর্তী পৃষ্ঠায় সারণি ৬.২ দ্রষ্টব্য)।

সারণি ৬.১

নির্বাচিত কয়েকটি অনগ্রসর রাজ্যের তুলনামূলক বৃদ্ধির হার (শতকরা বার্ষিক)

রাজ্য/দেশ	অষ্টম পরিকল্পনা (১৯৯২-৯৭)	নবম পরিকল্পনা (১৯৯৭-২০০২)	দশম পরিকল্পনা (২০০২-০৭)	একাদশ পরিকল্পনা (২০০৭-১২)
বিহার	২.২	৪.০	৪.৭	১২.১
উত্তরপ্রদেশ	৪.৯	৪.০	৪.৬	৬.৯
মধ্যপ্রদেশ	৬.৩	৪.০	৪.৩	৮.৯
ভারত	৬.৫	৫.৬	৭.৬	৭.৫

সূত্র : *Twelfth Five Year Plan, 2012-17, Planning Commission of India*

এই সারণি থেকে দেখা যাচ্ছে, যে ১৯৮১ থেকে ২০১৯ এই প্রায় ৪০ বছরে বিহার, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান ও মধ্যপ্রদেশের HDI-এ বিশেষ উন্নতি ঘটেনি। ১৯৮০-র দশকে আশিস বোস এদের 'বিমারু' রাজ্য বলেছিলেন (BIMARU : Bihar, Madhya Pradesh, Rajasthan and Uttar Pradesh)। হিন্দিতে 'বিমার' কথার অর্থ হল 'পীড়িত' বা 'অসুস্থ'। এই রাজ্যগুলির অসুস্থতা বোঝাতেই সম্ভবত তিনি 'বিমারু' শব্দটি তৈরি ও ব্যবহার করেন। দেখা যাচ্ছে, দীর্ঘ পরিকল্পনাকালে এদের সুস্থতা বা সবলতা অর্জিত হয়নি। এক কথায়, ভারতের পরিকল্পাগুলি আঞ্চলিক বৈষম্য দূর করতে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছে।

আরও কতকগুলি তথ্য ভারতের নিদারুণ দারিদ্র্যকেই প্রকাশ করেছে। যেমন, বিশ্বে দীর্ঘস্থায়ী খিদের সমস্যায় ভুগছে এমন লোকেদের মধ্যে এক-চতুর্থাংশ ভারতে বাস করে। ২০১৪-১৬ সালে ভারতের প্রতি ৭ জনে একজন অপুষ্টিতে ভুগত। ২০১২-১৬ সময়কালে ৫ বছরের কম বয়স্ক শিশুদের ৩৮.৪ শতাংশ ছিল বয়সের অনুপাতে বেঁটে (stunted)। ওই সময়কালে পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের ২১ শতাংশের ওজন ছিল উচ্চতার তুলনায় কম (wasted)। ২০১৫ সালে পাঁচ বছরের কম বয়সের শিশুদের মৃত্যুর হার ছিল ৪.৮ শতাংশ ইত্যাদি। বোঝা যাচ্ছে, ভারত সরকার সামাজিক ন্যায় ও মানব উন্নয়নের দিকটি অবহেলা করেছে। তাই ভারতীয় অর্থনীতির এ ধরনের উন্নয়নকে UNDP 'jobless', 'rootless', 'voiceless'এবং 'futureless' বলে অভিহিত করেছে। এই তথ্যগুলি বিশেষভাবে নির্দেশ করে যে, ভারত সর্বহিতকর বা সমভাগী বিকাশ (inclusive growth) অর্জনে পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে। আন্তর্জাতিক তুলনায় বিষয়টিকে আরও প্রকট করে তুলবে মাত্র।

সারণি ৬.২

ভারতের নির্বাচিত কয়েকটি রাজ্যে মানব উন্নয়ন সূচক (HDI) : ১৯৮১-২০১৯

রাজ্য	HDI 1981	Rank	HDI 2001	Rank	HDI 2019	Rank
কেরালা	০.৫০০	১	০.৬৩৮	১	০.৭৮২	১
পাঞ্জাব	০.৪১১	২	০.৫৩৭	২	০.৭২৪	২
তামিলনাড়ু	০.৩৪৩	৭	০.৫৩১	৩	০.৭০৯	৩
মহারাষ্ট্র	০.৩৬৩	৩	০.৫২৩	৪	০.৬৯৭	৫
হরিয়ানা	০.৩৬০	৫	০.৫০৯	৫	০.৭০৮	৪
গুজরাত	০.৩৬০	৪	০.৪৭৯	৬	০.৬৭২	৭
কর্ণাটক	০.৩৪৬	৬	০.৪৭৮	৭	০.৬৮৩	৬
পশ্চিমবঙ্গ	০.৩৪৫	৮	০.৪৭২	৮	০.৬৪১	৯
রাজস্থান	০.২৫৬	১২	০.৪২৪	৯	০.৬২৮	১০
অন্ধ্রপ্রদেশ	০.২৯৮	৯	০.৪১৬	১০	০.৬৪৯	৮
ওড়িশা	০.২৬৭	১১	০.৪০৪	১১	০.৬০৬	১২
মধ্যপ্রদেশ	০.২৪৫	১৪	০.৩৯৪	১২	০.৬০৩	১৩
উত্তরপ্রদেশ	০.২৫৫	১৩	০.৩৮৮	১৩	০.৫৯৬	১৪
আসাম	০.২৭২	১০	০.৩৮৬	১৪	০.৬১৩	১১
বিহার	০.২৩৭	১৫	০.৩৬৭	১৫	০.৫৪৭	১৫
ভারত	**০.৩০২**		**০.৪৭২**		**০.৬৪৫**	

টীকা : *রাজ্যগুলিকে HDI-2001-এর মানের ভিত্তিতে অধঃক্রমে সাজানো হয়েছে।*

সূত্র : *১৯৮১ ও ২০০১ সালের ক্ষেত্রে National Human Development Report (২০০১) এবং ২০১৯ সালের ক্ষেত্রে Wikipedea : em.m.wikipedia.org*

জাতীয় আয়ে কৃষি, শিল্প ও পরিষেবা এই তিনের আপেক্ষিক অবদান সাধারণভাবে উন্নয়নের অন্যতম সূচক হিসাবে গৃহীত হয়ে থাকে। উন্নতির প্রথম দিকে কৃষির গুরুত্ব থাকে সবচেয়ে বেশি, তারপর শিল্পের গুরুত্ব বাড়ার সাথে সাথে কৃষির অংশ কমতে থাকে, আর শেষ পর্যায়ে, মাথাপিছু আয় যখন বেশ উচ্চস্তরে পৌঁছে গেছে, পরিষেবার গুরুত্ব বাকি দু'টিকে ছাড়িয়ে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করে নেয়। ভারতের ক্ষেত্রে এই তিনটি সেক্টরের মোট জাতীয় উৎপাদনের অংশ (sectoral shares in national income) কীভাবে পরিবর্তিত হয়েছে, তা নিম্নের ৬.৩ সারণিতে লিপিবদ্ধ হল :

সারণি ৬.৩ : জাতীয় আয়ে শতকরা অংশ

	১৯৫০	১৯৬০	১৯৭০	১৯৮০	১৯৯০	২০০০	২০০৬	২০০৯	২০১১
কৃষি	৫৩	৪৪	৪৩	৩৭	৩২	২৬	২১	২০	১৮
শিল্প	১৪	১৯	২০	২৩	২৪	২৪	২৬	২৪	২৩
পরিষেবা	৩৩	৩৮	৩৭	৩৪	৪৪	৫০	৫৩	৫৬	৫৯

উৎস : *ভারত সরকারের বিভিন্ন রিপোর্ট*

উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল এই যে, শুধুমাত্র কৃষি ও পরিষেবার গুরুত্বের দিকে তাকালে ভারতবর্ষকে উন্নত দেশের শিরোপা না দিয়ে উপায় নেই। কিন্তু মাথাপিছু আয়ের নিরিখে ভারত এখনও বিশ্বের পিছিয়ে থাকা দেশগুলির অন্যতম।

এই বিচিত্র পরিস্থিতির মূল কারণ হ'ল শিল্প ও পরিষেবা ক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থানের বৃদ্ধির বৈষম্য। কর্মসংস্থান বেড়েছে অত্যন্ত ধীর গতিতে। তারও বেশির ভাগটা শহরাঞ্চলে, গ্রামাঞ্চলের শ্রমিকরা আধুনিক শিল্প বা পরিষেবার উৎপাদনে অংশ নিতে ব্যর্থ হয়েছে। তাই জাতীয় আয়ে কৃষির অবদান কুড়ি শতাংশের নিচে নেমে এলেও কর্মরত জনগণের অধিকাংশ এখনও অনগ্রসর কৃষিতেই আটকে গেছে। ১৯৮০-২০০০ এই কুড়ি বছরে কৃষিক্ষেত্রে নিয়োজিত শ্রমিকের শতাংশ ভারতে নেমেছে ৬৮ থেকে ৫৯-এ, চিনে নেমেছে ৭০ থেকে ৪৮-এ। অর্থাৎ গ্রামের মানুষকে অধিকতর উপার্জনের সীমানায় টেনে আনতে ভারত তুলনামূলকভাবে ব্যর্থ হয়েছে।

গ্রামাঞ্চলে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের প্রসার ঘটেনি, শিল্প ও উন্নত ITES পরিষেবা, যার রপ্তানিতে চমকপ্রদ সাফল্য আমাদের সাম্প্রতিক উন্নতির ভিত্তি, তারাও যে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে সেখানে স্বল্পশিক্ষিত শ্রমিকের ভূমিকা অতি সামান্য। তাই আমরা দেখতে পাচ্ছি কর্মহীন প্রগতি বা jobless growth। গ্রামের মানুষ আরো বেশি শিক্ষিত ও কর্মদক্ষ হ'লে আধুনিক শিল্প ও পরিষেবা তারা আরো বেশি করে ব্যবহার করতে পারত। ওই পথেই দক্ষিণ কোরিয়া ও তাইওয়ানে ও আরো আগে মহাযুদ্ধোত্তর জাপানে সর্বস্তরের মানুষ জাতীয় অগ্রগতির সুফল ভোগ করতে পেরেছিল। এদিকে ভারতের অদক্ষ, অল্পশিক্ষিত শ্রমিকরা অসংগঠিত ক্ষেত্রে ভিড় বাড়িয়ে চলেছে।

সারণি ৬.৪ : কর্মসংস্থানের বার্ষিক বৃদ্ধি (শতাংশ)

	সংগঠিত ক্ষেত্র	অসংগঠিত ক্ষেত্র
১৯৮৩	২	৬
১৯৮৭-৮৮	১-এর কম	৩.৯
১৯৯৩-৯৪	১-এর কম	১
১৯৯০-২০০০	০	৩
২০০৪-২০০৫	–২	৪.৮
২০০৯-২০১০	১.৫	৪
২০২০-২০২১	১.৭	৫.৬

উৎস : *ভারত সরকারের বিভিন্ন রিপোর্ট*

ভারতে মোট শ্রমিকের শতকরা ৮৫ ভাগ অসংগঠিত ক্ষেত্রে নিয়োজিত। বলাবাহুল্য, এই শ্রমিকদের মজুরি অত্যন্ত কম, কর্মস্থলের পরিবেশ অত্যন্ত নিম্নমানের এবং চাকরির নিরাপত্তা ও অন্যান্য দীর্ঘকালীন সুযোগসুবিধা প্রায় নেই বললেই চলে। ওপরের সারণি ৬.৪-তে এটি সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই আয় ও সম্পদের বৈষম্য ভারতে ক্রমাগত বাড়তে থাকছে। অবশ্য বিশ্বায়নের সঙ্গে বৈষম্য বৃদ্ধির সরাসরি সম্পর্ক পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই লক্ষিত হয়েছে। নেহরু প্রভাবিত সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনার যুগে বৈষম্য ব্যাপক হলেও বিভিন্ন সূচকে তার মান মোটামুটি স্থিতিশীল ছিল। আশির দশকের নীতি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এর গতি সেই যে ঊর্ধ্বমুখী হতে আরম্ভ করেছিল আজও তা অব্যাহত আছে। যদিও 'জওহর রোজগার যোজনা', 'মহাত্মা গান্ধী রোজগার যোজনা' ইত্যাদি প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলে দরিদ্র্য শ্রেণির আয় বেশ কিছুটা বাড়ানো সম্ভব হয়েছে, বণ্টনে স্থায়ী উন্নতির জন্য তা যথেষ্ট নয়। স্থায়ী উন্নতি তখনই হবে যখন শিল্প ও পরিষেবার উৎপাদন কেবলমাত্র শহরকেন্দ্রিক হয়ে থাকবে না।

বৈষম্য বৃদ্ধি শুধুমাত্র সাময়িক আয় বা সম্পদেই সীমাবদ্ধ নেই, ফারাক বেড়েছে গ্রাম ও শহরের মধ্যে (কারণ দারিদ্র্য বেশি কমেছে শহরাঞ্চলে) এবং দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে। এই প্রবণতা যদি প্রতিহত করা সম্ভব না হয় তবে রাজনৈতিক ও সামাজিক অশান্তির বিস্ফোরণও রোধ করা অসম্ভব হবে।

ভারতে মুক্ত অর্থনীতির আরেকটা বড় অস্বস্তির জায়গা হ'ল বিদেশি আর্থিক পুঁজির (foreign capital) গমনাগমন। এই পুঁজি ভারতের স্টক মার্কেটে বা শেয়ার বাজারে আসছে মূলত চটজলদি মুনাফার খোঁজে। শেয়ারের দাম বা ভারতীয় টাকার দাম একটু কমার সম্ভাবনা দেখা দিলেই বিদেশি লগ্নিকারী সংস্থারা (foreign institutional investors) তৎক্ষণাৎ তাদের ডলার তুলে নিয়ে অন্যত্র পাঠাবার ব্যবস্থা করে। যেহেতু এই ডলার দিয়েই আমরা তেল ও অন্যান্য অত্যাবশ্যক পণ্য আন্তর্জাতিক বাজার থেকে ক্রয় করি, অতএব ডলারের জোগানে টান পড়লে তার ক্ষতিকর প্রভাব সমগ্র অর্থনীতির উপর পড়ে। দীর্ঘমেয়াদি বিদেশি লগ্নির (foreign direct investment বা FDI) এই প্রবণতা থাকে না, নানাবিধ কারণে বহুজাতিক কোম্পানিরা ভারতকে এখনও তাদের ব্যবসার পক্ষে যথেষ্ট

লাভজনক ক্ষেত্র মনে করে না। তার অন্যতম প্রধান কারণ হল আমাদের দেশে বহুজাতিক সংস্থার আগমন ও সম্প্রসারণের উপর এখনও অনেক নিয়ন্ত্রণ বলবৎ আছে। অন্যদিকে আমরা স্বল্পমেয়াদি, চপলমতি FPO (foreign portfolio investment)-এর উপর অতিরিক্ত নির্ভরশীল হয়ে পড়েছি। স্থায়ী উন্নয়নের জন্য এখানে একটা বড় পরিবর্তন বাঞ্ছনীয়। সাম্প্রতিককালের FDI এবং FPI-এর চিত্র নিচের ৬.৫ সারণিতে দেওয়া হ'ল।

সারণি ৬.৫ : ভারতে বিদেশি পুঁজির পরিমাণ ($ million)

	নীট FDI	নীট FIP
২০০১-০২	৪৭৩৪	১৯৫২
২০০২-০৩	৩১৫৭	৯৪৪
২০০৩-০৪	২৩৮৮	১১,৩৭৭
২০০৪-০৫	৩৭১২	৯২৯১
২০০৫-০৬	৩০৩৩	১২,৪৯২
২০০৬-০৭	৭৬৯৩	৬৯৪৭
২০০৭-০৮	১৫,৮৯১	২৭,৪৩৪
২০০৮-০৯	২২,৩৪৩	–১৪,০৩২
২০০৯-১০	১৭,৯৬৫	৩২,৩৯৬
২০১০-১১	১১,৩০৫	৩০,২৯২
২০১১-১২	২২,০০৬	১৭,১৭১
২০২০-২১	২৩,০০০	১৯,০০০

উৎস : *ভারত সরকারের Economic Survey, 2012-13*

FPI-এর ঘন ঘন উত্থানপতন লক্ষণীয়। FDI তুলনায় অনেক বেশি স্থিতিশীল।

জাতীয় আয় বা মাথাপিছু আয় উন্নয়নের অন্যতম প্রধান সূচক হলেও তার সীমাবদ্ধতাও সুবিদিত। জীবনযাত্রার মান একটি বহুমাত্রিক বস্তু, কেবলমাত্র গড় আয়ের সাহায্যে তাকে বোঝা যায় না। নিম্নবিত্ত মানুষ যে সমস্ত অপ্রাপ্তি এবং বঞ্চনার (deprivation) শিকার হন সেগুলিকে সংখ্যায় ধরবার জন্য একাধিক সূচক উদ্ভাবিত হয়েছে। শুধুমাত্র আয়ের নিরিখে দারিদ্র্য গত পঁচিশ বছরে খানিকটা কমলেও (যদিও কমার পরিমাণ আশানুরূপ নয়) বহুমাত্রিক দারিদ্র্যের নিরিখে আমাদের অবস্থান অতীব শোচনীয় হয়ে আছে। Poverty and Human Development Initiative-এর সাম্প্রতিক এক সমীক্ষা বহুমাত্রিক দারিদ্র্য সূচকের ভিত্তিতে জানাচ্ছে যে ভারতের দরিদ্রতম আটটি রাজ্যে দরিদ্রের সংখ্যা বিয়াল্লিশ কোটিরও বেশি, যা কিনা আফ্রিকার দরিদ্রতম ছাব্বিশটি দেশেও নেই। সাক্ষরতার হার ভারতে ৬১ শতাংশ, চিন ৯১, এমনকি লেসোথো, সুদানও আমাদের থেকে এগিয়ে। পাঁচ বছরের কমবয়সি শিশুদের মধ্যে অপুষ্টির প্রকোপের বিচারে শুধু চিন নয়, বাংলাদেশ ও নেপালের অবস্থাও আমাদের চেয়ে ভালো। অপুষ্টি, ক্ষুধা আর শিশুমৃত্যুর বিরুদ্ধে সংগ্রামে আমাদের শোচনীয় প্রগতির সঙ্গে জাতীয় আয়ের দর্শনীয় বৃদ্ধির কোনই

সামঞ্জস্য নেই। ২০১৫ সালে অনুন্নত দেশগুলির সামনে Sustainable Development Goals-এর যে লক্ষ্য ধার্য করা হয়েছিল ২০২৩-এ এসে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে তার অনেকগুলিই আমাদের আয়ত্তের বাইরে থেকে যাবে। চিন এবং আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকার অনেক অনগ্রসর দেশের সাফল্য আমাদের চেয়ে অনেকটা বেশি।

একদিকে বাড়ছে আয় ও সম্পদের বণ্টনে বৈষম্য, অন্যদিকে বিপুলসংখ্যক মানুষ বহন করে চলেছে স্বল্পাহার, অশিক্ষা ও স্বাস্থ্যহীনতার বিষম ভার। এই অবস্থায় শুধুমাত্র জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি—তা সে যতই দ্রুত হোক না কেন, পরিত্রাণের পথ দেখাতে পারবে না।

সংস্কারের ৩০ বছর পার হয়ে যাওয়ার পর বর্তমান হাল-আমলের অবস্থা আরও শোচনীয়। বিশ্ব-অর্থনীতির অস্থিরতা শুরু হয়েছে। তা সত্ত্বেও ২০২২ সালের ১৫ই অক্টোবর ভারতের অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন ওয়াশিংটনে এক সম্মেলনে বলেন যে, ভারত ভালো জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছে এবং আগামী দিনেও দেশ নিজের গতিতেই এগিয়ে যাবে। একই অনুষ্ঠানে স্টেট ব্যাঙ্কের কর্ণধার দীনেশ খারা-ও ভারতের আর্থিক অবস্থার ভালো ছবিই তুলে ধরেছেন। বলেছেন বিশ্বে মন্দা দেখা দিলেও ভারতে ততটা প্রভাব পড়বে না।

সংশ্লিষ্ট মহল বলছে, যে সময়ে অর্থমন্ত্রী ও ব্যাঙ্ক-কর্তা আশার বাণী শোনাচ্ছেন, তখনই ক্ষুধা সূচকে পিছিয়ে ভারতের স্থান দাঁড়িয়েছে ১০৭-এ। বেকারত্বের হার প্রায় ৬.৫%। ডলারের সাপেক্ষে টাকার রেকর্ড পতনে বাড়ছে আমদানি খরচ। ফলে আশঙ্কা ঘাটতি মাথাচাড়া দেওয়ার। তাছাড়া নির্মলা সীতারামন যতই অর্থনীতির উজ্জ্বল ছবি তুলে ধরুন, সরকারি পরিসংখ্যানই বলে দিচ্ছে খুচরো ও পাইকারি মূল্যবৃদ্ধি, আমদানি-রপ্তানি থেকে শিল্পোৎপাদন—সবের হিসাবেই বাড়ছে অর্থনীতি ঘিরে চিন্তা। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর পর থেকে সারা বিশ্বে বাড়ছে জ্বালানি, খাদ্যসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম। মূল্যবৃদ্ধি ঠেকাতে টানা সুদের হার বাড়াতে বাধ্য হচ্ছে বিভিন্ন দেশ। ভূ-রাজনৈতিক টানাপোড়েন, মূল্যবৃদ্ধির চাপ, বিশ্ব অর্থনীতি ঘিরে আশঙ্কা এবং পিছিয়ে পড়া দেশগুলির সমস্যার কথা মেনেছেন নির্মলাও। তা সত্ত্বেও তাঁর দাবি, ভারতে অর্থনীতি চলতি অর্থবর্ষে ৭% হারে বাড়বে। সরকারের সংস্কার এবং নীতিগত বিভিন্ন সিদ্ধান্তই তাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

সেই প্রসঙ্গে করোনা কালে গত ২৫ মাস ধরে দেশের ৮০ কোটি মানুষকে নিখরচায় খাদ্যশস্য পৌঁছোনোর কথা তুলে ধরেন অর্থমন্ত্রী। তুলে ধরেন মূল্যবৃদ্ধি যুঝতে কেন্দ্রের পদক্ষেপ। তবে অর্থনীতিবিদ কৌশিক বসুর মত ভিন্ন। তিনি বলেন, বিশ্ব অতিমারির মধ্যে যত মানুষ দারিদ্র্য সীমার নীচে নেমেছে তার অধিকাংশই ভারতীয়। খাদ্যসংকট নিয়ে ভারতের জন্য আশঙ্কা প্রকাশ করেছে রাষ্ট্রপুঞ্জ।। ফলে অর্থমন্ত্রীর দাবির বাস্তবতা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন বিশেষজ্ঞদের একাংশ।

❑ আর্থিক সংস্কারের ফলাফল সম্পর্কে অধ্যাপক প্রণব বর্ধনের মতামত

প্রণব বর্ধন 'Reflections on Indian Political Economy' (২০১৫) নিবন্ধে বলেছেন যে ভারতের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ভিত্তি (fundamental) অনেকটা জোরালো।

- অন্তর্দেশীয় সঞ্চয় এবং বিনিয়োগের হার তুলনামূলকভাবে বেশি;
- ভারতীয় অর্থনীতি মুক্ত হবার পর, ভারতীয় বাণিজ্য বিশ্ব প্রতিযোগিতার জন্য যে চাহিদা তৈরি হয় তার সঙ্গে যথেষ্ট তাল মিলিয়ে চলতে সমর্থ হয়েছে;

- ভারতের প্রত্যেকটি কোণে উদ্যোক্তা-ভিত্তিক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি পেয়েছে;
- জনসংখ্যায় বেশির ভাগই যথেষ্ট যুবক সম্প্রদায়ভুক্ত। ফলে জনসংখ্যাভিত্তিক লভ্যাংশ (demographic dividend) আশা করা অযৌক্তিক নয়;
- উন্নততর পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার (বিশেষত, মোবাইন ফোনের দ্রুত বৃদ্ধির ফলে) জন্য যোগাযোগ রক্ষা বিশেষভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে যা পক্ষান্তরে অধিকতর উৎপাদনে উৎসাহিত করবে।

তবে ভারতে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পথে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাঠামোগত এবং প্রাতিষ্ঠানিক সমস্যা আছে।

১। রাস্তাঘাট, বিদ্যুৎ, পোর্ট, রেলওয়ে পরিকাঠামো অত্যন্ত দুর্বল। সরকারি বাজেটের বেশির ভাগটাই প্রচুর ভরতুকি, বেতন ও ঋণ মেটাতে ব্যয়িত হয়, খুব কম পরিকাঠামোগত উন্নয়নে ব্যয়িত হয়।

২। বহু ভালো অ-ফার্ম কর্মে মাধ্যমিক শিক্ষা অবশ্য প্রয়োজনীয়; গরিব ঘর থেকে আগত অনেক পড়ুয়ারা এই শিক্ষা গ্রহণ করার আগেই স্কুল ত্যাগ করে।

৩। স্কুল এবং কলেজের গড় গুণগত মান এতই কম যে বেশির ভাগ পড়ুয়ারাই কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত হতে পারে না। তথাকথিত 'শ্রমিক উদ্বৃত্ত' দেশ হয়েও, এই উদ্বৃত্ত শ্রমিকরা কারখানা এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে কাজ পায় না।

৪। সরকারি স্বাস্থ্যক্ষেত্রের অবস্থা এমনই ভঙ্গুর যে এটা কিছু কিছু আফ্রিকার দেশগুলির থেকেও পিছিয়ে। একে সামাজিক ও প্রতিষ্ঠানগত ব্যর্থতাই বলা যুক্তিসঙ্গত। পঙ্গু সরকারি স্বাস্থ্যক্ষেত্র এবং পরিচ্ছন্নতার অভাব ব্যক্তির বৃদ্ধির অসহায়ক এবং তৎসহ শ্রমিকদের উৎপাদন কমানোর দ্যোতক।

৫। নিট অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পথে পরিবেশগত বিপর্যয় একটি বড় বাধা। রাষ্ট্রসংঘের মানব উন্নয়ন প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, ভারতে প্রাকৃতিক সম্পদের অপচয়ে প্রতিবছর জাতীয় আয়ের প্রায় ৫% ভারত তার প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা পরিমাপ করেছে যে প্রতি বছর বায়ু-দূষণে ভারতে ১.৬ মিলিয়ন জনগণের মৃত্যু ঘটছে।

6.7 সারসংক্ষেপ

সংস্কার শব্দের আভিধানিক অর্থ হল "পতিত অবস্থা হতে মুক্তি।" বিবর্তনের সাথে সাথে যে রাষ্ট্র ব্যবস্থায় পরিবর্তন হয় না সেখানেই অধঃপতন দেখা দেয়। দার্শনিক এডমণ্ড বার্ক বলেছেন, "যে রাষ্ট্রে কোনো পরিবর্তনের ব্যবস্থা নেই তার সংরক্ষণের কোনো উপায় নেই।" যে-কোনো রাষ্ট্রকাঠামোতেই সময়ে সময়ে পরিবর্তন অত্যাবশ্যক হয়ে দাঁড়ায়। পরিবর্তনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যবস্থা গ্রহণের ব্যর্থতাকে সামাজিক ব্যাধি বলে চিহ্নিত করা যায়, যাকে পরিভাষায় 'প্রাতিষ্ঠানিক কঠিনীভবন' বলে। এই প্রাতিষ্ঠানিক কঠিনীভবন হলে, রাষ্ট্র ব্যবস্থাতে বিভিন্ন কর্মকাণ্ড অচল হয়ে পড়ে। কঠিনীভবনের ফলে সময় বিলম্বিত হয়। রাজনীতিবিদ্‌রা নতুন কোনো ধারণা সহজে গ্রহণ করতে চায় না।

প্রাতিষ্ঠানিক কঠিনীভবন ইচ্ছাকৃতভাবে সৃষ্টি করে কায়েমী স্বার্থবাদীরা। সময়ে সময়ে রাষ্ট্রযন্ত্র বিকল করে শাসকেরা। এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এই রাষ্ট্রযন্ত্র বিকল করে বিশেষ স্বার্থের গোষ্ঠীসমূহ। এসব গোষ্ঠীকে আধুনিক

ভাষায় বলা হয় "বণ্টনমূলক জোট।" এদের উদ্দেশ্য সমাজ বা দেশের কল্যাণ নয়। আত্মকল্যাণ; এরা উৎপাদন বাড়াতে চায় না। বণ্টন ব্যবস্থায় নিজেদের বখরা বড় করতে চায়। এ ধরনের স্বার্থগোষ্ঠীর মধ্যে রয়েছে শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের জোট, পেশাদারদের সমিতি এবং কর্মচারি ও শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন। সংস্কার হলেই এরা বেঁকে দাঁড়ায়। আদৌ কোনো আপোষ করতে রাজি নয়।

ভারতে গত ৭৫ বছর ধরে একদিকে রাষ্ট্রের কর্মপরিধি সম্প্রসারিত হয়েছে, অন্য দিকে বণ্টনমূলক জোটের সংখ্যা রাতারাতি বেড়েছে—সর্বত্রই এই বিশেষ স্বার্থগোষ্ঠীর কালো হাত থাবা বাড়িয়েছে। এর ফলে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক সংস্কারের বাস্তবায়নের ক্ষমতা হয়েছে অত্যন্ত সীমিত। অন্যদিকে অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক সংস্কারের গুরুত্ব ক্রমেই বাড়ছে। প্রথমত, বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থাতে ঘটছে আমূল পরিবর্তন। ঠান্ডা লড়াই-এর পর শুধু তথাকথিত সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থাই চলে যায়নি। সাথে সাথে ধ্রুপদি পুঁজিবাদী ব্যবস্থাও বাতিল হয়ে গেছে। বিশ্বায়িত অর্থব্যবস্থায় ক্ষমতাই এখন মাপকাঠি। এই নতুন ব্যবস্থায় পুরানো দিনের নীতিসমূহ অচল, অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। কাজেই প্রচলিত অর্থ-ব্যবস্থাতে ব্যাপক সংস্কারের প্রয়োজন রয়েছে।

সংস্কারের জন্য প্রয়োজন সুদৃঢ় রাজনৈতিক অঙ্গীকার। কিন্তু ভালো অর্থনীতি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভালো রাজনীতি নয়। যে ধরনের সংস্কার ভোটারদের আকৃষ্ট করে না, সে ধরনের সংস্কার রাজনীতিবিদ্‌দেরও আশীর্বাদ লাভ করে না। রাজনীতিবিদ্‌দের পক্ষে সংস্কার সম্ভব নয়। সংস্কারের জন্য প্রয়োজন বিজ্ঞ রাষ্ট্রনায়কের। রাজনীতিবিদদের চিন্তা আগামী নির্বাচনে সীমাবদ্ধ। একমাত্র বিজ্ঞ রাষ্ট্রনায়করাই ভবিষ্যৎ প্রজন্ম নিয়ে চিন্তা করে। এরাই হল "অর্থনৈতিক নীতিবীর।" স্বাভাবিক পরিবেশে এ ধরনের নেতৃত্ব পাওয়া যায় না। মারাত্মক সংকটের পরই এ ধরনের নেতৃত্বের উদ্ভব হয়। ভারতের ক্ষেত্রেও এ ধরনের নেতৃত্ব দেখা দিয়েছিল। তবে খাপছাড়া সংস্কারে কাজের কাজ কিছু হয় না। ভারত ১৯৯১ সালে যে সংস্কার নিয়েছিল তাকে 'ধীর পন্থা' সংস্কার নামে অভিহিত করা যেতে পারে। কেননা অর্থনীতির সমস্ত বৃত্তখণ্ডে সংস্কার একই সঙ্গে বাস্তবায়ন করা বা 'প্রচণ্ড আঘাত পন্থা' থেকে ভারত বিরত ছিল।

যা হোক, সংস্কার যত বিলম্বিত হয় সংস্কারের পরিধিও হয় তত ব্যাপক। উন্নয়নশীল দেশসমূহে (ভারত তার মধে অন্যতম) সংস্কারের মূল ক্ষেত্রসমূহ নিম্নরূপ :

ক. সরকারের আয় ও ব্যয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের লক্ষ্যে ভর্তূকিসহ ব্যয় হ্রাস ও রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি করা;

খ. সরকারের আয়তন হ্রাস (The role of the government is to "steer, but not row"), এবং প্রশাসনিক সংস্কার করা;

গ. আর্থিক ক্ষেত্রে সংস্কারের মাধ্যমে ব্যাঙ্ক ও অব্যাঙ্ক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে সরকারের হস্তক্ষেপ বন্ধ করা, প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করা এবং স্বাধীন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের মাধ্যমে এইসব প্রতিষ্ঠানের সুষ্ঠু তত্ত্বাবধান করা;

ঘ. রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের বেসরকারীকরণ এবং পণ্য ও সেবার মূল্যের ওপর রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ তুলে দেওয়া;

ঙ. বাণিজ্য উদারীকরণ, অ-শুল্কবাধা তুলে দেওয়া এবং শুল্কের হার হ্রাস করা;

চ. বেসরকারি ক্ষেত্র বিকাশের লক্ষ্যে সরকারের নিয়ন্ত্রণ হ্রাস এবং বিচারব্যবস্থার সংস্কার।

যা হোক, এখন ভারতের পরিকল্পনাগুলির একটি সামগ্রিক মূল্যায়ন করা যেতে পারে, কেননা ভারতের রাজনৈতিক অর্থনীতি ১৯৪৮-২০১৮ নানা পরিকল্পনার মধ্যে দিয়ে, রাজনৈতিক পালাবদলের মাধ্যমে ও সংস্কারের উত্থান-পতন নিয়ে আবর্তিত হয়েছে।

সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতে সাফল্যের কথা বলতে হলে বলা যায় : পরিকল্পনাকালে এবং নীতি আয়োগ ধর্তব্যের মধ্যে আনলে, (১) জাতীয় আয়ের ও মাথাপিছু আয়ের বৃদ্ধি হয়েছে; (২) কৃষি ও শিল্প উৎপাদন বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে; (৩) পরিকাঠামোতে কিঞ্চিৎ উন্নতি হয়েছে; (৪) বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রসার হয়েছে এবং বাণিজ্য সম্পর্কিত অনুপাত (trade-orientation ratio) বেড়েছে।

পাশাপাশি, দেখা যাচ্ছে জনসংখ্যার এক-চতুর্থাংশ দারিদ্র্য সীমার নীচে, বিপুল বেকারত্ব, দামস্তরে অস্থায়িত্ব, সরকারি ক্ষেত্রের ব্যর্থতা, আয় ও সম্পদ বণ্টনে অসাম্য বৃদ্ধি এবং শিল্পের অসম আঞ্চলিক বণ্টন প্রভৃতি। নীতি আয়োগ পরিকল্পনার উদ্ধারকর্তা হিসেবে এসেও কাজের কাজ তেমন কিছুই হয়নি।

6.8 অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলি :

1. "হিন্দু প্রবৃদ্ধির হার" বলতে কী বোঝ?
2. হিন্দু প্রবৃদ্ধির হারকে কেন্ রাজকৃষ্ণ ওই নামে উল্লেখ করেছিলেন?
3. দ্বিতীয় প্রজন্মের সংস্কার বলতে কী বোঝ?
4. কোন্ সরকারের সময় ভারতে দ্বিতীয় প্রজন্মের সংস্কার হয়েছিল?
5. সংস্কারের শব্দের আভিধানিক অর্থ কী?
6. 'ধীর পন্থা' সংস্কার কী ?
7. ভারতীয় পরিকল্পনার প্রধান দুটি ব্যর্থতা কী কী?
8. NITI আয়োগের পুরো কথাটি কী?
9. NITI আয়োগ কী? এটি কখন স্থাপিত হয়?
10. NITI আয়োগের সভাপতি কে?
11. নীতি আয়োগ যে সমস্ত ব্যবস্থার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছে, তার উল্লেখ করো।
12. 'বিমারু' রাজ্যের নামকরণ কে করেন?

মাঝারি উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলি :

1. প্রচলিত অর্থব্যবস্থাতে ব্যাপক সংস্কারের প্রয়োজন কেন?
2. উন্নয়নশীল দেশে সংস্কারের মূল ক্ষেত্রসমূহ কী কী, তা সংক্ষেপে আলোচনা করো।
3. এনডিএ সরকারের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক নীতি বিশ্লেষন করো।

দীর্ঘ উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলি :

1. অর্থনৈতিক সংস্কারের সাফল্য ও ব্যর্থতা আলোচনা করো।
2. অর্থনৈতিক সংস্কারের পর ভারতীয় অর্থনীতির সাফল্য ও ব্যর্থতা সম্বন্ধে রাজনৈতিক বৈজ্ঞানিক প্রবণ বর্ধনের মতামত ব্যাখ্যা করো।
3. ভারতে বিভিন্ন সরকারের উত্থান ও তাদের রাজনৈতিক ভূমিকা আলোচনা করো।

6.10 গ্রন্থপঞ্জী

- Bardhan, Pranab (২০০৩) : The Politics of Economics Reforms in India. In his Selected Essays titled *Poverty Agrarian Structure, & Political Economy in India*. New Delhi : Oxford University Press.
- Bardhan, Pranab (২০২১). *Indian Polity and Economy "A Mirror to Difficult Times."* UK : Frontpage.
- Barberge, Arnold (১৯৯৩). "Secrets of Success : A Handful of Heroes". *American Economic Review* Vol 83, No. 2, pp.-343-350.
- খান, আকবর আলি (২০০৯) *পরার্থপরতার অর্থনীতি, ঢাকা : ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড।*
- Lal, Deepak (১৯৮৫). *The Poverty of Development Economics*. Cambridge : Harvard University Press.
- Spengler, Joshph J. (১৯৭১). *Indian Economic Thought*. Durham : Duke University Press, 1971.

———

পরিশিষ্ট—1

কতিপয় শব্দকোষ

- **ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি—"ইন্ডিয়ান পিপলস্ পার্টি") :** ১৯৮৪ সালে জনসংঘের নতুন নামকরণ হয় ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি), বিজেপি হিন্দু জাতীয়তাবাদী দলগুলির শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছে এবং বর্তমানে সংসদের বৃহত্তম একক দল। এটি উচ্চ বর্ণ এবং শহুরে মধ্য-নিম্ন-মধ্যবিত্তের সমর্থন আকর্ষণ করে। এল. কে. আদবানি এবং অটল বিহারী বাজপেয়ীর নেতৃত্বে, বিজেপি সরকারি ক্ষেত্রের বেসরকারিকরণ, আরও আক্রমণাত্মক বিদেশি নীতি ও সংখ্যালঘুদের জন্য বিশেষ সুরক্ষা বা সুবিধাগুলি অপসারণের পক্ষে। জাতীয়তাবাদী প্ল্যাটফর্মের পক্ষে সওয়াল করে দলটি নিয়মিত হিন্দু প্রতীক ব্যবহার করেঙ এটি ১৯৯৩ সালে অযোধ্যায় বাবরি মসজিদ ধ্বংসের পিছনে প্রধান সংগঠক ছিল, যা সারাদেশে একের পর এক মারাত্মক দাঙ্গার জন্ম দেয়। ১৯৯৬ সালের মে মাসে নির্বাচনের পর সরকার গঠন করতে বলা হলে, প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী সংসদীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারেনি এবং ১৩ দিন পর এই সরকারের পতন ঘটে।

- **বোম্বাই পরিকল্পনা :** স্বাধীনতার পরে ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি পদ্ধতির সমর্থনকারী ভারতীয় শিল্পপতিদের দ্বারা উত্থাপিত একটি প্রস্তাব। এই পরিকল্পনাটি বিদেশে প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে জাতীয় শিল্পকে প্রত্যক্ষ সাহায্য করার জন্য এবং ভারী শিল্প চেষ্টার বিকাশে মনোনিবেশ করার জন্য রাষ্ট্রীয় পদক্ষেপের প্রস্তাব করেছিল। বোম্বাই পরিকল্পনা সমর্থকরা ছিলেন নেতৃত্বস্থানীয় শিল্পপতিরা। ভারতের উন্নয়নে মুক্ত-বাজার পদ্ধতি এরা সমর্থন করেনি।

- **ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিআই) এবং কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া-মার্কসবাদী (সিপিএম) :** ১৯২৮ সালে প্রতিষ্ঠিত, সিপিআই স্বাধীনতার পূর্ব এবং পরবর্তী যুগে কংগ্রেসের সবচেয়ে বিশিষ্ট বাম বিকল্প হিসাবে শ্রমিক এবং কৃষকদের আকৃষ্ট করেছিল। ঐতিহাসিকভাবে ভারতের কমিউনিট পার্টি ১৯৬৪ সালে প্রভাবশালী কংগ্রেস পার্টির প্রতি তার দৃষ্টিভঙ্গির ইস্যুতে বিভক্ত হয়েছিল—সিপিআই কংগ্রেসের মধ্যে প্রগতিশীল উপাদানগুলির সাথে কাজ করার পক্ষপাতী ছিল, যখন সিপিএম এটির সম্পূর্ণ বিরোধিতা করতে চেয়েছিল। বিপ্লবী কৌশলে আস্থাশীল আরও কট্টরপন্থী দলগুলি কমিউনিস্ট দলগুলি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে, যেমন পশ্চিমবঙ্গের নকশাল এবং অন্ধ্রপ্রদেশের পিপলস্ ওয়ার পার্টি। কমিউনিস্ট দলগুলি সংসদীয় ব্যবস্থার মাধ্যমে অংশগ্রহণ এবং সংস্কারের পক্ষে ছিল। তারা বিশ্বের একমাত্র গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত কমিউনিস্ট দল হিসেবে দাঁড়িয়েছে, প্রথম ১৯৫৭ সালে কেরালায় (সিপিআই) এবং ১৯৭৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে (সিপিএম)।

- **কমিউনিটি উন্নয়ন পোগ্রাম :** প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত কৃষি সংস্কারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার জন্য ১৯৫২ সালে এটি চালু করা হয়েছিল। কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম বেশ কয়েকটি স্থানীয় উন্নয়ন প্রকল্প (কমিউনিটি উন্নয়ন প্রকল্প) বাস্তবায়নের চেষ্টা করেছিল। এই প্রকল্পগুলির উদ্দেশ্য ছিল সমবায় কার্যক্রম এবং অর্থনৈতিক স্বয়ংসম্পূর্ণতাকে উৎসাহিত করে একটি গ্রাম পর্যায়ে সামাজিক পরিবর্তনের সূচনা করা। গ্রামীণ

এলাকায় এর আওতাভুক্ত প্রকল্পগুলি খামার ব্যবস্থাপনা এবং সার ব্যবহারের মাধ্যমে আরও নিবিড় কৃষি উন্নয়নের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং স্থানীয় স্ব-সরকারের মতো গ্রামীণ সমস্যাগুলির সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য প্রকল্পগুলিও চালু করা হয়েছিল।

- **জরুরি অবস্থা :** এই শব্দটি আড়াই বছরের সময়কালকে বোঝায় (জুন, ১৯৭৫ থেকে ডিসেম্বর ১৯৭৭) যে সময়ে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক অভিযোগের প্রতিক্রিয়া হিসাবে গণতান্ত্রিক এবং নাগরিক স্বাধীনতা স্থগিত করেছিলেন। কর্মক্ষেত্রে "শৃঙ্খলাহীনতা", এবং তাঁর ক্রমবর্ধমান কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে বিরোধীদের ব্যাপক বিক্ষোভ এই পদক্ষেপের কারণ। ইমার্জেন্সি রেগুলেশনের দ্বারা বিস্তৃত ক্ষমতা মঞ্জুর করায়, ইন্দিরা গান্ধী ১,১০,০০০ জনেরও বেশি লোককে (অধিকাংশ বিরোধীদের) বিনা বিচারে গ্রেপ্তার ও আটক করেছিলেন, প্রেসকে মারাত্মকভাবে আঘাত করেছিলেন, শ্রম অ্যাকশন নিষিদ্ধ করেছিলেন, রাজ্যের অ্যাসেম্বলি এবং আদালতের বিশেষাধিকার বাতিল করেছিলেন। তিনি অত্যন্ত বিতর্কিত সামাজিক কর্মসূচি শুরু করেন (যার মধ্যে সবচেয়ে কুখ্যাত ছিল তার ছেলে সঞ্জয়ের বন্ধ্যাকরণ অভিযান, যেখানে জোরপূর্বক ভ্যাসেকটমির অনেক রিপোর্ট ছিল)। ১৯৭৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে তাঁর সাংঘাতিক পরাজয় তাকে অবাক করে দিয়েছিল এবং তাঁর কর্তৃত্ববাদী পদক্ষেপের বিরুদ্ধে জনসাধারণের বিশাল প্রতিক্রিয়া প্রকাশিত হয়েছিল।

- **ফরেন এক্সচেঞ্জ রেগুলেশন অ্যাকাট (FERA) ১৯৭৩ :** ১৯৭৩ সালের এই আইনটি বিদেশি বিনিয়োগ এবং মুদ্রা বিনিময় নিয়ন্ত্রণ করে। এটি একটি শিল্পে অনুমোদিত ইক্যুইটির পরিণাম, অনুমোদিত কার্যকলাপের ধরন, রিয়েল এস্টেট ব্যবহার, বিদেশে লভ্যাংশ এবং লাভের রেমিট্যান্স, বৈদেশিক মুদ্রার লেনদন এবং ব্যাংকিং সুবিধাগুলিতে প্রবেশাধিকার নির্ধারণ করে। ১৯৯৩ সালে, একটি সংশোধনী বিদেশি সংস্থাগুলির ধার নেওয়া, অধিগ্রহণ এবং বিক্রয়ের পাশাপাশি ভারতীয় সংস্থাগুলির মতো একই স্তরে রাখার জন্য শাখা অফিস খোলার ক্ষেত্রে কিছু নিয়ম শিথিল করে।

- **ফেবিয়ান সমাজতন্ত্র :** Fabius Cunctator ছিলেন একজন রোমান সেনাপতি। তাঁর রণনীতিতে দ্রুত আক্রমণের তুলনায় মাঝে মধ্যে চোরাগোপ্তা আক্রমন প্রাধান্য পেত। এরই নামানুসারে ১৮৮৩-৮৪ সালে লন্ডনে ফেবিয়ান সমাজতন্ত্রীদের একটি সংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়। মার্কসীয় শ্রেণিসংগ্রামের তত্ত্ব অবলম্বন না করে এঁরা সমাজকে নীতিনিষ্ঠ করে তোলার উদ্দেশ্য নিয়েই এই সমিতি গঠন করেন। আর্থিক ক্ষেত্রে ক্রমশ রাষ্ট্রকে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে এবং তার ফলে ধনতন্ত্রের অবসান হলে সামাজিক স্বার্থ সুরক্ষিত হবে, এই বিশ্বাস অবলম্বন করে ফেবিয়ান চিন্তাধারার সমর্থকরা। এরা সংসদীয় পথে সমাজতন্ত্রের পথ বেছে নিয়েছিলেন এবং লন্ডনের লেবার পার্টি গঠন করেছিলেন। ইংল্যান্ডে ছাত্রাবস্থায় নেহরুর মনে এই দর্শন প্রভাব ফেলে ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে থাকাকালীন এরই অর্থনৈতিক নীতি ভারতে প্রবর্তন করেন।

- **পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৭৪-৭৯) :** ভারতে জরুরি অবস্থার সময় এই পরিকল্পনার খসড়া রচিত হয়েছিল। দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রকল্প এই সময়েরই পরিকল্পনার প্রথম নেওয়া হয়েছিল। লক্ষ্য ছিল কৃষি ও গুরুত্বপূর্ণ শিল্পের উন্নয়ন ঘটিয়ে গ্রামীণ দারিদ্র্য এবং বেকারত্ব দূর করা। অধিকন্তু, শক্তি উৎপাদন ক্ষেত্রের ওপর বিশেষ করে নজর দিয়েছিল এই পরিকল্পনা।

- **প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৫১-৫৬) :** হ্যারড-ডোমার মডেলটিকে কিঞ্চিৎ এদিক-ওদিক করে এই পরিকল্পনা রচিত হয়েছিল, যেখানে কৃষির ওপর অধিক জোর দেওয়া হয়েছিল। ভারতীয় দারিদ্র্যের মূল উৎস সামাজিক-অর্থনৈতিক বৈষম্যকে ধর্তব্যের মধ্যে এনে, এই পরিকল্পনার প্রণেতাদের আশা ছিল ভূমিসংস্কার ও পুর্নবণ্টনের ওপর জোর দিলে দেশের উন্নতি হবে এবং তারা জমির ওপর নির্দিষ্ট সীমা বেঁধে দিয়েছিলেন।

- **চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৬৯-৭৪) :** রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা থেকে তিন বছরের বিরতির পর, এই পরিকল্পনাটি প্রথম তিনটি পরিকল্পনার কারণে সৃষ্ট সমস্যাগুলি যেমন মুদ্রাস্ফীতি, ধীর শিল্প সম্প্রসারণের, কৃষি উৎপাদন কম বৃদ্ধির সমাধান করার চেষ্টা করেছিল। কৃষিতে, গ্রামীণ বিদ্যুতায়ন এবং সেচের উন্নয়ন প্রকল্পগুলি এই সময়ে হাতে নেওয়া হয়েছিল, এবং কৃষকদের বাণিজ্যিক চাষে যেতে উৎসাহিত করা হয়েছিল।

- **সবুজ বিপ্লব :** পশ্চিমী সংস্থাগুলির দ্বারা ভারতীয় পরিকল্পনাবিদ্‌দের সাথে একত্রে তৈরি করা একটি কৃষি কৌশল, যাতে নতুন প্রযুক্তিগত উন্নতি এবং শস্যের উচ্চ ফলনশীল জাতগুলি প্রবর্তনের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন উন্নত করা যায়। ১৯৬০ এর দশকের শেষের দিকে প্রবর্তিত এই "বিপ্লব" এর উদ্দেশ্য ছিল ভারতকে খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তোলা, অধিক পরিমাণে সার ব্যবহার, চাষের নতুন পদ্ধতি এবং যান্ত্রিকীকরণ। যদিও সবুজ বিপ্লব উল্লেখযোগ্যভাবে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করেছিল, তবে এটি অঞ্চল এবং গ্রামীণ জনগণের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য বাড়িয়ে তুলেছিল।

- **ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস (আইএনসি) :** ব্রিটিশ সরকারের কাছে ভারতীয় অভিজাত এবং পেশাদার গোষ্ঠীর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য ১৮৮৫ সালে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়ে, আইএনসি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রধান রাজনৈতিক সংগঠন হয়ে ওঠে। ১৯২০ সালে গান্ধীর নেতৃত্বে এটি অভিজাত পার্টি থেকে সরে গণভিত্তিক দলে রূপান্তরিত হয়। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতার পর এটি প্রধান ক্ষমতাসীন দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে এবং বহু বছর শাসনক্ষমতায় থাকে।

  দলটি ১৯৬৯ এবং ১৯৭৭ সালে দলগত লড়াইয়ে দুবার বিভক্ত হয়েছিল, কিন্তু ইন্দিরা গান্ধী উভয় ক্ষেত্রেই দলের বেশির ভাগের আনুগত্য অর্জন করেছিলেন। ইন্দিরা গান্ধী কংগ্রেস (আই) গঠন করেন। রাজীব গান্ধীর হত্যার পর, কংগ্রেস পিভি নরসিমা রাও-এর অধীনে সংখ্যালঘু সরকার হিসাবে কেন্দ্রে ফিরে আসে কিন্তু ১৯৯৬ সালের মে মাসের নির্বাচনে এই অবস্থান হারায়।

- **শিল্প নীতি ১৯৯১ :** রাও সরকারের নতুন শিল্পনীতি উচ্চ অগ্রাধিকার শিল্পে (যেমন বিদ্যুৎ, রাসায়নিক, ইলেকট্রনিক্স, পরিবহন, টেলিযোগাযোগ) বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণ করতে চেয়েছিল। সরকার উচ্চ প্রযুক্তি, বিশেষ করে কম্পিউটার এবং প্রযুক্তিকে উৎসাহিত করেছে।

- **ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিসি রেজোলিউশন, ১৯৪৮ :** ভারত সরকারের ঘোষিত প্রথম শিল্পনীতি একটি নথি যা নতুন ভারতীয় সরকারের নীতি এবং উদ্দেশ্যগুলিকে স্পষ্ট করার চেষ্টা করেছিল। সরকার মিশ্র অর্থনীতির প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেছে এবং শুধুমাত্র যুদ্ধাস্ত্র, পারমাণবিক শক্তি এবং রেলপথ শিল্পের জন্য জাতীয় একচেটিয়া সংরক্ষিত করেছে। যদিও বেসরকারি সংস্থাগুলির দখলে থাকা বিদ্যমান শিল্পগুলি অব্যাহত থাকতে পারে তবু সরকারের কাছে অন্য ছয়টি শিল্প—কয়লা, লোহা ও ইস্পাত, বিমান তৈরি, জাহাজ নির্মাণ, টেলিফোন এবং টেলিগ্রাফ এবং খনিজ-এর প্রকল্পগুলি শুরু করার একচেটিয়া অধিকার ছিল—যদিও প্রয়োজনে বেসরকারি ক্ষেত্রের সাহায্য নিতে পারবে। সরকার জাতীয় গুরুত্বের অন্যান্য ১৮টি শিল্পকে নিয়ন্ত্রণ ও লাইসেন্স দিতে পারে। এই প্রস্তাব বিদেশি

বিনিয়োগকারীদের এবং দেশিয় ব্যবসায়ী সম্প্রদায়কে আশ্বস্ত করেছে যে তাদের হোল্ডিং বাজেয়াপ্ত বা জাতীয়করণ করা হবে না। ১৯৫৬ সালে, সরকার পাবলিক সেক্টর হোল্ডিংয়ের তালিকাকে মূলধন এবং মধ্যবর্তী পণ্যগুলিতে প্রসারিত করে।

- **শিল্প উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ আইন (আইডিআরএ), ১৯৫১ :** ১৯৫১ সালের এই আইনটি শিল্পনীতি প্রস্তাবকে বাস্তবায়ন করেছে, যা শিল্প উন্নয়নে বেসরকারি ক্ষেত্রের অংশগ্রহণকে নির্দেশ দেবে। এটির সাহায্যে কেন্দ্রীয় সরকার উৎপাদনের মূল্য বা পরিমাণের জন্য নির্দেশিকা নির্ধারণ করতে পারে।

- **সমন্বিত গ্রামীণ উন্নয়ন কর্মসূচি (IRDP) ১৯৭৮-৮০ :** ১৯৭৮-৮০ সালে জনতা সরকারের সময়কালে এটি প্রবর্তিত হয়। IRDP দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচির অনেকগুলিকে নিজের মধ্যে টেনে নেয়, যেমন ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন সংস্থা (SFDA) এবং প্রান্তিক কৃষক ও কৃষিশ্রমিক (MFAL) প্রোগ্রাম। এই প্রোগ্রামগুলির ফোকাস ছিল স্থায়ীভাবে দারিদ্র্য সীমার উপরে দরিদ্রদের জীবনযাত্রার মানকে উন্নতি করা। বেশিরভাগ বিশ্লেষক একমত যে IRDP কর্মসূচির বাস্তবায়ন ছিল অত্যন্ত দুর্বল।

- **ইন্টারন্যাশনাল মনিটারি ফান্ড (IMF) :** ১৯৪৫ সালে জাতিসংঘ (UN)-এর সাথে অনুমাদিত একটি আর্থিক সংস্থা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (IMF) বিনিময় হার স্থিতিশীল করার জন্য এটি কাজ করে। এটি লেনদেন ব্যালেন্সের সংকটপূর্ণ দেশগুলিকে ঋণ দেয়। এটি উন্নয়নশীল দেশগুলির উপর একটি শক্তিশালী প্রভাব ফেলেছে যেখানে এই IMF শর্তসাপেক্ষে ঋণ দেয়।

- **জনতা দল :** ১৯৭৭ সালের জনতা পার্টি থেকে উত্তর ভারতীয় অ-কমিউনিস্ট বাম এবং নিম্ন-বর্ণ-ভিত্তিক দলগুলির একটি সাম্প্রতিক জোট। জনতা দল ১৯৮৯ সালে জাতীয় নির্বাচনে জাতীয় ফ্রন্ট হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য দক্ষিণ ও উত্তর-পূর্বের বেশ কয়েকটি আঞ্চলিক দলের সাথে যোগ দেয়। তবেএই ফ্রন্ট নির্বাচনী সংখ্যাগরিষ্ঠ লাভ করতে পারেনি। জনতা দলের নেতা, প্রাক্তন কংগ্রেসম্যান ভি. পি. সিংকে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) এবং কমিউনিস্ট পার্টি অফ্ ইন্ডিয়া মার্কসবাদী (সিপিএম)-এর বাইরের সমর্থনে সংসদে একটি সরকার গঠন করতে বলা হয়েছিল। তাঁর মেয়াদকালে, ভি. পি. সিং সরকারি চাকরিতে নিম্নবর্ণের জন্য সংরক্ষণের পক্ষে সংস্কারের জন্য চাপ দেন, যা সারা দেশে দাঙ্গা ও বিতর্কের জন্ম দেয়। ১৯৯০ সালে বিজেপি তার সমর্থন প্রত্যাহার করে নেয় এবং ভিপি সিং পদত্যাগ করেন। জনতা দলের আরেক নেতা, চন্দরশেখর আরেকটি সংখ্যালঘু সরকারের নেতৃত্বে ছিলেন, এবং সেটি কংগ্রেস দ্বারা সমর্থিত ছিল, যা মাত্র চার মাস স্থায়ী হয়েছিল, যতক্ষণ না ১৯৯১ সালের মার্চ মাসে নতুন নির্বাচন ডাকা হয়।

- **জনতা পার্টি :** এটি ছিল বামপন্থী, আঞ্চলিক, বর্ণ-ভিত্তিক এবং ডানপন্থী দলগুলির একটি জোট যা ১৯৭৭ সালে জাতীয় নির্বাচনে জয়ী হওয়ার জন্য একত্রিত হয়েছিল। জনতা পার্টি ইন্দিরা গান্ধীর নীতির সাথে ব্যাপক অসন্তুষ্টিকে পুঁজি করে—বিশেষ করে জরুরি অবস্থার সময় গৃহীত ব্যবস্থাদি পুঁজি করে—১৯৮০ সালে দলগত লড়াই করে। এই জনতা পার্টি কৃষি উন্নয়নে বেশি মনোযোগ দিয়েছিল।

- **লাইসেন্স-পারমিট কাজ :** এক একটি শব্দগুচ্ছ যা সরকারি নিয়মের অধীন উৎপাদন, উদ্যোগ সম্প্রসারণ করার

জন্য শিল্প ও বাণিজ্যিক পারমিট বরাদ্দের ব্যবস্থাকে বর্ণনা করতে ব্যবহৃত হয়। এককথায় প্রাক্-সরকারি অনুমতি।

- **একচেটিয়া এবং সীমাবদ্ধ বাণিজ্য অনুশীলন (MRTP) আইন, ১৯৬৯ :** এই আইনটি ১৯৫১ সালের শিল্পনীতিতে নিয়ন্ত্রণের ওপর নির্মিত। এটি বৃহত্তর সংস্থাগুলির মধ্যে একচেটিয়া প্রবণতা কমানোর চেষ্টা করেছিল।

- **ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল (এনডিসি) :** জাতীয় পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের সরব করবার জন্য নেহরু দ্বারা ১৯৫২ সালে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই কাউন্সিল তাদের পরিকল্পনা কমিশনের প্রস্তাবিত অর্থনৈতিক ও সামাজিক নীতিগুলির পর্যালোচনা, বিরোধিতা, বা সুপারিশ করার সুযোগ দেয়। এনডিসি পরিকল্পনা কমিশনের নীতিগুলিকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে।

- **ন্যাশনাল ফ্রন্ট :** বাম, আঞ্চলিক এবং নিম্ন-বর্ণ-ভিত্তিক দলগুলি সমন্বিত ১৩টি দলের একটি জাতীয় জোট ১৯৮৯ এবং ১৯৯৬ সালের জাতীয় নির্বাচনে সফলভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল। ফ্রন্ট নিজেকে কংগ্রেসের উচ্চবর্ণের পক্ষপাতিত্ব এবং ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) সাম্প্রদায়িক প্ল্যাটফর্মের বিকল্প হিসেবে অবস্থান নেয়। ফ্রন্টের প্রধান অংশীদাররা হল : জনতা দল, অন্ধ্রপ্রদেশের তেলেগু দেশম পার্টি (টিডিপি), দ্রাবিড় মুন্নেত্রা কাজাগম (ডিএমকে) এবং তামিলনাড়ু সর্বভারতীয় আন্না দ্রাবিড় মুনেত্রা কাজাগম (এআইএডিএমকে), অসম গণ পরিষদ (এজিপি) এবং অন্যান্য ছোট আঞ্চলিক দলগুলি। কর্ণাটক কংগ্রেস পার্টির প্রধানমন্ত্রী এইচডি দেবগৌড়ার অধীনে ন্যাশনাল ফ্রন্ট সরকারও কাশ্মীরের ন্যাশনাল কনফারেন্স এবং পশ্চিমবঙ্গের কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া (সিপিআই)-কে অন্তর্ভুক্ত করে, এই প্রথমবার একটি কমিউনিস্ট পার্টি কেন্দ্রীয় সরকারে অংশগ্রহণ করল।

- **নতুন অর্থনৈতিক নীতি ১৯৯১ :** ১৯৯১ সালে রাও সরকার কর্তৃক সেই সময়ে আর্থিক সংকটের প্রতিক্রিয়া হিসাবে নতুন অর্থনৈতিক নীতির এটি একটি প্যাকেজ। এই কৌশলটি ভারতীয় অর্থনীতির বিশ্বায়নের চূড়ান্ত লক্ষ্যের সাথে উদারীকরণ, বেসরকারীকরণ এবং প্রতিযোগিতামূলক কার্যকলাপ বৃদ্ধি করেছে। এই নীতিটি বহুজাতিক কোম্পানিগুলির বিনিয়োগের জন্য দরজা খুলে দিয়েছে।

- **পঞ্চায়েত :** আক্ষরিক অর্থে, "পাঁচজনের কাউন্সিল", "পঞ্চায়েতি রাজ" হল গ্রাম, জেলা এবং উন্নয়ন-ব্লক স্তরে স্থানীয় স্বশাসনের সাংবিধানিকভাবে বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা। এই নির্বাচিত কাউন্সিলগুলি ১৯৫০-এর দশকের শেষের দিকে এবং ১৯৬০-এর দশকের গোড়ার দিকে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে উন্নয়ন এবং কৃষি কার্যক্রমকে উৎসাহিত করার জন্য স্থানীয় পর্যায়ে কিছু রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রচেষ্টায় জোর পায়। পঞ্চায়েতগুলি কৃষি এবং গ্রামীণ দরিদ্রদের অংশগ্রহণমূলক সরকারে আনতে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিকল্পনার একটি অপরিহার্য অংশ ছিল, কিন্তু সাম্প্রতিক বছরগুলিতে, তারা অকার্যকর প্রমাণিত হয়েছে।

- **পরিকল্পনা কমিশন :** স্বাধীনতার পরে প্রাথমিকভাবে পরিকল্পনা ও উন্নয়নের বিষয়ে সরকারের উপদেষ্টা বোর্ড হিসাবে কাজ করার জন্য তৈরি করা হয়েছিল। ১৯৫০-র দশকে পরিকল্পনা কমিশন রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের উন্নয়ন সংস্থান বরাদ্দের ভারসাম্য বজায় রাখতে এবং পাঁচ বছরের নকশা প্রণয়নে কেন্দ্রীয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। পরিকল্পনা কমিশন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ, পরিকল্পনা ও উন্নয়নে বিশেষজ্ঞ এবং প্রধানমন্ত্রীর মন্ত্রিসভার সদস্য (সাধারণত অর্থমন্ত্রী) নিয়ে গঠিত। প্ল্যানিং কমিশন নেহরুর আমলে উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক সমর্থনসহ একটি কেন্দ্রীভূত পরিকল্পনা সংস্থা হিসাবে সবচেয়ে প্রভাবশালী ছিল। প্ল্যানিং কমিশন কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট

প্রোগ্রামের মতো প্রকল্প চালু করতে এবং আর্থ-সামাজিক বৈষম্যের যাতে অবসান হয় তার দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য সুষম উন্নয়নের পক্ষে ভূমিকা পালন করে।

- **দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি (PAPs) :** ১৯৭০-এর দশকে দারিদ্র্যের কারণ এবং প্রভাবগুলিকে নির্মূল করার জন্য কিছু কর্মসূচি নেওয়া হয়েছিল। কিছু কর্মসূচি তাৎক্ষণিক পরিস্থিতিকে লক্ষ্য করে, যেমন খরা বা অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় অস্থায়ী মজুরি কর্মসংস্থান সরবরাহ করা। অন্যান্য কর্মসূচিগুলি কৃষি উৎপাদন, দক্ষতা প্রশিক্ষণ, এবং ঋণ ও বিনিয়োগের উন্নতির মাধ্যমে গ্রামীণ দরিদ্রদের জীবনযাত্রার মান স্থায়ীভাবে দারিদ্র্য সীমার ওপরে উন্নীত করার জন্য দারিদ্র্যের দীর্ঘমেয়াদী সমাধান চেয়েছে।

- **দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৫৬-৬১) :** পি. সি. মহলানবিশ এবং নেহরুর নির্দেশনায়, এই পরিকল্পনাটি প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কৃষি গুরুত্ব থেকে গুরুত্ব সরিয়ে নেয় এবং কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার মাধ্যমে দ্রুত ও নিবিড় শিল্প বিকাশের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। এই পরিকল্পনাটি আমদানি-প্রতিস্থাপন কৌশল এবং ভারী ও মূলধনী পণ্য শিল্পের রাষ্ট্রীয় মালিকানার ওপর জোর দিয়ে ভবিষ্যতের শিল্পনীতির প্যাটার্ন ঠিক করে। এই পরিকল্পনাটি বেসরকারী ক্ষেত্রের ভূমিকা কমিয়ে দিয়েছে। এর চূড়ান্ত লক্ষ্য ছিল ভারতকে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থনীতিতে পরিণত করা, জাতীয় আয় বৃদ্ধি করা এবং বেকারত্ব হ্রাস করা।

- **তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৬১-৬৬) :** তৃতীয় পরিকল্পনাটি দ্বিতীয় পরিকল্পনার মতো একইভাবে চলতে থাকে, যা রাষ্ট্রের নেতৃত্বে শিল্প উন্নয়ন এবং সম্প্রসারণের দিকে মনোনিবেশ করে। রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব বৃহৎ আকারের কৃষিজমি সংস্কারের প্রবর্তনকে অব্যর্থ করে তোলে এবং কৃষি উন্নয়নে সাধারণ বিনিয়োগ হ্রাস পায়।

- **জেলা পরিষদ :** পঞ্চায়েতি ব্যবস্থায় জিলা পরিষদ হল জিলা কাউন্সিল।

———

পরিশিষ্ট—2

ভারতের প্রধানমন্ত্রী

	প্রধানমন্ত্রী	দল	সময়সীমা
১।	জওহরলাল নেহরু (১৮৮৯-১৯৬৪)	কংগ্রেস	১৯৪৭-৬৪
২।	গুলজারিলাল নন্দ (১৯৯৮-১৯৯৮)	কংগ্রেস	১৯৬৪-৬৪ এবং ১৯৬৬-৬৬
৩।	লাল বাহাদুর শাস্ত্রী (১৯০৪-১৯৬৬)	কংগ্রেস	১৯৬৪-৬৬
৪।	ইন্দিরা গান্ধী (১৯১৭-৮৪)	কংগ্রেস	১৯৬৬-৭৭
৫।	মোরারজি দেশাই (১৮৯৬-১৯৯৫)	জনতা পার্টি	১৯৭৭-৭৯
৬।	চরণ সিং (১৯০২-১৯৮৭)	জনতা (এস)	১৯৭৯-৮০
৭।	ইন্দিরা গান্ধী (১৯১৭-১৯৮৪)	কংগ্রেস	১৯৮০-৮৪
৮।	রাজীব গান্ধী (১৯৪৪-৯১)	কংগ্রেস	১৯৮৪-৮৯
৯।	বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং (১৯৩১-২০০৮)	জাতীয় মোর্চা	১৯৮৯-৯০
১০।	চন্দ্রশেখর (১৯২৭-২০০৭)	জনতা দল (এস)	১৯৯০-৯১
১১।	পি. ভি. নরসিমা রাও (১৯২১-২০০৪)	কংগ্রেস	১৯৯১-৯৬
১২।	অটল বিহারী বাজপেয়ী (১৯২৪-২০১৮)	বিজেপি	১৬ই মে ১৯৯৬-জুন ১ ১৯৯৬
১৩।	এইচ. ডি দেবগৌড়া (১৯৩৩-)	জাতীয় মোর্চা	১ জুন ১৯৯৬-২১ই এপ্রিল ১৯৯৭
১৪।	ইন্দর কুমার গুজরাল (১৯১৯-২০১২)	জাতীয় মোর্চা	২১ এপ্রিল, ১৯৯৭-১৯শে মার্চ, ১৯৯৮
১৫।	অটল বিহারী বাজপেয়ী (১৯২৪-২০১৮)	বিজেপি (এনডিএ)	১৯৯৮-২০০৪
১৬।	ড. মনমোহন সিং (১৯৩২-)	কংগ্রেস (ইউপিএ)	২০০৪-২০১৪
১৭।	নরেন্দ্র মোদী (১৯৫০-)	বিজেপি (এনডিএ)	২০১৪-

NOTES

মানুষের জ্ঞান ও ভাবকে বইয়ের মধ্যে সঞ্চিত করিবার যে একটা প্রচুর সুবিধা আছে, সে কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। কিন্তু সেই সুবিধার দ্বারা মনের স্বাভাবিক শক্তিকে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলে বুদ্ধিকে বাবু করিয়া তোলা হয়।

— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

"Any system of education which ignores Indian conditions, requirements, history and sociology is too unscientific to commend itself to any rational support".

— Subhas Chandra Bose

ভারতের একটা mission আছে, একটা গৌরবময় ভবিষ্যৎ আছে, সেই ভবিষ্যৎ ভারতের উত্তরাধিকারী আমরাই। নূতন ভারতের মুক্তির ইতিহাস আমরাই রচনা করছি এবং করব। এই বিশ্বাস আছে বলেই আমরা সব দুঃখ কষ্ট সহ্য করতে পারি, অন্ধকারময় বর্তমানকে অগ্রাহ্য করতে পারি, বাস্তবের নিষ্ঠুর সত্যগুলি আদর্শের কঠিন আঘাতে ধূলিসাৎ করতে পারি।

— সুভাষচন্দ্র বসু

Price : Rs. 250.00

(NSOU-র ছাত্রছাত্রীদের কাছে বিক্রয়ের জন্য নয়)

Published by : Netaji Subhas Open University, DD-26, Sector-1, Salt Lake, Kolkata-700 064 &
Printed at : The Saraswati Printing Works, 2, Guru Prosad Chowdhury Lane, Kolkata 700 006